আমার প্রিয় ভৌতিক গল্প

হুমায়ূন আহমেদ

আমার প্রিয়

ভৌতিক গল্প

সম্পাদনা

হুমায়ূন আহমেদ

কাকলী প্রকাশনী

উৎসর্গ

আমার তিন কন্যা বিপাশা, শীলা, নোভা।

এরা ভূত বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভূতের ভয়ে অস্থির হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় তিন কন্যা ঠাসাঠাসি করে এক বিছানায় ঘুমুচ্ছে, কারণ কেউ একজন ভয় পেয়েছে।

চিরকাল এইসব রহস্য আছে নীরব
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর
জন্মান্তের নব প্রাতে, সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৌতিক গল্পের একটি সংকলন বের করার শখ আমার অনেক দিনের। কোনো একটা ভাল গল্প পড়লে আমার তৎক্ষণাৎ ইচ্ছে করে অন্যদের সেই গল্পটা পড়াতে। আমি চাই আমার ব্যক্তিগত ভাললাগাটা ছড়িয়ে পড়ুক—অন্যরাও আমার মতো রোমাঞ্চিত হোক।

ভরা বর্ষার রাতে প্রায়ই যে ঘটনাটা আমার বাড়িতে ঘটে তা হচ্ছে আমি একটা ভূতের গল্প পড়ে শোনাচ্ছি— আমার তিন কন্যা এবং তাদের মা চোখ বড় বড় করে শুনছে। গল্প শেষ হবার পর তিন কন্যা বলল, আমরা আজ আলাদা শোব না। এক সঙ্গে শোব। লম্বা বিছানায় আড়াআড়ি করে সবাই শুয়েছি— এক প্রান্তে আমি, অন্য প্রান্তে কন্যাদের মা। মাঝখানে তিন কন্যা। বাইরে ঝুপঝুপ করে বর্ষার বৃষ্টি। এমন ভয় পাওয়াতেও তো আনন্দ আছে।

ভৌতিক গল্পের সংকলন করতে গিয়ে দেখি—অবাক কাণ্ড! ভাল লাগার মতো গল্প তো তেমন নেই! যে বড় গলায় যত কথাই বলুক—বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক গল্পের ধারা খুবই ক্ষীণ। লেখকরা ভূতের গল্প যখনই লিখেছেন তখনই তাঁদের মাথায় চলে এসেছে—গল্পটার পাঠক শিশু-কিশোর। ভৌতিক গল্প তাঁরা লিখেছেন বাচ্চাদের জন্যে। লেখা হয়েছে খানিকটা অযত্নে, খানিকটা হেলাফেলায়। সেই গল্পের বেশীর ভাগই যেখানে শেষ হয় সেখানে দেখা যায় যে ভূত নেই—ভয়ের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে ঘটেছে। ব্যাখ্যাতীত কোনো কারণে ঘটে নি।

এ জাতীয় গল্প পড়লেই আমার মনে হয়—লেখক পাঠকদের সঙ্গে এক ধরনের প্রতারণা করলেন। এই প্রতারণার অধিকার তাঁদের নেই। তবে এ ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে তাঁরা যদি শেখাতে চান যে ভূত বলে কিছু নেই তা হলে ভিন্ন কথা। আমি নিজে ভূতের গল্প পড়ে এই শিক্ষা নিতে চাই না। ভূতের গল্প আমি ভয় পাবার জন্যেই পড়তে চাই।

বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক গল্পের একটা বিশেষ ফরম্যাট আছে। ফরম্যাটটা হচ্ছে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে একজনের দেখা হবে। যার সঙ্গে দেখা হবে সে তার পূর্বপরিচিত। তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হবে গল্পগুজব হবে। তারপর জানা যাবে যার সঙ্গে কথা হয়েছে সে আগেই মারা গেছে। এইসব গল্পে কোনো টেনশান থাকে না। কারণ আমরা জানি না অশরীরীর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। যখন জানা হয় তখন গল্প শেষ। ভৌতিক গল্পের মানগত শ্রেণীবিন্যাসে আমি এ- জাতীয় গল্পগুলিকে সর্বনিম্নে স্থান দেব। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে বেশীর ভাগ গল্পই এই শ্রেণীর।

একশ ভাগ খাঁটি ভূতের গল্পও লেখা হয়েছে—আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সে- সব গল্প পড়ে কেন জানি ভয় লাগে না, বরং মায়া লাগে। অন্য ভুবনের প্রতি মায়া, অশরীরীর প্রতি মায়া। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প **তারানাথ তান্ত্রিকের** কথাই ধরা যাক। ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টায় তাঁর কোনো ক্রটি ছিল না। তার পরও গল্প শেষ হবার পরপর অদ্ভুত মায়ায় হৃদয় আচ্ছন্ন হয়। মনোজ বসুর বিখ্যাত ভূতের গল্পগুলির ব্যাপারেও একই কথা। তাঁর গল্প পড়ে ভয়ে না, আমরা মায়ায় আচ্ছন্ন

হই। মনোজ বসুর দুটি গল্প আমি এই সংকলনে নিয়েছি—**লালচুল** এবং **পাতাল-কন্যা**। দুটি গল্পই চমৎকার। তাঁর গল্পে অশরীরীরা এসেছে খুবই স্বাভাবিক ভাবে। যেন এরা বাইরের কেউ না, এরা আমাদের সঙ্গেই আছে—আমাদেরই একজন। আমরা দেহধারী, ওরা নয়— এইটুকুই প্রভেদ।

এক সময় আমাদের অবস্থা কিন্তু এই ছিল। গ্রামবাংলায় ভূতকে ঘরের মানুষ ভাবা হত। ছোটবেলার কথা, নানার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা অন্যপাড়া থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। নানাজানের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে যাবার বেলায় বললেন, "একটা পেতনি বড় ত্যক্ত করতাছে।" অর্থ হচ্ছে কিছুদিন ধরে এক প্রেত তাদের বড়ই বিরক্ত করছে। বিরক্তের ধরন হচ্ছে, মাছ ভাজা হলে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ভাজা মাছ খেতে চায়। নাকিস্বরে অনুনয়-বিনয় করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভদ্রলোকের গল্পে কেউ বিস্মিত হল না। ধরেই নিল এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, প্রেতরা ভাজা মাছ পছন্দ করে। এরা ত্যক্ত করবেই।

নানার বাড়িতেই আলাউদ্দিন নামের এক কামলা ছিল যে ভূতের সঙ্গে কুস্তি করেছে। কুস্তির ফলে তার সারাগায়ে আঠাজাতীয় কিছুতে (ময়মনসিংহের ভাষায়—বিজল) মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। সেই আঠা দূর করতে তাকে সারারাত নারিকেল ছোবড়া দিয়ে ডলাডলি করতে হয়েছে। এই ভয়াবহ ঘটনাও খুব স্বাভাবিকভাবেই নেয়া হয়েছে। ভাবটা এমন যে ভূতের সঙ্গে কুস্তি করলে গায়ে তো 'বিজল' লাগবেই।

গভীর রাতে মশালের আলো জ্বেলে মাছধরা গ্রামের মানুষদের জন্যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা। মাছধরার এই প্রক্রিয়াটির নাম 'আউল্যা'। গ্রামের ভূতের গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে 'আউল্যা'র' অভিজ্ঞতা। পরিচিতজনের গলা নকল করে ভূত এসে ডাকবে মাছ ধরতে যাবার জন্যে। একবার ঘর থেকে বের করতে পারলে আর কথা নেই—ভূতের প্রধান চেষ্টা থাকবে বিলের পানিতে ডুবিয়ে মারা। এই জাতীয় ভূতরা ডাঙ্গায় আসতে পারে না।এদের কর্মকাণ্ড পানিতে।

ডাঙ্গায় আছে 'ভুলো'।

আউল্যাতে গিয়ে 'ভুলো'র হাতে পড়ে জীবনসংশয়ের ঘটনাও আছে। ভুলো হচ্ছে সেই অশরীরী যে পথ ভুলিয়ে দেয়, দিক ভুলিয়ে দেয়, শুধু ঘুরিয়ে মারে। 'ভুলো' নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা অসাধারণ গল্প আছে—**ভুলোর ছলনা**। গল্পটা যদিও শিশু-কিশোরদের প্রতি লক্ষ্য রেখে লেখা হয়েছে, তার পরেও সব বয়সের পাঠকদের জন্যেই এই গল্প। আদি গ্রাম- বাংলার লোকজ বিশ্বাসের গল্প।

এই সংকলনে তারাশঙ্করের আরেকটি গল্পও আমি নিয়েছি—**ডাইনী**। স্বণ ডাইনী নামে গ্রামের এক ডাইনীর গল্প। উইচক্রাফটের গল্প পশ্চিমে প্রচুর লেখা হয়েছে—বাংলা সাহিত্যে এজাতীয় গল্প সম্ভবত শুধু তারাশঙ্করই লিখেছেন। এটিও অসাধারণ এক গল্প। গল্পটি অনূদিত হলে উইচক্রাফটের ওপর লেখা সব পশ্চিমা গল্পকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আমার ধারণা।

পশ্চিমাদের ভূতের গল্প লেখার হাত এবং বিষয়বৈচিত্র্য আমাদের চেয়ে অনেক

ভাল বলে আমার মনে হয়। আমাদের ভূতের গল্পে যেমন একটা হেলাফেলা ভাব আছে ওদের তা নেই। সম্ভবত তার একটি কারণ হচ্ছে পশ্চিমা পাঠকরা এ জাতীয় গল্প খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েন। এ-দেশীয় পাঠকরা ভৌতিক গল্প শিশুতোষ বিষয় মনে করেন, সৎ-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলেন না।

হয়ত এ কারণেই বাংলা ভাষার লেখকরা ভৌতিক গল্প লেখার ব্যাপারে অনাগ্রহ বোধ করেন। বাংলা ভাষার অনেক লেখক বিদেশী গল্পের ছায়ায় ভূতের গল্প লিখেছেন এবং খুবই দুঃখের ব্যাপার ঋণ স্বীকার করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁরা কি ধরেই নিয়েছিলেন বাংলা ভাষার পাঠকরা মূল গল্পগুলি কখনো পড়বেন না! অনেক ভাল ভাল গল্প আমি এই সংকলনে নিতে পারি নি কারণ গল্পগুলির মূল পশ্চিমে প্রোথিত।

পশ্চিমা ভূতের গল্পের সঙ্গে আমাদের ভূতের গল্পের একটা পার্থক্য হচ্ছে—বাংলা সাহিত্যে জীবজন্তুর ভূত নেই বললেই হয়। পশ্চিমে—মানুষ- ভূতের সঙ্গে আছে ঘোড়ার ভূত, কুকুরের ভূত। ঘোড়া আমাদের দেশে নেই, গরু তো আছে! গরুর ভূতের কোনো গল্পও কিন্তু নেই। লীলা মজুমদারের একটা গল্পে ন্যাপা কুকুরের ভূতের ব্যাপারটা আছে। গল্প হিসেবে খুব ভাল না হলেও বিষয়বৈচিত্র্যের জন্যে গল্পটি এ সংকলনে রাখা হল। সত্যজিৎ রায়ের গল্প **'ভূতো'**ও বিষয় বৈচিত্রের দাবিদার। অবশ্যি এই গল্প যে-বিষয় নিয়ে লেখা সে-বিষয়ে পশ্চিমে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। ভুডু ম্যাজিক পশ্চিমা আদিবাসীদের এবং যাযাবরদের নিজস্ব ব্যাপার।

এই সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গল্প নেয়া হয়েছে—**নিশীথে, মাস্টারমশায়**। ভূত ছাড়া ভূতের গল্প কীভাবে লেখা যায় এবং সেই গল্প কোন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়—নিশীথে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাস্টারমশায়ে একটি ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করে অন্য গল্প বলা হয়েছে যেখানে পরকালের স্থান নেই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা **একটি ভৌতিক কাহিনীর** অন্তর্ভুক্তির কারণ—গল্পটা চমৎকার। উপস্থাপনা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। ভৌতিক গল্পের প্রাণ হল বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন। এই গল্পটি আমি পড়েছি আমার কৈশোরে। পরিষ্কার মনে আছে—গল্প শেষ করে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। সংকলন ভুক্ত করার আগে আগে গল্পটা আবার পড়লাম। আরারো ভয় পেলাম।

সতীনাথ ভাদুড়ীর একটা গল্প **'রহস্য'** সংকলনে নিয়েছি। গল্পটি যতদূর মনে পড়ে এই মহান লেখকের মৃত্যুর পর দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটা ঠিক ভৌতিক না—অতিপ্রাকৃত গল্প এবং অসাধারণ গল্প। বার বার পড়তে ইচ্ছে করে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প হলুদপোড়া নেয়া হয়েছে। যদিও হলুদপোড়াকে ভূতের গল্প বলা ঠিক হবে না। হলুদপোড়া লোকজ এক বিশ্বাসের গল্প যে-বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্ক হল প্রাচীন বাংলার বিশ্বাস। মানিকবাবু আধুনিক মানুষ ছিলেন। ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী ছিলেন না। লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর কিছু শুচিবাইও ছিল—যা বিশ্বাস করি তা-ই লিখব, যা বিশ্বাস করি না তা লিখব না। আমার খুব আফসোস হয় এই মহান লেখক সাহিত্যের এই শাখাটিতে হাত দেন নি। হলুদপোড়া পড়লেই বোঝা যায়—সাহিত্যের এই শাখায় হাত দিলে তিনি সোনার ফসল তুলে আনতে পারতেন।

ভূতের গল্পের মোড়কে মানবিক কিছু গল্প বাংলা সাহিত্যে আছে। ইচ্ছা করেই

সেইসব গল্প বাদ দিয়েছি, তবে শৈলজানন্দের **'কে তুমি'** বাদ দিতে পারি নি। চমৎকার গল্প। সমস্যা একটাই, অশরীরী দিয়ে শুরু হলেও কে তুমি পুরোপুরি শরীরী গল্প।

সংকলনে পরশুরামের (রাজশেখর বসু) **মহেশের মহাযাত্রা** নেয়া হয়েছে। পরশুরাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি-তামাশা রসিকতা দিয়ে শুরু করেছেন—তারপর গল্পকে অসাধারণ এক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। গল্প যতই এগুতে থাকে পাঠকের মুখের হাসি ততই শুকোতে থাকে। গল্প শেষ করার পর বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে যেতে পারে না। বাতি জ্বালিয়ে রেখে বিছানায় যেতে হয়।

আমার কিছু প্রিয় গল্পকারের গল্প এই সংকলন থেকে বাদ পড়ে গেল। কারণ তাঁরা ভূতের গল্প লিখেছেন ঠিকই—কিন্তু সেসব গল্প মজাদার ভূতের গল্প। ভয় নয় হাস্যরস সৃষ্টিই সেইসব গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

সংকলনে শিশুতোষ ভূতের গল্প পুরোপুরি বাদ দিতে পারিনি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের **'পানিমুড়ার কবলে'** এবং বুদ্ধদেব বসুর **'দিনে দুপুরে ভূত"**—শিশু-কিশোরদের সামনে রেখে হলেও—সত্যিকার অর্থেই ভৌতিক গল্প, এবং আমার পছন্দের গল্প।

লেখক বনফুল পরলোক, ভূতপ্রেতে খুব বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভাগলপুরের বাড়িতে যে-ই বেড়াতে যেত তাকেই তিনি জোর করে ভূতের গল্প শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে লেখালেখি তেমন করেন নি। অনেককাল আগে তাঁর একটি অপূর্ব ভৌতিক গল্প পড়েছিলাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সেই গল্পটি পাই নি। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্প **"অবর্তমান'**, অবশ্যই ভাল গল্প। কিন্তু আমার মনে পড়ে আছে যে- গল্পটি পাওয়া যায় নি সেখানে।

সংকলনে আমি আমার নিজের দুটি গল্প দিলাম— **ভয়, আয়না**। আমি খুব বিনয় করে লিখতে পারতাম—বাংলা সাহিত্যের মহান লেখকদের গল্প-তালিকায় নিজের গল্প যুক্ত করতে আমার খুবই লজ্জা লাগছে, এটা এক ধরনের ধৃষ্টতা... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তা করলাম না। সংকলনের সম্পাদক হিসেবেই আমি মনে করি পছন্দের ভৌতিক গল্প সংকলনে অবশ্যই এই দু'টি গল্প যেতে পারে এবং যাওয়া উচিত। বাংলাদেশের আরও কিছু লেখকের গল্প সংকলনে যুক্ত করতে পারলে আমার খুব ভাল লাগত। আমি চেষ্টা করেছি। আমার অনুসন্ধানের ক্রটি ছিল না। আমি পাই নি। বাংলাদেশের লেখকরা ভূত নামক তুচ্ছ ছেলেভুলানো বিষয় নিয়ে লিখতে পছন্দ করেন না। অনেক বড় বিষয় এবং অনেক জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁরা লিখতে পছন্দ করেন। 'ভূত' আবার লেখার বিষয় হতে পারে?

আমার কাছে 'ভূত' অতি প্রিয় বিষয়। অতিপ্রাকৃত এক জগৎ। যে- জগতের দেখা পাই না, যা দেখা যায় না তাকেই দেখতে ইচ্ছে করে, যা ছোঁয়া যায় না, তাকেই তো ছুঁতে ইচ্ছে করে।

সংকলনের গল্পগুলি দিনের আলোয় নয়, রাতে পড়ার জন্যে পাঠকদের অনুরোধ করছি—সবচে ভাল হয় বর্ষণমুখর রাত।

হুমায়ূন আহমেদ
১মে '৯৭,
ধানমণ্ডি। ঢাকা

সূচিপত্র

নিশীথে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্‌বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে— "তোমার ঔষধ কোনো কাজে লাগিল না।"

আমি কিঞ্চিৎ সসংকোচে বলিলাম, "আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।"

দক্ষিণাচরণবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে ; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।"

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম ; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের-কাগজ-পাতা প্যাক্‌বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষণ মুহূর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া, জ্বরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তার জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল ; সে গব্য ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, "আঃ করো কী। লোকে বলিবে কী। অমন করিয়া দিনরাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না।"

যেন নিজে পাখা খাইতেছি, এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা-উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, "পুরুষমানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া

বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সির বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, "ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে ; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।"

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি-একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শান্ত নিস্তব্ধ ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটা উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল ; আমি বলিয়া উঠিলাম, "তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।"

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, "কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।"

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখনো আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ-উপশমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

ডাক্তার বলিল, "একবার বায়ুপরিবর্তন করিয়া দেখিলে ভালো হয়।" আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ ভন্‌ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্‌ণ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ্ করো।"

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্‌বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম, 'যতদিন এই দেহে জীবন আছে— "

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, "নাও নাও ! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না !"

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, "এ জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না।"

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্ত এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশা-হীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না ; অথচ, চিরজীবন এই চিররুগ্‌ণকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন ; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত ; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম—মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো ; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারানবাবুকে বলিতেছেন, "ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।"

ডাক্তার বলিলেন, "ছি, এমন কথা বলিবেন না।"

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড়ো আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে

হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, "এ ঘর বড়ো গরম, তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।"

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়া-ছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও।" জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাক্তারবাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন ; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম ; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিংবা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক-একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে।"—তাঁহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ও কে। ও কে গো।"

আমার কেমন দুর্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, 'আমি চিনি না।" বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, "ওঃ, আমাদের ডাক্তারবাবুর কন্যা।"

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন ; আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে

পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, "আপনি আসুন।" আমাকে বলিলেন, "আলোটা ধরো।"

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, "এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা ভারি বিষ।"

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, "বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে।"

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ; বলিলেন, "না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো ঝি আছে, সে আমাকে মায়ের মতো যত্ন করে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।"

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, ইনি এই বদ্ধ ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন ?"

ডাক্তারবাবু আমাকে কহিলেন, "আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।"

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে।"

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম।

ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিস করিলে হয় না ?"

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন।"

আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, "হাঁ।"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প্ আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।"

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচরণ আর-একবার জল খাইয়া বলিলেন, "উঃ, বড়ো গরম!" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোন্‌খানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরো ঘনীভূত; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুর বর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল-অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবায

আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল ; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল ; সাদা পাথরের উপর সাদা শাড়ি-পরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, "মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।"

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম ; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আর-একদিন আর-কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্তেই বকুলগাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচে দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন।"

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, "শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল ?"

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন, "সে বুঝি হাসি ? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ একঝাঁক পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও ?

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখির ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তরদেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারি দিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার অনেকদিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধু ধু করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী

নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে ; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্‌বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মতো হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাঁধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কী ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্না-বিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীর স্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, "ও কে। ও কে। ও কে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম ; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে

একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপিচুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ও কে। ও কে। ও কে গো।"

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামূর্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটি হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে ; ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল ; ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল ; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শুনি নাই, কল্পনা করি নাই ; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না ; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো।" আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।" সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, "ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।"

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম, "একটু জল খান।"

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্ দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, "ডাক্তার! ডাক্তার!"

মাস্টারমশায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিস্তব্ধ শব্দসমুদ্রে একটুখানি ঢেউ তুলিয়া একটা বড়ো জুড়িগাড়ি ভবানীপুরের দিক হইতে আসিয়া বির্জিতলাও-এর মোড়ের কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া আরোহী বাবু তাহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাঁহার পাশে একটি কোট-হ্যাট পরা বাঙালি বিলাত-ফের্তা যুবা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া ঘুমাইতেছিল। এই যুবকটি নূতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা-উপলক্ষে বন্ধুমহলে একটা খানা হইয়া গেছে। সেই খানা হইতে ফিরিবার পথে একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবার ঠেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, "মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।"

মজুমদার সচকিত হইয়া একটি বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাড়াটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাৎলাইয়া দিয়া ব্রুহাম গাড়ির আরোহী নিজের গম্য পথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকাগাড়ি কিছুদূর সিধা গিয়া পার্ক-স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উচ্চারণ করিয়া আপন মনে কহিল, 'এ কী। এ তো আমার পথ নয়!' তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, 'হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।'

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে ; যেন তাহার আসনের শূন্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল, 'এ কী ব্যাপার। গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার শুরু করিল।'

"এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!"

গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়খড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিসটার হাত চাপিয়া ধরিল ; কহিল, "তুম্ ভিতর আকে বৈঠো।"

সহিস ভীতকণ্ঠে কহিল, "নেহি, সা'ব, ভিতর নেহি যায়ে গা!"

শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল ; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, "জল্‌দি ভিতর আও।"

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল ; কিছুই দেখিতে পাইল না, তবু মনে হইল, পাশে একটা অটল পদার্থ একেবারে চাপিয়া বসিয়া আছে। কোনোমতে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, "গাড়োয়ান, গাড়ি রোখো।" বোধ হইল, গাড়োয়ান যেন দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই হাতে রাশ টানিয়া ঘোড়া থামাইতে চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়াদুটা রেড রোডের রাস্তা ধরিয়া পুনর্বার দক্ষিণের দিকে মোড় লইল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আরে, কাঁহা যাতা।" কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূন্যতার দিকে রহিয়া রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল। কোনোমতে আড়ষ্ট হইয়া নিজের শরীরটাকে যতদূর সংকীর্ণ করিতে হয়, তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে-মনে তর্ক করিতে লাগিল যে, 'কোন্ প্রাচীন য়ুরোপীয় জ্ঞানী বলিয়াছেন, Nature abhors vacuum—তাই তো দেখিতেছি। কিন্তু এটা কী রে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়ি।' লাফ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভাবিতপূর্ব একটা-কিছু ঘটে। 'পাহারাওয়ালা' বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুখানি অদ্ভুত ক্ষীণ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না, এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিট্‌মিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চট্ করিয়া এক লম্ফে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু ভয়ে বুজিতে পারিল না—সেই অনির্দেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিমেষ ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘুরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়্‌খড়েগুলো থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া ঝর্‌ঝর্ শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধাক্কা খাইয়া হঠাৎ থামিয়া

গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই রাস্তায় গাড়ি দাঁড়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন।"

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, "কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই।"

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, "তবে এ কি শুধু স্বপ্ন।"

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, "বাবুসাহেব, বুঝি শুধু স্বপ্ন নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিন বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু, রাত্রে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—কেবলই ভাবিতে লাগিল, সেই চাহনিটা কার।

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হৌসের মুচ্ছুদ্দিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাবু বাপের উপার্জিত নগদ টাকা সুদে খাটাইতেছেন, তাঁহাকে আর নিজে খাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাদা ফেটা বাঁধিয়া পাল্‌কিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাঁহার ক্রিয়াকম দানধ্যান যথেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাঁহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গর্বের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাঁহার সম্পর্ক নাই ; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাঁহার বাঁধানো হুঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটর্নি-আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাম্প-দেওয়া দলিলের শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। তাঁহার সংসারের খরচপত্র সম্বন্ধে হিসাবের এমনি কষাকষি যে, পাড়ার ফুটবল ক্লাবের নাছোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাঁহার তহবিলে দন্তস্ফুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাঁহার ঘরকন্নার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাঁহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রজনীগন্ধার পাপড়ির মতো—যে দেখিল সেই বলিল, "আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক!" অধরবাবুর অনুগত অনুচর রতিকান্ত বলিল, "বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।"

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবুর স্ত্রী ননীবালা সংসারখরচ লইয়া স্বামীর বিরুদ্ধে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দুটো-একটা শখের ব্যাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক

আয়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর কৃপণতার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণুগোপাল সম্বন্ধে তাঁহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, হাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা রঙের সাজসজ্জা সম্বন্ধে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উত্থাপিত করিলেন, সব-কটাই তিনি কখনো নীরব অশ্রুপাতে কখনো সরব বাক্যবর্ষণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার এবং যাহা দরকার নয় তাহা চাই'ই চাই — সেখানে শূন্য তহবিলের ওজর বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও খাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাহিনা দিয়া অনেক-পাস-করা এক বুড়ো মাস্টার রাখিলেন। এই মাস্টার বেণুকে মিষ্টভাষায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিগকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাস্টারি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলই বেসুর লাগিল—সেই শুষ্ক সাধনায় ছেলে ভুলিল না।

ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, "ও তোমার কেমন মাস্টার। ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্থির হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।"

বুড়ো মাস্টার বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে যেমন স্বয়ম্বরা হইত তেমনি ননীবালার ছেলে স্বয়ম্মাস্টার হইতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখানি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতা পরিয়া মাস্টারির উমেদারিতে হরলাল আসিয়া জুটিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্‌ট্রেন্স্ স্কুলে কোনোমতে এন্‌ট্রেন্স্ পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া ভারতবর্ষের 'কন্যাকুমারী'র মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মস্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশস্ত হইয়া অত্যন্ত চোখে পড়িতেছে। মরুভূমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চক্ষু হইতে দৈন্যের একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী চাও। কাহাকে চাও।" হরলাল ভয়ে ভয়ে বলিল, "বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।" দরোয়ান কহিল, "দেখা হইবে না।" তাহার উত্তরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে

আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিধা করিতে দেখিয়া আবার কহিল, "বাবু, চলা যাও।"

বেণুর হঠাৎ জিদ্‌ চড়িল—সে কহিল, "নেহি যায় গা।" বলিয়া সে হরলালের হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজির করিল।

বাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া জড়ালসভাবে বারান্দায় বেতের কেদারায় চুপচাপ বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃদ্ধ রতিকান্ত একটা কাঠের চৌকিতে আসন হইয়া বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈবক্রমে হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পড়া কী-পর্যন্ত।"

হরলাল একটুখানি মুখ নিচু করিয়া কহিল, "এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাস করিয়াছি।"

রতিকান্ত ভ্রূ তুলিয়া কহিল, "শুধু এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাস? আমি বলি কলেজে পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কত এম. এ. বি. এ. আসিল ও গেল, কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর শেষকালে কি সোনাবাবু এন্‌ট্রেন্‌স্‌-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন!"

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "যাও!" রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিও বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে খুব আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু বলিয়া খেপাইয়া আগুন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদারি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; সে মনে-মনে ভাবিতেছিল, এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছোকরাটিকে নিতান্ত সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে থাকিবে, খাইবে, ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুক অতিরিক্ত দাক্ষিণ্য প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাস্টার টিঁকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আত্মীয়বন্ধু কেহই ছিল না—এই সুন্দর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। অভাগা হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনো

ঘটে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা ভালো হইবে, এই আশায় সে বহু কষ্টে বই জোগাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে পরাধীন থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশুবয়স কেবল সংকোচেই কাটিয়াছে—নিষেধের গণ্ডি পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে জয়শালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারও দলে ছিল না, সে আপনার ছেঁড়া বই ও ভাঙা স্লেটের মাঝখানে একলাই ছিল। জগতে জন্মিয়া যে ছেলেকে শিশুকালেই নিস্তব্ধ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাতার দুঃখ ও নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার স্বাধীনতা যাহার ভাগ্যে কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চঞ্চলতা করা বা দুঃখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে সমস্ত শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মতো করুণার পাত্র অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে চাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না, তাহার মনের মধ্যে এত স্নেহের রস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুখের সময় তাহার সেবা করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের আর-একটা জিনিস আছে—সে যখন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই লাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে ; একটি অতি ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বোন আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের যোগ্যই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই, কিন্তু অধরলাল নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে মেলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে-সকল দৌরাত্ম্য দশ জনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা হরলালকে বহিতে হইত। এই-সমস্ত উপদ্রব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে হরলালের স্নেহ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল, "আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টারমশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।" অধরলালেরও মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সম্বন্ধটি ঠিক যেন যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাত করে এমন সাধ্য এখন কাহার আছে।

৪

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ. এ. পাস করিয়া জলপানি পাইয়া তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বন্ধু যে জোটে নাই তাহা নহে, কিন্তু ওই এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেরা।

কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গ্রীক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে স্কট ও ভিক্টর হ্যুগোর গল্প একটু একটু করিয়া বাংলায় শুনাইত— উচ্চৈঃস্বরে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়স্ সীজার' মানে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যান্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ওই একটুখানি বালক হরলালের হৃদয় উদ্‌বোধনের পক্ষে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা- কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ করে এবং বেণুর মনে সেই আনন্দ সঞ্চার করিবার চেষ্টাতেই তাহার নিজের বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু ইস্কুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি জলপান সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘণ্টা, বিকালে এক ঘণ্টা পড়াইবে—দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। আজকাল ও যে মা বাপ কাহাকেও মানে না। ও কেমন শিক্ষা পাইতেছে। আগে যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাখামাখি কিসের জন্য।"

সেদিন রতিকান্ত অধরবাবুর কাছে গল্প করিতেছিল যে, তাহার জানা তিন-চারজন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্বা হইয়া ছেলেকে স্বেচ্ছামতো চালাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এ-সকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, আজ বেণুর মার কথা শুনিয়া তাহার বুক ভাঙিয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধ-স্থাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই

তাহা সহ্য করিতে পারে না এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলই না। কেমন করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখ ভার করিয়া রহিল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া সুবিধামতো হইলই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চৌবাচ্চায় মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি খাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য ঋষির আশ্রমের উপযুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালির কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্যা করা তাহাদের দ্বিতীয় কাজ। তাহার পরে রৌদ্র বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহ্নে যে গল্পের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাসাধ্য ভোরে উঠিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে বুঝি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না। হরলাল বেণুর মুখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন খাইতে বসিল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে বল্‌ দেখি। মুখ হাঁড়ি করিয়া আছিস কেন—ভালো করিয়া খাইতেছিস না—ব্যাপারখানা কী।"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তখন সে আর থাকিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মাস্টারমশায়—"

মা কহিলেন, "মাস্টারমশায় কী।"

বেণু বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, "মাস্টারমশায় বুঝি তোর মার নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন।"

সে কথার কোনো অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড়চোপড় চুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতল্লাসিতে হরলালেরও বাক্স সন্ধান করিতে ছাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, "যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাল বাক্সর মধ্যে রাখিয়াছে।"

মালের কোনো কিনারা হইল না। এরূপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ্য। তিনি পৃথিবীসুদ্ধ লোকের উপর চটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, "বাড়িতে অনেক লোক রহিয়াছে, কাহাকেই বা দোষ দিবেন, কাহাকেই বা সন্দেহ করিবেন। যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।"

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মতো পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়—নাহয় আমি তোমার দুই টাকা মাইনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।"

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, "এ তো অতি ভালো কথা— উভয় পক্ষেই ভালো।"

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না, অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শূন্য। তাঁহার সেই ভগ্নপ্রায় টিনের পেঁট্‌রাটিও নাই। দড়ির উপর তাঁহার চাদর ও গামছা ঝুলিত, সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাতাপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ ঝক্‌ঝক্‌ করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি নূতন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ভিতরকার পাতায় এক প্রান্তে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, "বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন?"

বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।"

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তক্তপোশের উপর উন্মনা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ দেখিল, প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণ ঘরে ঢুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল ; কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না।

বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।"

বেণু তাহাদের বৃদ্ধ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হউক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের পেঁট্‌রা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইস্কুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল 'আমাদের বাড়ি চলো', এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়াছে। কিন্তু, ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল, বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা নিশাচর বাদুড়ের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মনোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। খানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধাঁ করিয়া বই বন্ধ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে দ্রুতপদে রাস্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেক্‌চারের নোটের মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকজোক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন ঈজিপ্টের চিত্রলিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার সাদৃশ্য ছিল না।

হরলাল বুঝিল, এ সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয়, বৃত্তি পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃত্তি না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাকেও দু-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিন্তা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না-পাওয়া তাহার পক্ষে আরো কঠিন ; এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

হরলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উমেদারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়ো সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেখিয়া লোক চিনিতে পারেন। হরলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে-মনে বলিলেন, 'এ লোকটা চলিবে।' জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজ জানা আছে ?" হরলাল কহিল, "না।" "জামিন দিতে পারিবে ?" তাহার উত্তরেও "না।" "কোনো বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার ?" কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শুনিয়া সাহেব আরো যেন খুশি হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরম্ভ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।" তার পরে সাহেব তাহার বেশভূষার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "পনেরো টাকা আগাম দিতেছি, আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।"

কাপড় তৈরি হইল, হরলাল আপিসেও বাহির হইতে আরম্ভ করিল। বড়োসাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিরা বাড়ি গেলেও হরলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাঁহাকে কাজ বুঝাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হরলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিরা তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগিও করিল, কিন্তু এই নিঃশব্দ নিরীহ সামান্য হরলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চল্লিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হরলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন, "বাবা, এইবার বউ ঘরে আনিব।"

হরলাল মাতার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, "মা, ওইটে মাপ করিতে হইবে।"

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিলেন, "তুই যে দিনরাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গল্প করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

হরলাল কহিল, "মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইবে। রোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।"

৭

হরলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গলি হইতে বড়ো গলি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধরলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংকোচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর

পাওয়া গেল, বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শুনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধরলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেকদিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল, তবু এ বাড়িতে হরলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু, ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগে তাহার নূতন গোঁফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নাই। ফোনোগ্রাফে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাখে। পড়িবার ঘরে সেই সাবেক ভাঙা চৌকি ও দাগি টেবিল কোথায় গেল। আয়নাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি ফুলাইয়া রহিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাগিদ দেখা যায় না। বাপ স্থির করিয়া আছেন দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাটে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু, ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, "আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গৌরব প্রমাণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না— লোহার সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক্।" ছেলেও মাতার এ কথাটা বেশ করিয়া মনে-মনে বুঝিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হরলাল স্পষ্টই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই থাকিয়া থাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল যেদিন বেণু হঠাৎ সকালবেলায় তাহার সেই মেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল 'মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।' সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাস্টারমশায়কে কেই বা ডাকিবে।

হরলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহ্বান করিবার জোর পাইল না। একবার ভাবিল 'উহাকে আসিতে বলিব', তাহার পরে ভাবিল 'বলিয়া লাভ কি—বেণু হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক্।'

হরলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে রাঁধিয়া তাহাকে খাওয়াইবেন—"আহা, বাছার মা মারা গেছে!"

অবশেষে হরলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, "অধরবাবুর কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আসি।"

বেণু কহিল, "অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।"

হরলালের বাসায় বেণু খাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাঁহার দুই স্নিগ্ধ চক্ষুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া

ইহার মা যখন মরিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।'

আহার সারিয়াই বেণু কহিল, "মাস্টারমশায়, আমাকে আজ একটু সকাল-সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল ; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাঁপাইয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাতৃহীন ছেলেটিকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মনে-মনে কহিল, 'বাস্‌, এই পর্যন্ত। আর-কখনো ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাস্টারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু, আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অন্ধকারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল এসেন্সের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, মশায়।"

বেণু বলিয়া উঠিল, "মাস্টারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছ।"

বেণু কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন, তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বহুকাল হইল সেই-যে নিমন্ত্রণ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাৎ এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অন্ধকার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো ? কিছু বিশেষ খবর আছে ?"

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর ওই সেকেন্ড্ ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে! তাহার চেয়ে অনেক বয়সে ছোটো ছেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়, তাহার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোঝেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিস্টার হইয়া আসে। তাহারই

সঙ্গে একসঙ্গে পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা, একটি ছেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ ?"

বেণু কহিল, "জানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার প্রস্তাব তিনি কানে আনিবেন না। কিন্তু আমার মন খারাপ হইয়া গেছে— এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কখনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো, আমি-সুদ্ধ তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া যাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণু কহিল, "না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাগি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শক্ত।

হরলাল ভাবিল, 'আর-একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইবে।' জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি খাইয়া আসিয়াছ ?"

বেণু কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি আজ খাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণু আসিয়াছে তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিল। একটুখানি কাশিয়া, একটুখানি ইতস্তত করিয়া, সে বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, এটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি সুবিধা না হয়, আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"

বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু খাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি খাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য থালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও, বাছা!"

বেণু কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চলিলাম।"

মা কহিলেন, "সে কি হয় বাছা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া খাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছু খাইতেছে না, খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে স্বয়ং অধরবাবু মচ্‌মচ্‌ শব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর ছেলের সম্মুখে আসিয়া ক্রোধে কম্পিত কণ্ঠে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই বুঝি! রতিকান্ত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিশ্বাস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ, বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া খাইবে! কিন্তু, সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।"

এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল্‌। ওঠ্‌।" বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সদাগর-আপিস কী জানি কী কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সপ্তাহেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট হাজার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেরদিগকে হাতে হাতে দাম চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার নোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সপ্তাহের মোটা হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সপ্তাহের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন—হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যস্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, মা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া বসাইয়াছিলেন। সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গল্প করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, "বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেঁকে না। আমি বেণুকে তোর ছোটো

ভাইয়ের মতো আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই স্নেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।" এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, "বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিঁকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্বন্ধ লইয়া আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলই পরামর্শ চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্থির হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।"

স্নেহে ও বেদনায় হরলালের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাস্টারমশায়ের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশায়ের কতটুকুই বা সাধ্য আছে!

বেণু কহিল, "যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবু কি যাইতে দিবেন।"

বেণু কহিল, "আমি চলিয়া গেলে তিনি বাঁচেন। কিন্তু টাকার উপরে যেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাঁহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।"

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "কী কৌশল।"

বেণু কহিল, "আমি হ্যান্ড্‌নোটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পালাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

হরলাল কহিল, "তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।"

বেণু কহিল, "আপনি পারেন না?"

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, "আমি!" তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল, "কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।"

হরলাল হাসিয়া কহিল, "সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।"

বলিয়া এই আপিসের টাকার ব্যবহারটা কী তাহা বেণুকে বুঝাইয়া দিল। এই

টাকা কেবল একটি-রাত্রের জন্যই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন করে।

বেণু কহিল, "আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না ? নাহয় আমি সুদ বেশি করিয়া দিব।"

হরলাল কহিল, "তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।"

বেণু কহিল, "বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।"

তর্কটা এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, 'আমার যদি কিছু থাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।' কিন্তু একটিমাত্র অসুবিধা এই যে, বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঁড়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশব্যস্ত হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নূতন ধরনের। শৌখিন ধুতিচাদরের বদলে নধর শরীরে পার্শি কোট ও প্যান্টলুন আঁটিয়া মাথায় ক্যাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবদ্ধ ঘড়ি বুকের পকেটে নিবিষ্ট। কোটের আস্তিনের ভিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী ব্যাপার। এত রাত্রে এ বেশে যে!"

বেণু কহিল, "পরশু বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম, আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি। ইচ্ছা হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস থাকিত তবে গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতাম।"

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিঁধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মার ঘর, মার খাট, মার স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণুর স্নেহস্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কিরকম কণ্টকময় হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে-মনে ভাবিল, পৃথিবীতে গরিব হইয়া না জন্মিলেও দুঃখের এবং অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কী বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণু কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের প্রশ্নটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, "এই আংটিগুলি আমার মায়ের।"

শুনিয়া হরলাল বহু কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "বেণু, খাইয়া আসিয়াছ?"

বেণু কহিল, "হাঁ—আপনার খাওয়া হয় নাই?"

হরলাল কহিল, "টাকাগুলি গুনিয়া আয়রন-চেস্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।"

বেণু কহিল, "আপনি খাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম ; মা আপনার খাবার লইয়া বসিয়া আছেন।"

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আমি চট্ করিয়া খাইয়া আসিতেছি।"

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণ তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত স্নেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি পূরণ করিতে পারিবেন না, এই তাঁহার দুঃখ।

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতস্নেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া রাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময় ঘড়ি খুলিয়া বেণ কহিল, "আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।"

হরলালের মা কহিলেন, "বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে একসঙ্গেই বাহির হইবে।"

বেণু মিনতি করিয়া কহিল, "না, মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।"

হরলালকে কহিল, "মাস্টারমশায়, এই আংটি-ঘড়িগুলা বাগানে লইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।"

আপিসের দারোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লইয়া তখনই আয়রন-সেফের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মার পায়ের ধুলা লইল। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন, "মা জগদম্বা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।"

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনো দিন

সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লণ্ঠনে আলো জ্বলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসালোকখচিত নিশীথের মধ্যে বেণুকে লইয়া গাড়ি অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে ভাগ করিয়া এক-একটা থলিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গনা হইয়া থলিবন্দি হইয়া লোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

লোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। স্বপ্নে দেখিল— বেণুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্বরে তিরস্কার করিতেছেন ; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গে বেণুর মার চুনি-পান্না-হীরার অলংকার হইতে লাল সবুজ শুভ্র রশ্মির সূচিগুলি কালো পর্দাটাকে ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া আন্দোলিত হইতেছে। হরলাল প্রাণপণে বেণুকে ডাকিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙিয়া পর্দা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল—চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তূপাকার অন্ধকার। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিয়া সশব্দে জানলায় ঠেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো জ্বালিল। ঘড়িতে দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে কহিলেন, "কী বাবা, উঠিয়াছিস ?"

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে-মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপন কি মিথ্যা হইবে!"

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের থলেগুলা লোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাক্সয় বন্ধ করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়াস করিয়া উঠিল—দুই-তিনটা নোটের থলি শূন্য! মনে হইল স্বপন দেখিতেছে। থলেগুলা লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আছাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বৃথা আশায় থলের বন্ধনগুলা খুলিয়া খুব করিয়া ঝাড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেণুর হাতের লেখা— একটি চিঠি তাহার বাপের নামে,

আর-একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল, যেন আলো যথেষ্ট নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোঝে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকাওয়ালা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। হরলাল যে-সময় খাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণু এই কাণ্ড করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, "বাবাকে চিঠি দিলাম. তিনি আমার এই ঋণ শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ খুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিই তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অনায়াসে এই গহনা বেচিয়া বা বন্ধক দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।" এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন্ জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলন্ডে যাইবে। কোন্ জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরুজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তঃকরণ একটা কলেবরহীন নিদারুণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলই প্রাণপণে ঠেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মুহূর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, কোথায় গিয়াছিলে।"

হরলাল বলিয়া উঠিল, "মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।" বলিয়া শুষ্ককণ্ঠে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

"ও মা,কী হইল গো" বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া, শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া, উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল, "মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ো না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।" বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন— ফাল্গুনের রৌদ্র তাঁহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি রুদ্ধ দরজার উপর মাথা রাখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, "হরলাল, বাবা হরলাল।"

হরলাল কহিল, "মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।"

মা রৌদ্রে সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, "বাবু, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।"

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, "আজ সাতটার গাড়িতে যাওয়া হইবে না।"

দরোয়ান কহিল, "তবে কখন যাইবেন।"

হরলাল কহিল, "সে আমি তোমাকে পরে বলিব।"

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, 'এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি! বেণুকে কি জেলে দিব।'

হঠাৎ সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল, যেন কিনারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আংটি, ঘড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেস্‌লেট, চিক, সিঁথি, মুক্তার মালা প্রভৃতি আরো অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও, বাবা।"

হরলাল কহিল, "অধরবাবুর বাড়িতে।"

মার বুক হইতে হঠাৎ অনির্দিষ্ট ভয়ের একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ঐ-যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে, তাই শুনিয়া অবধি বাছার মনে শান্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না ?"

হরলাল কহিল, "না।" বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌঁছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া

রাগিণীতে করুণ স্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশান্তির লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াক্কড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল খবর পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্‌যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতালায় বারান্দায় গিয়া দেখিল, অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।"

অধরবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেল।"

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুঝি এই সময়ে তাঁহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল, "আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি নাহয় উঠি।"

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আঃ, বোসো-না।"

হরলাল কহিল, "কাল রাত্রে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।"

অধর। ব্যাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাস্টারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো! জানিতে, এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ, সাধুতার জন্য বকশিশ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখানা তাঁহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি পুলিসে খবর দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে পাঠাইয়াছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না।"

হরলাল কহিল, "আমি ধার দিই নাই।"

অধর কহিল, "তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাক্স ভাঙিয়া চুরি করিয়াছে?"

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।"

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত-পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভার মাথায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয়

করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সম্মুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, বেণু ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেণু! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরুপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে, এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেব বসিয়া আছে। সাহেব হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ মফস্বলে গেলে না কেন।"

আপিসের দারোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে— তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, "তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।"

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল ?"

হরলাল 'জানি না' এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, "টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।"

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারিদিক খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে হরলাল, কী হইল রে।"

হরলাল কহিল, "মা, টাকা চুরি গেছে।"

মা কহিলেন, "চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল!"

হরলাল কহিল, "মা, চুপ করো।"

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "এ ঘরে রাত্রে কে ছিল।"

হরলাল কহিল, "দ্বার বন্ধ করিয়া আমি একলা শুইয়াছিলাম—আর-কেহ ছিল না।"

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, "আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।"

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, "সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না খাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।"

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা!"

হরলাল কহিল, "মা, তুমি কেন ব্যস্ত হইতেছ। বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা

করিয়া আমি এখনই আসিতেছি।”

মা উদ্‌বিগ্ন হইয়া কহিলেন, “তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।”

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, “সত্য করিয়া বলো ব্যাপারখানা কী।”

হরলাল কহিল, “আমি টাকা লই নাই।”

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানো কে লইয়াছে।

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, “আমার প্রাণ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।”

বড়োসাহেব কহিলেন, “দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পারো টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো—তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা তুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।”

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল এক দিন সময় পাইল। আরো একটা দীর্ঘ দিন নৈরাশ্যের শেষতলের পঙ্ক আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাড়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই রৌদ্রে হরলাল রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক মুহূর্তে হরলালের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ তাহাকে জানেও না এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিদ্বেষও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শত্রু। অথচ, রাস্তার লোক তাহার গা ঘেঁষিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে ; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঙায় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না ; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে ; স্যাকরাগাড়ি ভরতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে

চলিয়াছে ; একজন চাপরাসি একখানা চিঠি লইয়া হরলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও"—যেন তাহার সঙ্গে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই ; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্রমে আপিস বন্ধ হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখো গাড়িগুলো আপিস-মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হরলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িঘর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হরলালের কাছে কখনো-বা অত্যন্ত উৎকট সত্যের মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একেবারে বস্তুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হরলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিল—যেন একটা সতর্ক অন্ধকার দিকে দিকে তাহার সহস্র ক্রূর চক্ষু মেলিয়া শিকারলুব্ধ দানবের মতো চুপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হরলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দব্ দব্ করিতেছে ; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে ; সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলিতেছে ; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উত্তেজনা ও অবসাদের অসাড়তার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল ঐ একটিমাত্র নামই শুষ্ককণ্ঠ ভেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর-কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হরলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চুপ করিয়া তাহার মায়ের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হরলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইবে।"

হরলাল কহিল, "কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইব।"

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হরলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হরলালকে লইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শ্রান্ত হরলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানালার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিঙ্গন

করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল, কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সহায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, সে কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা ভয় মাত্র, সে তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া পিষিয়া ধরিয়াছিল, হরলাল তাহাকে আর কিছুমাত্র স্বীকার করিল না—মুক্তি অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতিসামান্য হরলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে, অন্যায়ের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকানবাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাঁহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হরলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা, তাঁহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল—ঐ গেল, তপ্ত বাষ্পের বুদ্‌বুদ্‌ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অন্ধকারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অন্ধকার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিরক্ত হইয়া কহিল, "বাবু, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বলো।"

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাক্স হইতে নামিয়া হরলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হরলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিশ্বাস বহিতেছে না।

'কোথায় যাইতে হইবে' হরলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

একটি ভৌতিক কাহিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আমি বি.এ. পাশ করিয়া চাকরির সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েকমাস ধরিয়া বহু স্থানে বহু আবেদন করিলাম কিন্তু কোনরূপ ফল হইল না। অবশেষে সিউড়ী জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহু লোকের খোসামোদ করিয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে সিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধানে। বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া দুই দিন পরে নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একটি ছোটখাটো সস্তা বাড়ি খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড্ মাস্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম করি, এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে শহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ির সন্ধান পাইলাম। বাড়িটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়িখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই যে বাড়িটিতে ভূত আছে। তখন আমি সদ্য কলেজের ছোকরা—ইয়ংবেঙ্গল —ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যা-মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অত-দূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে চোর-ডাকাতের ভয়ও ত আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন, তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি.এ. পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়িতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া, আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্তী রবিবার প্রাতে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো-

মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়িটি দ্বিতল, নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দু'খানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অল্পদূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম এবং পান-রন্ধনের জন্য সেই জল আনয়ন করিত। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপরখানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেইসঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন পদব্রজে সিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পুবে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাঁধা থাকিত, হাতিশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রামপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপজপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুস্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন— "বাবা, তুমি কোথা যাইতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম—"সিউড়ী স্কুলে আমার মাস্টারি চাকরি হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরি, কামাই হওয়াটা বড়ো খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ও-রূপ আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?"

—"শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটা ভাড়া লইয়া আমি ও আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাস্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সিউড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময়

দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈবর্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে! তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি ?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন—"তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রামপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি কবচ দিয়া বলিলেন—'মা তোমার ছেলে আজ প্রাতে সিউড়ী রওনা হইয়াছে পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচ আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোনরকম ভয় পায় তবে যেন তারকব্রহ্ম নাম জপ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।' সুতরাং আমি দীনু কৈবর্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিমাত্রে রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তিপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা জানিবে।"

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, "তুই আজ এখানেই থাকবি তো ? তোর খাবার জোগাড় করি ?"

সে বলিল, "আজ্ঞে না, মা ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, 'তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে'।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম—"এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।" তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দু'জনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালাপথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্প খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন

মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথার সাদা ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দু'টা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রক্ষাকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন—"কি মহাশয় ?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিওন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানি রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে :

শ্রী শ্রীদুর্গাশরণং

পরমশুভাশীর্বাদঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনও বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভাবানী তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি নিয়ত আশীর্বাদক
শ্রীরমাপ্রসন্ন দেবশর্মা

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারী বাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা আমি যে সেইরাত্রে ভয়

পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন ?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন ? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি ?"

—"তাহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

—"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ, তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম— "সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে ?"

—"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে কিন্তু সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোন বিপদ হইবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়া ছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টারী পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফঃস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। এক দিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ি মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথম শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘণ্টা দুই এ-পাশ ও-পাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ পাইয়াছে—গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে দূরে, কোথাও বা ঘন-সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস

দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ গরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা ঝাঁকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি. সেই ভীষণ মূর্তি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোয়ালের উপর দুইটা জীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্মাবৃত কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিল সে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিল বলিল—"বাবু, এ কি? গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?"

আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম—"হয়ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে ।"

গাড়োয়ান তখন গাড়ি থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গরুর গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম—"থাক্, আজ আর কাজ নাই, গরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।"

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব, আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন ত দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরের লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত ও অবিকল সত্য।

মহেশের মহাযাত্রা

পরশুরাম

কেদার চাটুজ্যে মহাশয় বলিলেন,—আজকাল তোমরা সামান্য একটু বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুঝবে যে আত্মা আছেন। ভূত, পেতনী—এঁরাও আছেন। বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা—এঁয়ারাও আছেন।'

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাঁহার শালা নগেন বলিল,—'আচ্ছা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?'

বিনোদবাবু বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস ক'রব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারি না।'

চাটুজ্যে বলিলেন—এঁই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর! বলি, তোমার প্রপিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্চিল আর বালডুইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন ?'

"আচ্ছা, আচ্ছা, হার মানছি চাটুজ্যে মশায়।'

'আপ্তবাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম্ম ? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন- দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্যে মশায় ?'

'জ্যাঠামি করিস নি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাফেরা করে—কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুঝি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের ভেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্কর। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্তির।'

'কে তিনি ?'

'জান না ? আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন- 'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্যে মশায় !'

চাটুজ্যে মহাশয় হুঁকাটি হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্তির তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসরি করতেন। অঙ্কের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচণ্ড নাস্তিক। ভগবান আত্মা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, স্ত্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না,

বলতেন—শুয়োর না খেলে হিঁদুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কোনও জাত বড় হতে পারে নি। মহেশের চালচলনের জন্য আত্মীয়স্বজন তাঁকে একঘরে করেছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বভাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুণ্ডু, তিনিও ঐ কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হ'লে কি হয়, দুজনে হরদম ঝগড়া হ'ত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তাছাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখে নি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে বন্ধুকে উদ্‌ব্যস্ত করতেন। তবু মোটের ওপর তাঁদের পরস্পরের প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতিচর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অন্নচিন্তাও এমন চমৎকারা হয় নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন- তেমন চাকরি জুটে যেত। লোকের তাই উঁচুদরের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা ক'রত—বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গেছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথাটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় ঝি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকের লোভ এত বেড়ে গেছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বললেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিত-মশায় উত্তর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।' মহেশবাবু পাল্‌টা জবাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যুকে ঠেকানো যায় না।'

তর্কটা তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর। মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের কটা শখই বা মিটবে। তাই তো পরকালের আশায় ব'সে আছি, আত্মাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের ঝোপ। সবুজ মাঠের মধ্যিখানে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফ'লে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদূত গোলাপী উড়নি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে ব'সে রয়েছে, চাইলেই ফটাফট খুলে দেবে। ঐ হোথা কুঞ্জবনে ঝাঁকে ঝাঁকে অপ্সরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিচ্ছু বলবে না।

যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তানায় যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাঁজা। পরলোকে আত্মা ভূত ভগবান কিছুই নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জ'মে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন। পন্ডিত মশায় দারুণ অবজ্ঞায় ঠোঁট উলটে ব'সে রইলেন। বৃদ্ধ প্রিন্সিপাল যদু সাণ্ডেল রফা ক'রে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আত্মা আর ভগবান বাদ দিলে চলে না।' মহেশ মিত্তির বললেন—'কেউ-ই নেই, আমি দশ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছি।' হরিনাথ কুণ্ডু মহা উৎসাহে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলস্কাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক কষতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আত্মা আর ভূত—এই তিন রাশি নিয়ে অতি জটিল অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ক'রে হাতির শুঁড়ের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর = ০, আত্মা = ভূত = ০

বাচস্পতি বললেন—'বদ্ধ উন্মাদ।'

মহেশাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হ'ল গিয়ে দস্তুরমত ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্কের ভুল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টঙ্ক আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান দেখাবার ভার নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার ব'য়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো, হরিনাথ তুমি ভূতই দেখাও না। একটার প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা? আচ্ছা, আসছে হপ্তায় শিবচতুর্দশী পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষতে পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার?'

'আমার নাক কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক কাটব।'

প্রিন্সিপাল যদু সাণ্ডেল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয় হলেই হ'ল।

শিবচতুর্দশীর রাত্রে মহেশ মিত্তির আর হরিনাথ কুণ্ডু মানিকতলায় গেলেন। জায়গাটা তখন বড়ই ভীষণ ছিল, রাস্তায় আলো নেই, দু-ধারে বাবলা গাছে আরও অন্ধকার করেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল মাঝে মাঝে প্যাঁচার ডাক শোনা

যাচ্ছে। হোঁচট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌঁছলেন। বছর-দুই আগে ওখানে প্লেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে।

মহেশ মিত্তির অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছমছম করতে লাগল। হরিনাথ সারা রাস্তা কেবল ভূতের কথাই কয়েছেন—তারা দেখতে কেমন মেজাজ কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদারপ্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড়-একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো ব'লে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধ'রে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশরীরী বেড়াল তার পলাতকা প্রণয়িনীকে আকুল আহ্বান করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলেন, একটা লম্বা রোগা কুচকুচে কালো মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম! ও মহেশ, দেখছ কি, তুমিও বল না।'

আর একটু হ'লেই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর কনশেন্স বাধা দিয়ে বললে—'উঁহু, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ দেখ তখন না—হয় রামনাম ক'রো।

এঁরা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খানিকটা কাঁদা-গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কালো মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি নাকি ভূত মানেন না?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই ব'লে থাকেন—'আজ্ঞে হাঁ, মানি বই কী। কিন্তু মহেশ মিত্তির বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হ'ল, ধাঁ ক'রে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাঁধ খামচে ধ'রে জিজ্ঞেস করলেন—'কোন্ ক্লাস?'

ভূত থতমত খেয়ে জবাব দিলে—'সেকেণ্ড ইয়ার স্যার !'

'রোল নম্বর কত?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'বলি স্যার?'

হরিনাথের মুখে রাম রাম ভিন্ন কথা নেই। পিছনের দুই ভূত অদৃশ্য হয়ে গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ ক'রে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি ঝাঁকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় মারলে।

মহেশ মিত্তির হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—'জোচ্চোর!'

হরিনাথও পাল্টা কিল মেরে বললেন—'আহাম্মক!'

নিজের নিজের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে দুই বন্ধু বাড়ি-মুখো হলেন।

আসল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে মনে বললে—আজি রজনীতে হয় নি সময়।

পরদিন কলেজে হুলস্থুল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শুনে প্রিনসিপাল ভয়ংকর রাগ ক'রে বললেন—'অত্যন্ত শেমফুল কাণ্ড। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?'

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—'আজ্ঞে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল। মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে ক'রেই থাকি তাতে দোষটা কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো?'

মহেশবাবু গর্জন ক'রে বললেন,—'কে তোমার বন্ধু?'

প্রিনসিপাল বললেন—'মহেশ, তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের ছেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমার্জনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি যাও, তোমায় সাসপেন্ড করলুম। আর মহেশ, তোমাকেও সাবধান ক'রে দিচ্ছি–আমার কলেজে আর ভূতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।'

মহেশবাবু উত্তর দিলেন—'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার দূর করাই আমার জীবনের ব্রত।'

'তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম।'

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ ক'রে সমস্ত শুনছিলেন। তাঁরা প্রিনসিপালের হুকুম শুনে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকেলই জানতেন যে তাঁদের কর্তার রাগ বেশী দিন থাকে না।

মহেশবাবু তাঁর বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর প্রচণ্ড রাগ— হতভাগা একটা গভীর তত্ত্বের মীমাংসা করতে চায় জুয়োচুরি দ্বারা! সে আবার ফিলসফি পড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনও পান নি।

মানুষের মন যখন নিদারুণ ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার জন্য উপায় খোঁজে। কেউ কাঁদে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে। একটা তুচ্ছ কোঁচ-বকের হত্যাকাণ্ড দেখে মহর্ষি বাল্মীকির মনে যে ঘা লেগেছিল, তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাৎ দু-ছত্র শ্লোক রচনা ক'রে ফেলেন—মা নিষাধ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্ ইত্যাদি। তারপর সাতকাণ্ড রামায়ণ লিখে তাঁর ভাবের বোঝা নামাতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিত্তির চিরকাল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা ক'রে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তাঁরও মনে সহসা একটা কবিতার অঙ্কুর গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন না, কলেজের পোশাক না ছেড়েই ড় একখানা আলজেবরা খুলে তার প্রথম পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুণ্ডু,
খাই তার মুণ্ডু।

কবিতাটি লিখে বার বার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখে আদিকবি

বাল্মীকির মতন ভাবলেন, হাঁ, উত্তম হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা লাগল। কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডুর মিল আবহমান কাল থেকে চ'লে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হোন আর রবীন্দ্রনাথই হোন, কুণ্ডুর সঙ্গে মুণ্ডু মেলাতেই হবে—এ হ'ল প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। মহেশ একটু ভেবে ফের লিখলেন—

কুণ্ডু হরিনাথ
মুণ্ডু করি পাত।

হাঁ, এইবারে মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শান্ত হ'ল। কিন্তু কাব্যসরস্বতী যদি একবার কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ ওরে,
হবি তুই ম'রে
নরকের পোকা
অতিশয় বোকা।

উঁহু, নরকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু স্থির করলেন—কাব্যে কুসংস্কার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্রই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তারপর তাঁর কবিতার শেষের চার লাইন কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

ওরে হরিনাথ
তোরে করি পাত,
পিঠে মারি চড়—

এমন সময় মহেশের চাকরটা এসে বললে- 'বাবু, চা হবে কি দিয়ে? দুধ তো ছিঁড়ে গেছে।' মহেশবাবু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—'সেলাই ক'রে নে।'

পিঠে মারি চড়
মুখে গুঁজি খড়।
জ্বেলে দেশলাই
আগুন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোনও লাভ হবে না, অনর্থক খানিকটা জান্তব পদার্থ বরবাদ হবে। বরং তার চাইতে—

হরিনাথ ওরে,
পোড়াব না তোরে।
নিয়ে যাব ধাপা
দেব মাটি-চাপা।
সার হয়ে যাবি,
ঢ্যাঁড়স ফলাবি।

মহেশবাবু আরও অনেক লাইন রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই।

কবিতা লিখে খানিকটা উচ্ছ্বাস বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হৃদয়টা বেশ হালকা হ'ল, তিনি কাপড়চোপড় ছেড়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিন দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। হরিনাথ বরং একটা সন্ধির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একবারে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন। কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হ'ল— প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশী বিলিতী বিস্তর বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিশ্বাস আরও প্রবল হ'ল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন। বাঘের অস্তিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্তুর বাগানে গেলেই বাঘ দেখা যায়। ভূত যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপ্পাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশবাবু বেজায় চ'টে উঠলেন। শেষটায় এমন হ'ল যে ভূতের গুষ্টিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

প'ড়ে প'ড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাতে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভূতে তাঁকে ভেংচাচ্ছে। এমন স্বপ্ন দেখেন ব'লে নিজের ওপরেও তাঁর রাগ হ'তে লাগল। ডাক্তার বললে—পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ ক'রে ঐ ভূতুড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেন। কিন্তু ঐ সব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিত্তির কঠিন রোগে শয্যাশয়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর ক্ষয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা নির্ণয় হ'ল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর ভয়ও নেই। বললেন—'হরিনাথ' তোমায় ক্ষমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুদ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে ছাত্র ভূতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার

পাবে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ—ক'রো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ ঘি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে হাঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে পার। দেড় সের গন্ধক আর পাঁচ সের সোরা আননো আছে, তাও দিতে পার, চটপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, চললুম তা হ'লে।'

রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। মহেশের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় নেই, থাকলেও বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকলেই অন্যত্র গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেনে আনতে।

অনেকক্ষণ পর দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে ঢুকলেন না, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—'চুপ ক'রে ব'সে আছেন যে বড় ? সৎকারের ব্যবস্থা কি করলেন ?'

হরিনাথ বললেন—'আমি একলা মানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।'

'ওই বেলেল্লা হতভাগার লাস আমরা বইব ? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি!' এই কথা ব'লেই তাঁরা স'রে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে প'ড়ল, বড় রাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠা সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্রমহোদয়গণের দিবারাত্র সস্তায় সৎকার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতির খোঁজে গেলেন।

অনেক চেষ্টায় সমিতি থেকে তিন জন লোক যোগাড় হ'ল। পনের টাকা পারিশ্রমিক, আর শীতের ওষুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে হরিনাথ আর তাঁর সঙ্গীরা খাট কাঁধে নিয়ে রাত আড়াইটার সময় নিমতলায় রওনা হলেন।

অমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনমানব নেই। কাঁধের বোঝা ক্রমেই ভারী বোধ হ'তে লাগল, হরিনাথ হাঁপিয়ে পড়লেন।

বৈতরণী সমিতির সর্দার ত্রিচোলন পাকড়াশী বুঝিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, মানুষ ম'রে গেলে তার ওপর জননী বসুন্ধরার টান বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে খানিক জিরিয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিত্তিরের ভার ক্রমশই বাড়ছে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশী বললেন—'ঢের বয়েছি মশায়, কিন্তু এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করি নি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঝি ? পনের টাকায় হবে না মশায়, আরও পাঁচ টাকা চাই।'

হরিনাথ তাতেই রাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হ'ল। হরিনাথ ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণী তিন জন

হাঁপাতে হাঁপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজরে পড়ল—কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছায়া তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কালো র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—'এঃ আপনারা হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।'

হরিনাথ ভদ্রতার খাতিরে দু-একবার আপত্তি জানালেন, কিন্তু শেষটায় রাজী হলেন। লোকটি কোন্ জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিত্তির ও-বিষয় চিরকাল সমদর্শী—এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে লোক উপযাচক হয়ে শ্মশানযাত্রার সঙ্গী হয় সে তো বান্ধব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন,—'কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখ্‌রা পাবে না, তা বলে রাখছি।'

আগন্তুক বললে—'বখরা চাই না।'

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হ'ল না। তাঁর জায়গায় নতুন লোকটি দাঁড়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হ'ল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—'কুঁড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হ'ল মোষের গাড়ির বোঝা। আরও পাঁচ টাকা লাগবে।'

এমন সময় আরেকজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কালো র‍্যাপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ দ্বিরুক্তি না ক'রে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ক্লান্তি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু ঢোকেনি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, 'চল, চল।'

আবার যাত্রা আরও একটু জোরে, তারপর ফের খাট নামাতে হ'ল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কালো র‍্যাপার। এরা কি মহেশকে বইবার জন্য এই তিন প্রহর রাতে পথে বেরিয়েছে? হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই। বললেন, 'ওঠাও খাট, চল জলদি।'

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিনজন। এইবার গতি বাড়ছে, খাট হন হন করে চলছে। হরিনাথের আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হ'ল।

'আরে অত তাড়াতাড়ি কেন একটু আস্তে চল।' কেই বা কথা শোনে! ছুট—ছুট। 'আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! বীডন স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলে যে! লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওরে পাকড়াশী, থামাও না ওদের।' কোথায় পাকড়াশী?

তিনি বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝে টাকার মায়া ত্যাগ করে সদলে পালিয়েছেন।

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে,'হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দৌড়চ্ছেন। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, গোলদিঘি বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নেই ? রাস্তা কি ওপরে উঠেছে না নিচে নেমেছে ? এ কি আলো না অন্ধকার ? দূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমুদ্রের ঢেউ, না চোখের ভুল ?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরন্তর চীৎকার করছেন—'থাম, থাম।' ও কি খাটের উপর উঠে বসেছে কে ? মহেশ ? মহেশই তো ! কি ভয়ানক! দাঁড়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের ওপর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। পিছনে ফিরে লেকচারের ভঙ্গীতে হাতনেড়ে কি বলছে ?

দূর-দূরান্তর থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল— 'হরিনাথ— ও হরিনাথ— ওহে হরিনাথ—'

'কি, কি ? এই যে আমি।'

'ও হরিনাথ, আছে আছে সব আছে, সব সত্যি।—'

মহেশের খাট অগোচর হয়ে গেল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'আছে, আছে—'

হরিনাথ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের পুলিশ তাঁকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করেন।

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন–'গয়ায় পিণ্ডি দেওয়া হয়েছিল কি ?'

'শুধু গয়ায় ! পিণ্ডিদাদনখাঁএ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয় নি, পিণ্ডি ছিটকে ফিরে এল।

'তার মানে ?'

'মানে, মহেশ পিণ্ডি নিলে না, কিংবা তাকে নিতে দিলে না।'

'আশ্চর্য! মহেশ মিত্তিরের টাকাটা ?'

'সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজে কিছুই হয় নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোন ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে, সেই টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ'ল যে সব্বাই ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশ ফাণ্ডের নাম কেউ করে না।'

ডাইনী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমাদের একালে ডাইনী নাই। ডাইনী নাই, মায়াবিনী নাই।

সে হিসাবে একালের ছেলেরা ভাগ্যবান।

আমাদের আমলে, মানে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে ডাইনী, ডাকিনী, মায়াবিনী। একালের ছেলেরা ডাইনী-ডাকিনীর কথা শুনে হেসে উঠবে। কিন্তু সে আমলে আমাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যেত এদের নামে।

আমাদের গ্রামে আমাদেরই বাড়ির পূর্বপ্রান্তে বড় একটা পুকুর, বড় বড় তালগাছে ঘেরা। তাদের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনীর ঘর।

একেবারে গ্রামের প্রান্ত। একপাশে জেলেপাড়া, অন্যপাশে বাউরীপাড়া—মাঝখানে খানিকটা খালি জায়গা। সেই খালি জায়গায় একটা অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছতলায় ছোট একখানি ঘর। তারপর, অর্থাৎ স্বর্ণের বাড়ির পর পূর্বদিকে আর বসতি নাই, প্রান্তর চলে গিয়েছে। বালি আর কালচে মাটির প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যে লালুকচাঁদা নামে পুকুরটা ছিল গ্রামের শ্মশান। এখানে অবশ্য শবদাহ করা হ'ত না, মুখাগ্নি করা হ'ত। চারিদিকে পড়ে থাকত—মড়ার বিছানা, মাদুর, বালিশ, ন্যাকড়া, বাঁশ, মাটির সরা, ভাঁড়, আধপোড়া কুঁচি-কাঠি। পুকুরটার ওপারে একটা ঝাঁকড়া বটগাছ। দিনের বেলাতেও কেউ সে গাছতলায় যেত না। রাত্রে সেটা জমাট অন্ধকারের মত থমথম করত।

স্বর্ণ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকত সেই বটগাছটার দিকে।

আমরা তাই ভাবতাম।

নইলে—প্রান্তরটা যেখানে শেষ হয়েছে—সেইখানেই শুরু হয়েছে ধানের ক্ষেত। সবুজ শস্যক্ষেত্র। কিন্তু ডাইনী কি সবুজ ভালবাসে ? না বাসতে পারে?

স্বর্ণ ডাইনী। আমাদের দেশের ভাষায় 'স্বনা ডান'।

শুকনো কাঠির মতো চেহারা। শক্ত দু-পাটি দাঁত, কিন্তু নরুনে-চেরা চোখের মত ছোট। তাতে খয়েরী রঙ-এর তারা। বিচিত্র স্থির দৃষ্টি। ভাবলেশহীন শুষ্ক—যেন খটখট করত দুটো হলদে চোখ এই পাথর শুকনো ডাঙার বুকে। ডাইনীর দৃষ্টি!

এক দৃষ্টিতে ডাইনীরা কচি নধর দেহের, সুন্দর সুশ্রী মানুষের তরুণী নববধূর দেহের অস্থি চর্ম মেদ মাংস ভেদ করে—ভিতরে প্রবেশ করে খুঁজত প্রাণ-পুতুলী।

তাকে পেলে চুষে চুষে তারা খেয়ে ফেলে। নধর মানুষ শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে যায়, সোনার মত দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়। তরুণী নববধূর সব লাবণ্য ঝড়ে পড়ে। শুধু মানুষ কেন, কচি পাতায় ভরা লকলকে সতেজ গাছ অকস্মাৎ শুকিয়ে যায়। ডাইনীরা তারও সরস প্রাণটুকু দৃষ্টিযোগে পান করে নেয় নিঃশেষে।

স্তব্ধ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে তালগাছের মাথায় চিল চ্যাঁচায়—চিই-ই-ই-লো। চি-ই-লো, চি-ই-লো!

কান পেতে শুনলে শুনতে পাওয়া যায়—ঘরের দাওয়ায় বসে ডাইনী তার সুরে সুর মিলিয়ে সঙ্গীত গাইছে—অনুনাসিক মিহি সুরে গাইছে—ছিঁ-ই-হুঁ-ই-হুঁ! হিঁ-ইঁ-ইঁ-ই-হুঁ!

রাত্রে—গভীর রাত্রে স্বর্ণ ডাইনীর ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা যায়—শব্দ উঠছে—হুট-পাট, হুট-পাট, হুট-পাট!

বাট বইছে স্বর্ণ। যারা ডাইনী তারা ভগবানের অভিসম্পাতে রাত্রে মাটির উপর বুকে হেঁটে বেড়ায়। বাট বয়।

ভয় হয় না এর পর ?

স্বর্ণ তরিতরকারি বেচে বেড়াত। এই ছিল তার জীবিকা। তিন-চার ক্রোশ দূরের হাট থেকে কিনে আনত, বেচত আশেপাশের গ্রামে। পান, কাঁচকলা, পাকা রম্ভা, শাক, কুমড়ো এই সবই আমাদের গ্রামে সে বেচত না। আশপাশের গ্রামেই বেচত। গ্রামের কারও বাড়িতে ঢুকতে সে চাইত না। কি জানি—কার অনিষ্ট সে করে বসবে! তার ভিতর যে লোভটা আছে, সে যখন লকলক করে জিভ বার করবে তখন তো স্বর্ণের বারণ শুনবে না। কিন্তু স্বর্ণ যে লজ্জায় মরে যাবে! হি-হি-হি! ওর ভিতরের ডাইনীটা তো ওর অধীন নয়! সেই তো ওর জীবনের মালিক, তারই হুকুমে ওকে চলতে হয়। তার হুকুম ছাড়া ওর মরবারও অধিকার নেই। তার ভিতরের যে ডাইনীটা—সে এক সিদ্ধবিদ্যা, তাকে কোন নতুন মানুষকে না দেওয়া পর্যন্ত স্বর্ণ মরবে না।

স্বর্ণর মাসী কি কে যেন ছিল ডাইনী!

মৃত্যুকালে আত্মীয়-স্বজনদের খবর পাঠিয়েছিল কিন্তু কেউ যায়নি। ভয়ে যায়নি, যদি সে কোন কৌশলে তাকে দিয়ে যায় ঐ সর্বনাশা ভয়ঙ্কর বিদ্যা!— সে যে ডাইনী হয়ে যাবে!

মৃত্যুর পর স্বর্ণ গেল। নিশ্চিন্ত হয়েই গেল। বিদ্যা সে তো কাউকে দিয়ে দিয়েছে। নইলে মরণ হল কেমন করে। গিয়ে দেখলে—তখন মাসীর অনেক আত্মীয় এসেছে। আত্মীয় যা ছিল ভাগ করে নিয়েছে। সকলে চলে গেল। বিধবা তরুণী স্বর্ণ বসে রইলো দাওয়ার উপর। তার যেমন অদৃষ্ট। হঠাৎ ম্যাও ম্যাও শব্দ করে মাসীর পোষা বিড়ালটি তার পা ঘেঁষে বসল। ওটাকে কেউ নিয়ে যায়নি। বিড়ালটা তার পায়ে পা ঘসলে, গরগর শব্দ করলে। লেজটা উঁচু করে তার নাকে-মুখে ঠেকিয়ে দিলে। যেন বললে—আমাকে তুমি নিয়ে চল। তুমি কিছুই পাওনি। আমাকেও কেউ নেয়নি।

স্বর্ণের মায়া হল। নিয়ে এল বেড়ালটা। মাছ ভাত-দুধ খাওয়ায়, কোলের কাছে নিয়ে শোয়। পাশের জেলেপাড়ায় যায়, বাউরীপাড়ায় যায়।

সেদিন হইচই উঠল জেলেপাড়ায়।

জেলেদের একটা কচি ছেলের কি হয়েছে—ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে, আর কাঁদছে—কাঁদছে—যেন বেড়ালের মত আওয়াজ করে। এ্যাঁ-ও। অবিকল বেড়ালের শব্দ।

গুণীন এল। গুণীন দেখে বললে—ডাইনীর কাজ। কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—ডাইনটা মনে হচ্ছে—

বলতে হ'ল না শেষটা—স্বর্ণের বেড়ালটা ছুটে এল উঠোনে, রোঁয়া ফুলিয়ে লেজ ফুলিয়ে—এ্যাঁ-ও শব্দ করে থাবা পেতে বসল।

—এই। এই তো বেড়ালটা, এইটাই ডাইন।

—বেড়াল ডাইন ?

—হ্যাঁ। কোন ডাইন মরবার সময় ওকে দিয়ে গেছে ডাইনীবিদ্যে।

—ঠিক কথা। স্বর্ণের মাসী ছিল ডাইনী। বেড়াল তো তারই। কি সর্বনাশ !

একটা জোয়ান জেলের ছেলে দুরন্ত ক্রোধে বসিয়ে দিলে এক লাঠি তার মাথার উপর। মাথাটা প্রায় চুর হয়ে গেল। কিন্তু তবু মরল না; লেজ পাছড়াতে লাগল। নখগুলো বের করে মাটির উপর আঁচড়াতে লাগল।

গুণীন বলল—সাবধান। কেউ কাছে যাবে না। ও এখন ডাইন-মন্ত্রটি দেবার চেষ্টা করবে। নইলে ওর মৃত্যু হবে না।

সে মন্ত্র পড়লে, নিজের অঙ্গবন্ধন করলে—তারপর সন্তর্পণে লেজে ধরে বের করে ফেলে দিয়ে এল গ্রামের প্রান্তে।

স্বর্ণ ঘরে বসে সভয়ে কেঁপে উঠল।

লোকে তাকে গাল দিয়ে গেল। কেন এনেছিল ও এই পাপকে।

সন্ধের মুখে ক'টি ছেলে পথ দিয়ে গেল, তারা ব'লে গেল বেড়ালটা এখনও মরেনি।

—ইঃ, কি গোঙাচ্ছে! বাপরে! শিউরে উঠল তারা।

স্বর্ণ গেল চুপি চুপি। না দেখে থাকতে পারলে না।

সাদা দুধের মত বেড়ালটার রঙ—রক্তে-ধুলোয় পিঙ্গল হয়ে গেছে। কি যন্ত্রণাকাতর শব্দ।

স্বর্ণ এগিয়ে গেল—দু পা, এক পা করে।

তাকে স্পর্শ করলে।

বেড়ালটা মরে গেল।

স্বর্ণের একি হল ?

স্বর্ণের চোখে একি দৃষ্টি! একি হ'ল তার ? এসব সে কি দেখছে ? ওই যে গর্ভবতী ছাগলটা যাচ্ছে—তার গর্ভের মধ্যে দুটি ছাগল ছানাকে দেখতে পাচ্ছে।

ওই যে কলাগাছটা- ওর ভেতর দেখতে পাচ্ছে—কলার মোচা।

তার জিভ সরস হয়ে উঠছে। লকলক করে উঠছে! একি হ'ল তার ? হে ভগবান!

এমনি করে নাকি স্বর্ণ হয়েছিল ডাইনী।

সে আবার কাউকে ডাইনীবিদ্যা দেবে-তবে তার মরণ হবে। নইলে ওই মাথাভাঙ্গা বেড়ালটার মত কাতরাবে, কাতরাবে, কাতরাবে—তবু তার মৃত্যু হবে না। মৃত্যু চোখের সামনে বসে থাকবে।

ও বলবে- আমাকে নাও গো- আমাকে নাও।

মৃত্যু বলবে—কি ক'রে নেব ? এই বিদ্যে তুই আগে কাউকে দে—তবে নেব। নইলে তো পারব না।

স্বর্ণের হাত নাই তার ভিতরের ডাইনীর উপর।

সে কি গ্রামের কারুর বাড়ি যেতে পারে ? বাপরে!

আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেঁচে ছিল। আমি বললাম—স্বর্ণ পিসি।

ছেলেবেলায় কখনও সামনে যেতে সাহস হত না। বড় হবার পর ওপথে গিয়েছি এসেছি ; নিজের ঘরে আধো-অন্ধকার আধো-আলোর মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। চুপ করে বসে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে ঘরে ঢুকে যেত।

আমার বিশ-বাইশ বছর বয়স যখন হ'ল, তখন আমি তার বেদনা বুঝলাম। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেও সে বিশ্বাস করত—সে ডাইনী। কাউকে স্নেহ করে মনে মনে সে শিউরে উঠত। কাউকে চোখে দেখে ভাল লাগলে চোখ বন্ধ করত। তার আশঙ্কা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেলবে ;—হয়ত বা খেয়ে ফেলেছে বলে শিউরেও উঠত। মনে হ'ত ডাইনী-মন্ত্র—বিষাক্ত তার ভালবাসা—লোভ হয়ে তীরের মত গিয়ে তাকে বিঁধে ফেলেছে তার হৃৎপিণ্ডে!

ডাইনীতে আজ আর বিশ্বাস করি না। এ-কালের ছেলেরাও করে না। কিন্তু স্বর্ণ ডাইনীর ডাইনীত্বের একটি বিচিত্র পরিচয় আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই কথাটি বলব।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। কিন্তু ঘটনাটি আজও মনে হয় এই কদিন আগের দেখা ঘটনা। হঠাৎ শুনলাম—ও পাড়ার অবিনাশদাদাকে স্বর্ণ ডাইনে খেয়েছে। অর্থাৎ ডাইনে নজর দিয়ে—দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করেছে, তার ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাকে শুষে খাচ্ছে। গ্রামটা একেবারে তোলপাড় করে উঠল। বিখ্যাত গুণীন ছিলেন আমাদেরই বাড়িতে। আমার বাবা গ্রামের বাইরে বাগানে তারামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেইখানে থাকতেন এক সন্ন্যাসী, পশ্চিম দেশীয় সাধু। আমি তাঁকে বলতাম গোঁসাইবাবা ; অর্থাৎ গোস্বামী-বাবা। তিনি জানতেন অনেক বিদ্যা। তাঁকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি এলেন ; আমি তাঁরই সঙ্গে গেলাম, স্বর্ণ ডাইনের কীর্তি দেখতে এবং গোঁসাইবাবার ডাইন তাড়ানো দেখতে।

অবিনাশদাদা, অবিনাশ মুখুজ্জের বয়স তখন সতের-আঠারো। বাড়িতে আছে মা আর দুই বোন। অবিনাশদাদার মা—গোঁসাইবাবাকে বলেন গোঁসাইদাদা, অবিনাশদাদা বলেন—গোঁসাইমামা। অবিনাশদাদার বাড়ি তখন লোকে লোকারণ্য ; স্বর্ণ ডাইন অবিনাশকে খেয়েছে, রামজী সাধু ঝাড়বেন।

মেটে কোঠার উপর অবিনাশদাদা শুয়ে আছেন, চোখ বন্ধ। প্রবল জ্বর। ডাকলে সাড়া নাই। মাথার শিয়রে বসে মা। পাশে বসে বোন। চোখের জল ফেলছেন। রামজী সাধু গিয়ে একপাশে বসলেন—তার পাশেই আমি।

ডাকলেন—ভাগ্না। অবিনাশ ভাগ্না।

কোন উত্তর দিলেন না অবিনাশদাদা।

—অবিনাশ! এ! গায়ে নাড়া দিলেন।

এবার অবিনাশ ঘুরে শুল। বললে—মর হাঘরে গোঁসাই। আমি মেয়েছেলে। আমার গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন ?

—হুঁ। তু কৌন ? মেয়েছেলে ? কে রে তু ?—অবিনাশদাদা উত্তর দিল না।

—এ। তু কে রে ? এ ?

—বলব না।

—বলবি না ?

—না।

মন্ত্র পড়া শুরু হ'ল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়েন আর ফুঁ দেন—ছু! ছু! ছু!

পরিত্রাহি চীৎকার করে অবিনাশদাদা। বলছি। বলছি, বলছি !

তবু মন্ত্রপড়া চলল, সঙ্গে সঙ্গে ফুৎকার–ছুঁ! ছু! ছু!

বাবারে, মারে! মরে গেলাম রে! ও গোঁসাই, আর মেরো না। বলছি আমি বলছি।

—বোল। বোল তু কে ? বোল।

—আমি স্বর্ণ!

আজও স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি। আমি স্বর্ণ! চোখে সব দেখতে পাচ্ছি! থাক সে কথা।

গোঁসাই প্রশ্ন করলেন—স্বর্ণ ? তু কাহে হিঁয়া ? আঁ ? এখানে কাহে ?

—আমি একে খেয়েছি যে।

—হাঁ-হাঁ। উ তো জানছি। ওহি তো শুধাচ্ছি—কাহে—কাহে খেলি ?

কি করব ? আমার ঘরের সামনে দিয়ে এই বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঙলি না কাহে ? কাহে বললি না—হামাকে দাও ?

—কি করে বলব ? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি লজ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা ভাগ।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে বোল না।

আদেশের সুরে গোঁসাই বললেন, যা তুই। হামি বলছে।

—না! বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশদাদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না ? আচ্ছা এ দিদি, আন্ সর্ষা।

সরষে এল। হাতের মুঠোয় সরষে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ছুঁ শব্দে ফুঁ দিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশদাদার গায়ে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা—বাবারে মারে, ওরে মেরে ফেললে রে! ওরে বাবারে!

আবার মারলেন সরষের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি; আমি যাচ্ছি, আর মেরো না, আমি যাচ্ছি।

—যাবি ?

—হ্যাঁ যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশদাদা কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না ? চালাকি লাগাইয়াছিস, আঁ ? হাত তুললেন রামজী সাধু মারবেন ছিটে। অবিনাশদাদা চীৎকার করলে আবার—না না। যাচ্ছি।—

—যাবি ?

—হ্যাঁ যাব।

—তব্ এক কাম কর্। ঘরের বাহারে একঠো কলসীমে জল আছে, দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জ্বরে অচেতন অবিনাশদাদা উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজীবাবা বললেন—না।

ঘর থেকে অবিনাশদাদা বের হল। চোখে বিহ্বল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দোতলার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধরেই সে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, উঠানে নামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসীটা খসে পড়ে ভেঙে গেল, সে নিজেও পড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোঁসাইবাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিমদেশীয় সন্ন্যাসী কিশোর বা সদ্য-যুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মত পাঁজাকোলে করে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। গোঁসাইবাবার পাশে পাশেই রয়েছি আমি।

এবার গোঁসাইবাবা ডাকলেন—অবিনাশ, মামা!

—অ্যাঁ ?

—কেমন আছ ?

—ভাল আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশদাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিত্তে

ডাইনী আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল। স্বর্গ সে দফা যে মার খেয়েছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

অনেক দিন পর। তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান তরকারি নিয়ে আসত। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন, ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ। স্বর্ণ আসত এরপর আমাদের বাড়ি। আমার ভয় চলে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, স্বর্ণ নিজের দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অন্ধকার ঘরের দুয়ারটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ পৃথিবী-পরিত্যক্ত স্বর্ণ।

স্বর্ণ ছাড়া আরও আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক বেশী। প্রকাণ্ড মাঠে একটা অশ্বত্থগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে গাছগুলি ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝখানে ওই অশ্বত্থগাছটি খানিকটা হেলে দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল। মনে হ'ত গাছটার আধখানা আছে আধখানা নাই। শুনতাম ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন। কাঁউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরমকালের রাত্রে গ্রামের প্রান্তে বসে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে গালগল্প করছে, এমন সময় আকাশপথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে চলছে। সকলে বিস্মিত হল—একি! আশ্চর্য মেঘ তো? গুণীন হেসে বললে—মেঘ নয়! গাছ উড়ে চলছে।

—গাছ? গাছ উড়ে চলে?—কি বলছ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনীবিদ্যা যারা জানে তারা গাছে বসে বিদ্যার প্রভাবে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তরে। ডাকিনী চলেছে আকাশপথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে তুমি ধোঁকা দিচ্ছ।

—দেখবে?

—দেখাও।

গুণীন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে চীৎকার উঠল, চিলের মত চীৎকার, একসঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল দুরন্ত ক্রোধে আকাশের বুক চিরে চীৎকার করে উঠল—ঈ—।

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ করেই চলল। মেঘের মত জিনিসটার গতি থামল না। কিন্তু সে সামনে আর ছুটল না। পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে মাটির উপর নেমে এল এক অশ্বত্থগাছ। গুণীনের মন্ত্র তখনও থামেনি। মাটি ফাটল, গাছের শিকড় মাটির সেই ফাটলে ঢুকল, গাছটি এখানে জন্মানো গাছের মত সোজা হয়ে দাঁড়াল! তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা—গাছের মাথায় দেখা দিল অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে। একপিঠে

মেয়েটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন, দশের সামনে এই অবস্থায়! আমাকে লজ্জা দিলে! আমি ডাকিনী হলেও মেয়েছেলে, আমার লজ্জা রক্ষা কর, আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন হাত বাড়িলে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে।—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী তাদের সবুর হল না।

একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন তাকে ধমকে দিলে—না।

ততক্ষণে একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেয়েটিকে ছুঁড়ে দিলে। গুণীন আঁতকে উঠল—করলি কি? করলি কি?

ডাকিনী খিলখিল করে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত সামনের দিকে ঢেকে নিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের দিকে গামছাটার প্রান্তটা ধরে উপরের দিকে টেনে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার করে ফেলে দিলে। গুণীন মর্মান্তিক চীৎকার করে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়াও পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উলটে গেল। চামড়া ছাড়ানো মানুষটা পশুর মত আর্তনাদ করে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল সেই গাছে।

গুণীন সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল।

মন্ত্র আধখানার বেশী পড়তে পারলে না সে। গাছটা আধখানা উঠল না, আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ন্ত মেঘের মত চলে গেল—কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে। এই অশ্বত্থ গাছটা সেই আধখানা গাছ।

আজ সেকালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনীতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। ডাইনীও আজ আর নাই বললেই হয়। অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে যারা আজ ডুবে আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে। সেকালের ডাইনীর বিচিত্র গল্পও আজ লোকে ভুলে আসছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শুধু অন্ধ বিশ্বাসই তো নাই—আছে কত মানুষের মর্মান্তিক বেদনা। সারাটা জীবন তারা এই অপবাদের গ্লানি বহন করে চলত। নিজেরাও বিশ্বাস করে নিত এই অপবাদকে সত্য বলে আর ভগবানকে ডাকত স্বর্ণের মত—আমার এ লজ্জার বোঝা নামিয়ে দাও প্রভু। এ ভয়ংকর জীবনে অবসান কর। চোখের জল মুছে ফেলত কাপড়ের আঁচলে, মাটিতে কোনক্রমে একফোঁটা ঝরে পড়লে শিউরে উঠত, মা বসুমতীর বুক যে জ্বলে উঠবে।

ভুলোর ছলনা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভুলো কে জানো ? মানুষ নয়। ভুলো কুকুরও নয়। ভুলো মানে ভ্রান্তি—যা ভোলায় ; মিথ্যে ভুলে ভোলায়। আমাদের দেশে বলে—ভুলো হল একরকম ভূত। ব্রহ্মদৈত্য, মামদো, শাঁখচুন্নী, গোদানা, গলায়দড়ের মত এও এক রকমের ভূত! নিশির নাম অনেকে জানে—ভুলো অনেকটা নিশির মত। কিন্তু নিশি ডাকে ভোরবেলা কি মাঝরাত্রে, ভুলোর খেলা সব সময়েই। তবে ঠিক সন্ধ্যার পর থেকে একটু অন্ধকার হলে ভুলোর খেলা জমে ভাল। নিশি, ভূত বা প্রেতিনীর সঙ্গে মিল এর অনেকটা। তফাত—নিশি ডাকে ঘুমের মধ্যে আর ভুলোর খেলা জাগ্রত মানুষের সঙ্গে।

হয়তো কেউ সন্ধেবেলা যাচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তা ধরে, ভাবছে কোন বন্ধুর কথা কি আপন জনের কথা, হঠাৎ একসময়ে সে বন্ধু তার সামনে এসে দাঁড়াল, বলল—এই যে রে!

সে বললে—তুই ? আরে তোর কথাই ভাবছিলাম যে!

—হ্যাঁ রে, তাই তো এলাম। এখন আয়, আমার সঙ্গে আয়।

মানুষটার মনেও হবে না যে বন্ধু কোত্থেকে এল। হয়তো তখন আসল বন্ধ দশ বিশ মাইল কি একশো মাইল দূরে রয়েছে, সে কথা লোকটি জানে, তবু তার মনে সেই প্রশ্নই জাগবে না। ভুলের মায়া। সে বিগলিত হয়ে যাবে তাকে দেখে ; এবং মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পিছনে পিছনে চলবে। ভুলে চলবে পথ ছেড়ে অপথে বিপথে, খানাখন্দ কাঁটা খোঁচা ভরা জায়গার উপর দিয়ে, মায়ায় ভোলা মানুষটার মনে সে কথা উঠবে না, জিজ্ঞাসাও করবে না যে এদিক দিয়ে কোথায় চলছিস ভাই। মনে তখন ঘোর লেগেছে তার, সে চলবে মুখ বন্ধ করে।

তারপর ? তারপর মানুষটার দেহ হয়তো পাওয়া যাবে কোন খানাখন্দের মধ্যে ; নয়তো কোন নদীর দহে। নয়তো কোন উঁচু জায়গার নীচে একটা পাথরে মাথা ছেঁচে পড়ে থাকবে।

লোকটা ভুলো-ভূতের সঙ্গী হয়ে গেল এরপর থেকে।

তার বাসা হল যে জায়গায় সে মরেছে সেই জায়গায় আর ভুলো ফিরে গেল আপন জায়গায়।

রাত্রে দুজনে মাঠের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল আর কাকে সঙ্গী করা যায়। আর না হয় তো রাত্রে মাঠের মধ্যে নাচতে গাইতে লাগল—

হায় কি মজা হায় রে—
ভুলের খেলা মজার খেলা খেলবি যদি আয় রে।

ফুস মন্তর ভুল ভুলিয়া—যাবি রে সব দুখ ভুলিয়া—

এমনি ধরনের গান। গানটা অবশ্য আমি আন্দাজ করে লিখলাম। কারণ কী গান যে তারা গায় সে আমি কানে তো শুনি নি। তবে হ্যাঁ, ভুলো-ভূতে লোককে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ আমি দেখেছি। আরে বাপ, সে কী কাণ্ড! ভুলোয় ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—একশো লোক ভুলোলাগা লোকটাকে ধরবার জন্যে ছুটেছে ; কিন্তু তাকে কিছুতে ধরতে পারছে না! ভুলো দেখছে লোকে দেখেছে তার কাণ্ড, ছুটে আসছে ওকে ধরে জোর করে আটকাবার জন্যে, লোকটা সোজা ছুটলে ধরে ফেলবে, সুতরাং ভুলো-ভূত তখন এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল—সোজা চলছে, হঠাৎ ডাইনে বেঁকল, তারপর আবার বাঁয়ে, তারপর আবার বাঁয়ে—তারপর বাঁয়ে কখনও বা একেবারে উলটো মুখে ; আর তার পিছনে ভুলোলাগা মানুষটা ঠিক সেই পথে তেমনি করে এঁকেবেঁকে ছুটতে লাগল। ফলে যারা পিছন থেকে ধরতে আসছে তারা কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না। অবশেষে ভুলো-ভূত একটা গাছে মিলিয়ে গেল—কি সামনে নদী পড়ল তো তার মধ্যে ডুবল। পিছনের ভুলোলাগা লোকটাও গাছে ধাক্কা খেয়ে মরল, নয়তো নদীতেই ভুলোর সঙ্গে ডুবল।

কখনও কখনও লোকে ধরে ফেলে, কিন্তু তাতেও বিপদ, লোকটা তখন সব ভুলে গেছে। মা-বাপ-স্ত্রী সব। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ আমি চোখে দেখেছি। ভুলোলাগা লোকটাকে বহুকষ্টে ধরেছি। তারই কথা বলছি তোমাদের।

একেবারে হুবহু সত্য, আগাগোড়া। বানানো নয়। সেইজন্যে এ কাহিনীর মধ্যে যে আমি বলে লিখছে সে আমিই—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ি লাভপুর।

ঘটনাটা অনেক দিনের। বলি শোন।

ইংরেজী ১৯২৯ সাল। আমি তখন লাভপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। সেকালে ইউনিয়ন বোর্ড ছিল ; এখন উঠে গিয়ে পঞ্চায়েত হয়েছে।

পাঁচ-সাত কি ন'দশ খানা গ্রাম নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড। লোকের উপর ট্যাক্স করে, সেই ট্যাক্স আদায় করে চৌকিদারদের মাইনে দেয় আর যা বাড়তি থাকে তা থেকে করে কিছু গ্রাম্য রাস্তা-ঘাট, কিছু পানীয় জলের জন্যে কুয়ো। আর দেশে তখন প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া—তার জন্যে সরকারের কাছ থেকে পাওনা সিনকোনা ট্যাবলেট বিতরণ করে। ডোবায় কেরোসিন দেয় মশার ডিম মারবার জন্যে।

তখন আমি সাহিত্যিক নই। তখন দেশের কাজ করি, কংগ্রেস করি, বাসনা দেশের সেবা করব। দেশ স্বাধীন করব। তার সুবিধের জন্যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছি। কিছু কাজ তো করা যায় এ থেকে! আমার বয়স তখন একত্রিশ বছর। রাস্তাঘাট করাই ; তার সঙ্গে এই ম্যালেরিয়া নিবারণে কাজটা নিয়েছি। মশা মারতে হবে। অ্যানোফিলিস মশা দূর হলেই ম্যালেরিয়া যাবে। কারণ মাছি যেমন কলেরার বীজ ছড়িয়ে বেড়ায় তেমনি অ্যানোফিলিস-ই ম্যালেরিয়ার বিষ ঢুকিয়ে দেয় মানুষের দেহের রক্তে।

সে সময় গুরুসদয় দত্ত ছিলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। মশা মারবার জন্যে তিনি

একটা নতুন সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছেন তখন।

আগে জঙ্গল সাফ করে, ডোবায় কেরোসিন দিয়ে মশা মারবার উপায় আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সে প্রায় কামান দেগে মশা মারার মত ব্যাপার। গ্রাম অঞ্চলে কত জঙ্গল পরিষ্কার করবে। কত খানা ডোবায় কেরোসিন দেবে। সে খরচের টাকা কোথায় ?

দত্ত সাহেব পথ বের করেছেন—সহজ পথ, কামান না, বন্দুক না, লাঠি না। মশাও তোমাকে মারতে হবে না; তুমি টোপা 'ডুঁরুলি' বা পানা নির্মূল করে ফেল, তাহলে অ্যানোফিলিস ঝাঁকবন্দী থাকলেও ওদের কামড়ে ম্যালেরিয়া হবে না। ওই টোপা পানার রস খেয়েই অ্যানোফিলিস মশার ভিতর ম্যালেরিয়া জন্মায়, তখন সে কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয়।

ধর, মাতালের উপদ্রব হয়েছে! মাতালেরা দাঙ্গা করছে। নিত্য চেঁচামেচি করছে, গালাগালি করছে মাতাল অনেক। সুতরাং মাতাল তুমি কত ধরবে কত বাঁধবে ? তার থেকে তুমি যদি মদের দোকান তুলে দাও, তবে মাতাল আর কেউ হবে না। লোকগুলো তো আর মদ না খেলে মাতলামি করতে পারবে না।

মদের দোকান তোলা যায় না। কিন্তু মশার বিষ শেষ করতে টোপা ডুঁরুলি বা পানা নিশ্চয় শেষ করা যায়। খরচও এতে অনেক কম। সুতরাং ইউনিয়ন বোডে বোর্ডে হুকুম এল—টোপাপানা বা ডুঁরুলি তুলে ফেল।

দত্ত সাহেব নিজে উৎসাহী হয়ে দলবল জুটিয়ে পুকুরের ডোবায় নেমে টোপাখানা পরিস্কার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কাজ শুরু করেছিলেন। টোপাখানা তুলে তার চারপাশে খড়কুটো দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতেন। তার চারপাশে তাঁর দলের লোকেরা ঘুরত এবং গান করত—

মশার মাসী, সর্বনাশী ; আয় দোব তোর গলায় ফাঁসি—
ছিঁড়ব রে তোর ঘেরাটোপ—পোড়াব তোর দাঁড়ি গোঁফ।

আরও বড় গান। সব ঠিক মনে নেই। যাই হোক, টোপাখানা মশাদের দাঁড়িগোঁফওয়ালা মাসী—সেই সর্বনাশী মাসীকে নির্মূলের ব্যবস্থা করা ছিল তখন ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ।

প্রথম একদফা অনেক লোক লাগিয়ে গ্রামের যে সব পুকুরে টোপাপানা ছিল—তা সব তুলে দিয়ে পুড়িয়ে ব্যবস্থা করা হল যে নিয়মিতভাবে দুজন করে লোক কাজ করবে প্রতি গ্রামে যাদের কাজ হবে পুকুরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখা আর একটা দুটো যেমন দেখা যাবে অমনি তুলে ফেলা।

লাভপুরের এই কাজের জন্য দুজন বাউড়ী জোয়ানকে রাখা হয়েছিল। নিতাই এবং পাঁড়ে। নিতাইয়ের নাম তোমাদের শোনা নাম কিন্তু পাঁড়ের নাম 'পাঁড়ে' অর্থাৎ পাণ্ডে কেন তার অর্থ বলব কি আমিও ঠিক জানি না। পাঁড়ে বাউড়ী। অর্থাৎ দস্তুর মত নাম। পাঁড়ে আজ বেঁচে নেই কিন্তু নিতো আজো আছে। বুড়ো হয়েছে। এরা দুজনে ছিল বন্ধু। খুব কড়া খাটুনি তারা খাটতে নারাজ ছিল; চাষ করত না, কারুর ঘরে 'মান্দেরি'ও করত না। হালকা কাজ খুঁজে বেড়াত। এবং

ত্র জন্যে মজুরি তারা কম হলেও আপত্তি করত না। এই গ্রাম ঘুরে এখানে ওখানে ডুঁরুলি বা টোপাখানা খুঁজে তুলে ফেলার কাজটা তারা খুশি হয়ে নিয়েছিল। সকালে উঠে—তামাক টামাক খেয়ে দুজনে বের হত ; বিড়ি টানত এবং ডুঁরুলি দেখলে তুলে ফেলে গাছতলায় জিরিয়ে নিত, গান গাইত। খাবার বেলা অর্থাৎ বারোটা বাজতে চক্কর দেওয়া শেষ করে দেখাবার জন্যে কিছু ডুঁরুলি গামছায় বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরত। জল খেয়ে বটতলার ছায়ায় ঘুম এবং আড্ডা। বিকেলে চারটের পর স্নান করে টেড়ি কেটে কিছু মদ খেয়ে আসত ইউনিয়ন বোর্ড আপিসে। ডুঁরুলিগুলো দেখিয়ে ফেলে দিত গর্তে, মাটি চাপা দিত—তারপর ইউনিয়ন বোর্ডের খাতায় বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে প্রত্যেকে ছ-আনা পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে মদের দোকানে গিয়ে আনা দুই-তিনের পচাই মদ খেয়ে টলতে টলতে বাড়ি ফিরত। আমি তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে থাকতাম। পয়সাকড়ি দিয়ে সকলকে বিদায় করে আমিও ফিরতাম বাড়ি। বন্ধুরা বসে আছেন তখন আসর জমিয়ে, তাস খেলছেন।

এরই মধ্যে একদিন—১৯২৯ সালের শ্রাবণ মাসের শেষ। তার আগে একটা কথা বলার দরকার। সেটা এই যে, বাঙলা দেশে ১৯২৯ সালে খুব ভাল বর্ষা হয়েছিল ; শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহ্ আসতে আসতে শেষ হয়ে গেছে। মাঠ সবুজ ধানে ভরে উঠেছে। আষাঢ়ে পোঁতা জমিতে ধান বেশ বড় হয়েছে ; তা প্রায় উঁচুতে হাঁটুর সমান এবং ঝাড়ে-গোছেও বেশ মোটা হয়েছে। পুকুর ডোবা নালা নদী জলে টইটুম্বুর। আমাদের গ্রামের গায়ে দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা রেললাইন, তার দক্ষিণে মাইলখানেক বিস্তৃত ধানের ক্ষেতের ওপারে কুয়ে নদী। কুয়ে তখন ভরাভর্তি।

সেদিন বিকেলে সাড়ে চারটের সময় বোর্ডে গেলাম। দেখলাম নিতো বা নিতাই এসে বসে আছে—পাঁড়ে আসেনি। নিতোকে বলেছে—তু চল এগিয়ে, আমি যাচ্ছি! তু কিন্তুক আগে ভাগে নিয়ে যেন চলে আসিস না। দুজনে পয়সা নিয়ে মদের দোকানে ফিরব।

সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা, পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত আমরা অর্থাৎ সেক্রেটারি এবং আমি বোর্ডের কাজকর্ম সারলাম—অপেক্ষা কেবল পাঁড়ের, সে এলে নিতোর এবং তার টিপ নিয়ে পয়সা দিয়ে বাড়ি ফিরব।

ছ-টার সময় বললাম—কই রে, পাঁড়ে এল কই!

নিতো মদ খানিকটা খেয়েছিল—তার ঝোঁকে এবং চুপচাপ বসে থাকায় ঝিমুনিতে সে মধ্যে মধ্যে ঢুলছিল। আমার কথায় সজাগ হয়ে উঠে চোখ কচলে বললে—তাই তো মশায়, কই এল। সে নিশ্চয় আসবে বলেছে।

খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল সে।—তাই তো!

কিন্তু আমরা বসে থাকি কত ? সন্ধে হয়ে আসছে। সেক্রেটারি বাড়ি যাবার জন্য উসখুস করছে, আমার মনও টানছে তাসের আড্ডায়। তবু আরও মিনিট দশেক বসে থেকে বললাম—তাহলে টিপ ছাপ দিয়ে তোর পয়সা নিয়ে যা।

পাঁড়ের পয়সা বাকি রইল, কাল নেবে।

তাই নিয়েই সে যেন চিন্তিত মনে উঠে গেল। বিড়বিড় করতে করতে গেল—শালার কাজ দেখ দিকি। শালা বদমাশ কোথাকার!

কথাটা আমার কানে এল। আমরা বোর্ড থেকে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম নিতো পশ্চিম মুখে চলেছে, যাবার কথা তার পুব মুখে। বুঝলাম, পশ্চিম মুখে একটু এগিয়ে গিয়ে সে রেললাইন ধরবে। পুব মুখে ফিরে সোজা এসে উঠবে তাদের পাড়ায়। তাদের পাড়াটা আমার বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে, একেবারে লাগাও। স্টেশনের গায়ে।

বাড়ি ফিরলাম—তখন অন্ধকার হয়েছে। আমার বৈঠকখানায় তখন আলো জ্বেলে তাসুড়ে বন্ধুরা বসে গেছেন। আমিও পাশে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই থি হার্টস, থ্রি নো-ট্রামসের ডাকের নেশা জমে উঠল।

হঠাৎ নেশাটা যেন একটা ঠোক্কর খেয়ে ভেঙে গেল। ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা গোলমাল উঠল।

—গোলমাল ? কিসের গোলমাল ? বৈশাখ–জৈষ্ঠ্যে আগুনের ভয় থাকে কিন্তু এটা বর্ষাকাল এবং সেবারকার মত ভরাভর্তি জমজমাট বর্ষাকাল। আগুন লাগার তো কথা নয়। কান বাজিয়ে শুনলাম।

বহু লোকের একটা আক্ষেপ এবং শঙ্কাপূর্ণ একটা 'গেল রে—গেল রে' শব্দ!

ঠাওর করতে পারল না— কী গেল! গেল বা যাচ্ছে—যেন টেনে ছিঁড়ে কিছু চলে যাচ্ছে বা কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

কোলাহলটা নিকটে—ওই রেললাইনের ধারে। আমার বৈঠকখানা থেকে ধীরে সুস্থে পাঁচ-ছ মিনিটের পথ। দৌড়ে গেলে তিন-চার মিনিট লাগে।

আমরা কেউ বসে থাকতে পারলাম না ওই গেল গেল শব্দ শুনে। সকলে ছুটেই বেরিয়ে এলাম। এবং মিনিট দুয়ের মধ্যে গ্রামপ্রান্তে এসে নজরে পড়ল রেললাইনের উপরে অনেক লোক। তারা দাঁড়িয়ে ওই 'গেলরে—গেলরে' বলে একরকম হাহাকারই করছে। লাইনের ওপারে মাঠে দেখলাম গোটা দুই লণ্ঠনের আলো যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একবার এদিক একবার ওদিক, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে! আলেয়ার মত।

লাইনে এসে উঠে দেখলাম বাউড়ীপাড়ার মেয়েপুরুষেরা সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ওই হায় হায় করছে। কতকগুলি পুরুষ চেঁচাচ্ছে—গেল রে। গেল রে। ওই রে!—কতকগুলি ভদ্রলোকও তখন এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা বলছেন—ওই ! ওই ! না ?

—কী হয়েছে ?— জিজ্ঞাসা করলাম সামনে যাকে পেলাম।

সে আমাকে চিনে কেঁদে উঠে বললে—ওগো বাবু গো, নিতোকে ভুলোতে নিয়ে গেল গো। নিতোকে ভুলোতে নিয়ে গেল।

ভুলোতে নিয়ে গেল—কথাটা চট করে বুঝিনি। বললাম, নিতোকে ভুলোয় নিয়ে গেল কি?

সে বললে—হ্যাঁ বাবু, ওই দেখ মাঠে মাঠে ছুটছে গো, আর চেঁচাচ্ছে— দাঁড়া রে দাঁড়া রে— পাঁড়ে রে দাঁড়া রে!

বিরক্ত হয়ে বললাম—মানে কী ?

—ও গো ভুলো ভূত, পাঁড়ে সেজে এসে ওই দেখ মাঠে মাঠে ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, কেউ ধরতে পারছে না। নিয়ে গেল নদীতে ডুবিয়ে মারবে গো ; ছামুতে নদী দুকূল পাথার আঃ আঃ ভরা জোয়ান গো—আঃ আঃ।

—পাঁড়ে কোথায় ?

—সি ওই দেখ, ওইখানে রইচে গো। ভয়ে ডরে সিও কাঁপছে। নিতো মলে সে যে ওকে লেবে গো!

অর্ধেক বুঝলাম, অর্ধেক বুঝলাম না। তবু মাঠে নেমে পড়লাম। আমার সঙ্গে জন দুই সঙ্গী, সামনে ওই বিস্তীর্ণ এক মাইল স্কোয়ার জলে টইটুম্বুর ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে। প্রায় দুশো গজ দূরে তখন আলোগুলো ইতস্তত ছুটোছুটি করছে—এদিক ওদিক সেদিক কখনও সোজা কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে। জল ও ধান-ভরতি জমির আলের উপর দিয়ে আলো হাতে যেতে গেলে এমনিই হবে। আর এতক্ষণ অন্ধকারে থেকে অন্ধকার-অভ্যস্ত চোখে দেখলাম—কালো কালো মানুষ অন্তত ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকারে প্রেতযোনির মত ছুটোছুটি করছে। এবং তার খানিকটা আগে চিৎকার হচ্ছে, তারস্বরে আর্তকণ্ঠে ব্যাকুল হয়ে কেউ প্রাণ ফাটিয়ে ডাকছে—দাঁ-ড়া-রে, দাঁ-ড়া-রে—পাঁ-ড়ে-রে, দাঁড়া রে, ও রে দাঁ ড়া রে!

কণ্ঠস্বর নিতোর তা চিনতাম। কিন্তু কাকে বলছে ? পাঁড়ে স্টেশনে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ভয়ে। কিন্তু নিতো যাকে ডাকছে সে যে তার সামনে—তাতে তো সন্দেহ নেই। সে যেন নিতোর চেয়েও জোরে ছুটে চলেছে সামনে এঁকে-বেঁকে—কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে কখনও সোজা। যেন সে হাওয়ায় উড়ছে। নিতো দুই হাত বাড়িয়ে তাকে ধরবার জন্যে ছুটছে—ছুটছে। যেন সে হারিয়ে যাবে, যেন সে পালিয়ে যাবে। নিতো আর তার কখনও নাগাল পাবে না।

পিছনের লোকেরা বহু জনে একসঙ্গে ডাকছে, নিতো! নিতো থাম—থাম! কিন্তু নিতো বধির হয়ে গেছে। সে শুনতে পাচ্ছে না। তার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে যেন সমস্ত পিছনটা চিরদিনের মত ফেলে চলে যাচ্ছে।

কে যেন টর্চ ফেললে। টর্চের আলোটা নিতোর চিৎকার লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে পড়ল, দেখলাম—দু' হাত বাড়িয়ে নিতো ছুটছে ; আশ্চর্য সে হাত বাড়ানো। এবং আশ্চর্য সে তার ছোটা। ঊর্ধ্বশ্বাসেই শুধু নয়, দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্যের মত ছুটছে। জল এবং ধান-ভরা মাঠ ভেঙে ছুটছে। কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে কখনও সোজা। কখনও কখনও পড়ছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। একবার দাঁড়ায় না। আরও আশ্চর্য এই যে, পিছনের অনুসরণকারীরা যখন কাছে এসে পড়ছে তখন হঠাৎ আরেক দিকে বেঁকে সে ছুটে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে জল ভেঙে কাদা ভেঙে। অনুসরণকারীরাও প্রাণপণে ছুটছে কিন্তু জলে ধানের

মধ্যে নামতে পারছে না তারা। তারা আইলে আইলে ছুটছে। ঘুর হচ্ছে। ততক্ষণে নিতো আরও এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনের আলোর ছটার প্রতিও তার দৃষ্টি ফিরছে না। মানুষটা যেন উন্মাদ, মানুষটা যেন দানবের মত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে— প্রাণের ব্যাকুলতায় ব্যগ্রতায় ব্যগ্রতায়।

—পাঁ-ড়ে-রে—পাঁ- ড়ে-রে—দাঁ-ড়া-রে—দাঁড়া-রে!

চলছে কিন্তু ঠিক পুব-দক্ষিণ মুখে। নদীর দহের দিকে। রেললাইন সোজা পূর্বমুখে এসে একটা বাঁকে দক্ষিণমুখে মোড় নিয়ে নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চলে গেছে। তার পাশেই প্রকাণ্ড দহ—সেই মুখে চলেছে।

মুহূর্তে মুহূর্তে দূরে চলে যাচ্ছে—নিতোর সামনে ভুলো পাঁড়ের চেহারা ধরে হাওয়ায় ভর দিয়ে ডেকে নিয়ে চলেছে। আয়—আয়—আয়।

আমরা কেউ দেখতে পাই বা না পাই, নিতো তাকে দেখছে। ওই চলছে নিতো—ওই—ওই!

আলোগুলো কাছে গেল। এইবার ওকে ধরবে।

কিন্তু মুহূর্তে নিতোর কণ্ঠ উলটোমুখী হয়ে ছুটে চলল—। যাঃ—আলো অনেক পিছনে পড়ে গেল দেখতে দেখতে। নিতো ছুটেছে পুলের দিকে। পুলের ওপাশে দহ। পুলের মুখটা বড় বড় পাথর দিয়ে ঢেকে তারের জাল দিয়ে বেঁধে অন্তত দোতলা বাড়ির সমান উঁচু এবং লাইনের মুখটা লোহার স্পাইক দিয়ে মানুষ জন্তু জানোয়ারের পক্ষে অনধিগম্য করে রেখেছে। যেন কেউ লাইন ধরে ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার না হতে পারে। পুল থেকে পড়লেও মরবে নিতো ডুবে। পুলে উঠলে হয় জালে পা বেঁধে পাথরে আছাড় খেয়ে পড়ে মরবে, নয় উপরে উঠে ওই স্পাইকে গেঁথে যাবে।

নিয়ে গেল নিয়ে গেল— ভুলো তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

তখন আমি রেললাইনের দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল মাঠ ভেঙে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এবং নিতো তখন আরও সিকি মাইলের বেশি দক্ষিণে নদীর দিকে ক্রমশ ঢালু এবং জলা ধানভরা ক্ষেতের মধ্যে উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে মিনিটে মিনিটে আরও দক্ষিণে নদীর কিনারার দিকে চলেছে।

শুনতে পাচ্ছি— দাঁড়া রে—দাঁড়া রে— দাঁড়া রে।

ক্রমশ কণ্ঠস্বর দূরবর্তী হচ্ছে। এরপর নদীগর্ভে, নয়তো ওই ব্রিজের মুখে দোতলা সমান উঁচু বাঁধে উঠে আছড়ে পড়বে। ওই ভুলো—সে তাকে নৃশংসভাবে ডুবিয়ে অথবা পাথরে আছড়ে মেরে নিঃশব্দে হাসবে!

মনে পড়ছিল এখানকার গল্প। চলিত গল্প এই যে বহুকাল পূর্বে এই মাঠে একজন পাষণ্ড বন্ধুর ছদ্মবেশে একজনকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে মাঠের মধ্যে হত্যা করেছিল। তখন থেকে সেই খুন হওয়া মানুষটি এখনো ভুলো-ভূত হয়ে আছে। সুযোগ পেলেই আত্মীয় বা বন্ধুর বেশ ধরে অন্যমনস্ক মানুষকে এমনি ভাবে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে। মনে পড়ল আমাদের গ্রামের সুধীরবাবুকে ঠিক এমনি সন্ধেবেলা তাঁর দাদা সেজে এসে ডেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অন্য মানুষের চোখে পড়েছিল—তাই রক্ষা পেয়েছিলেন ; তারা তাঁকে ধরে

ফেলেছিল। তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর অবশ্য জ্ঞান হয়ে সুস্থ মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু কেউ না দেখলে হয়তো তাঁরও বিপদ ঘটত।

আরও অনেক ঘটনা। ঠিক ওই রেললাইনে একটা মাইলপোস্ট যেখানে পোঁতা আছে ওইখানেই নাকি এই ভুলোর আত্মা ঘুরে বেড়ায়। ওইখানেই নাকি তাকে মেরেছিল বিশ্বাসঘাতকতা করে।

ভাবছি—এমন সময় একজনকে পেলাম। সে শশী ডোম। আমাদের ওখানকার বিখ্যাত চোর। লম্বা ছিপছিপে মানুষ। শশী চুরির জন্যে জেল খেটেছে অনেকবার কিন্তু কেউ কখনও তাকে ধরতে পারেনি। তিন হাত সামনে থেকে ছুটলে মিনিটে তিন হাত ব্যবধান সাত হাত হয়ে যায় এবং পাঁচ মিনিটে সেটা বেড়ে পঁচিশ হাত এবং তারপরই সে মিলিয়ে যায়। এমন তার গতিবেগ। এমন সে দৌড়তে পারে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলে গেছে এবং নদীর ব্রিজের ঠিক মুখটায় একটা অন্যটাকে কেটে চলে গেছে। মনে হল, শশী যদি সেই দৌড় দৌড়ে যায় তাহলে নিতোর আগেই হয়তো ব্রিজের মুখটা আগলাতে পারে। নিতোকে যদি ভুলো নদীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে তবে হাত নেই, কিন্তু যদি ব্রিজের বাঁধে তুলে পাথরে আছড়াতে চায় তবে হয়তো শশী তাকে রক্ষা করতে পারবে। নিতোকে ধরে ফেলতে পারবে।

শশীকে বললাম—শশী একবার চেষ্টা করতে পারিস। তুই একবার সেই দৌড় দে না বাবা। গিয়ে দাঁড়া ব্রিজের উপর।

শশী বললে—যদি নদীতে যায়—

বললাম—তা হলে হাত নেই। তবু দেখ।

শশী ছুটল এবং শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মধ্যে মিনিট দু-তিনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ছুটবার সময় শশীর হাঁটুতে মটমট শব্দ হত। সে শব্দটাও শুনতে পেলাম না।

পিছন পিছন আমি এবং আরও দু-তিন জন ছুটলাম। তখন আমার ফুটবল খেলা অভ্যেস ছিল। দৌড়াতে আমিও পারতাম। বয়সও তখন তিরিশ-একত্রিশ।

ওদিকে মাঠের মধ্যে শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রিতে জলো মাঠের মধ্যে কয়েকটা আলো ছুটোছুটি করছে, দিশাহারার মত ছুটছে, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে কখনও সোজা ; আর তার সামনে এক বুক ফাটানো ডাক—দাঁড়া রে! দাঁড়া রে! দাঁড়া রে পাঁড়ে রে!

সম্মুখে তার ছুটেছে পাঁড়ের ছদ্মবেশী প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত ভুলো-ভূত। তাকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, দেখছে শুধু ওই ভুলোর ছলনায় মোহগ্রস্ত নিতো। দু-হাত বাড়িয়ে সে ছুটছে—তাকে ধরবে তাকে ধরবে। 'পাঁড়ে ভাই।' তার কাছে স্থান বিলুপ্ত কাল বিলুপ্ত সব বিলুপ্ত। কতগুলো আলো সে দেখতে পাচ্ছে না। এত ডাক সে শুনতে পাচ্ছে না। পায়ের তলায় কাঁটা বিঁধছে, সে বুঝতে পারছে না। ভুলো ছলনায় তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। সে হাঁফাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড

ফেটে পড়তে চাইছে, স্থির চোখদুটো হয়তো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে—তবু তার থামবার উপায় নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর বন্ধুকে ধরবার ব্যগ্রতা উদ্দাম থেকে উদ্দামতর হয়ে উঠছে। পরম বন্ধুর ছদ্মবেশী প্রেত নিঃশব্দ হাসি হেসে বলছে—আয় আয় আয়! ওই নদীতে পাথারে ঝাঁপ খাব দুজনে। কিংবা আয় না ওই পুলের বাঁধের উপর দুজনে জাপটাজাপটি করে পড়ব পাথরের উপর। তারপর দুজনে বসে—হি— হি— কত মজা করব।

ছুটছিলাম আর ভাবছিলাম। পাকা রাস্তাটা রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমে দিকে বেঁকল—পূর্ব মুখ থেকে দক্ষিণ মুখে, সামনে দেড়শ' গজ দূরে লাইন আর রাস্তা একসঙ্গে মিশেছে। এরপর রাস্তাটা চলে গেছে রেললাইন ক্রস করে পুব দিকে। যদি ওইখানে—শশী গিয়ে—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হল না। অন্ধকার চিরে শশীর ডাক শুনলাম—ধ-রে-ছি।

ধরেছে! শশী ধরেছে আঃ!—আমরা আরও জোরে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম মানুষের কাছে ভুলো হয় হেরেছে নয় নিতোকে নিয়ে খানিকটা নিষ্ঠুর আমোদ করে বা এতগুলো মানুষের ব্যগ্রতা দেখে নদীতে না ডুবিয়ে ওই পুলের বাঁধের উপর তুলে শশীর হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

আমরা যেতে যেতে যে আলোগুলো নিতোর পিছনে এতক্ষণ ব্যর্থ ছোটাছুটি করেছে তারা এসে গেল। স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়াল।

আমরা পৌঁছে দেখলাম, শশী নিতোকে ধরেছে। দশ বারোটা আলো চারদিকে তাকে ঘিরে রয়েছে। সর্বাঙ্গ জল কাদায় ভরা, তার সঙ্গে রক্তের চিহ্ন—নিতো বসে আছে পাথরের মূর্তির মত। তার চোখ দুটো স্থির, জবাফুলের মত রাঙা। হাপরের মত হাঁফাচ্ছে। দৃষ্টি বিহ্বল ; এবং নির্বাক। বোবা! লোকে ডাকছে—নিতো! নিতো! সে বোবা। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

দেখতে দেখতে এল তার বাবা তার দাদা তার মা, স্ত্রী।

তারা ডাকলে— নিতো বাবা! নিতো!

ভাই ডাকলে—নিতো রে, নিতো!

স্ত্রী ডাকলে—ওগো! ওগো!

কিন্তু নিতো বোবা, নিতো কালা। সে বসে আছে সেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। কাউকে সে চিনতে পারছে না। এবার এল সত্যকারের পাঁড়ে। নিতো রে নিতো।

নিতো তাকেও চিনলে না। সে সব ভুলে গিয়েছে।

নিতোর জ্ঞান—চেতনা ফিরল অদ্ভুতভাবে। তাকে ধরে নিয়ে আসা হল বাড়িতে। নির্বাক বিহ্বল নিতো যন্ত্রের পুতুলের মত এল। আমি ডাক্তার দেখাবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু তাদের বাড়ির দোরে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে সে ভয়ার্ত চিৎকার করে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চোখে মুখে জল সিঞ্চনের ফলে তার জ্ঞান ফিরল।

তার মা ডাকলে—নিতো।

এবার নিতো সাড়া দিলে—অ্যাঁ। তারপর বলে—পাঁড়ে ? পাঁড়ে কোথায় ?

পাঁড়ে সামনে এসে বললে—এই যে! আমি তো ঘরেই রইছি রে। তু এমন করে ছুটছিলি ক্যানে ?

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখে বলে—তাহলে সে কি ? অবিকল তোর মত। বলেই শিউরে উঠে চোখ বুজল।

অনেকক্ষণ পর বললে—বাবুর কাছে পয়সা নিয়ে আমি গেলাম পানু সহিসের বাড়ি। মনে করলাম তু সেখানে গিয়ে জমে গিয়েছিস। তা দেখলাম সেখানে তু যাস নাই। তখন দু-ঢোক মদ খেয়ে রেললাইন ধরে আসছি। মুখ আঁধার হয়েছে, তোর কথাই ভাবছি এমন সময় ওই মাইলের কাছে পাথরের ওপরে দেখলাম ত বসে রইছিস। আমি বললাম—পাঁড়ে। তা সে ঠিক তু—সে এসে আমাকে বললে—শালা মজার, ভারি মজার— আয়।

বললাম—কোথা ?

তা আমাকে লাথি মেরে বললে—আয় ক্যানে শালা। ভারি মজা হবে। বলে, লাইন থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে ছুটতে লাগল। আমি বললাম, দাঁড়া দাঁড়া। তা সে হিহি করে হেসে—বললে, আয় শালা আয়—কী ছুট ছুটল। আমিও ছুটলাম। দাঁড়া রে দাঁড়া রে।

থামলো নিতো। বললে—এক গেলাস জল খাব।

তার বাবা বললে—বাবা ভুলোতে ধরেছিল বাবা! খুব বেঁচেছিস রে। ওই নিমচের জোলের ভুলো।

নিতো শিউরে উঠল।

পণ্ডিতেরা শুনে বলেন—ভূলো তো ভূত নয়। প্রেতও নয়। ভুলো ভুল। নিতোরই মনের ভুল। মদের নেশার মধ্যে শুধু পাঁড়ের কথা ভাবতে ভাবতে আসছিল ; তার মন থেকে বেরিয়ে এসেছিল পাঁড়ের একটা কল্পনায় গড়া ছবি। সে যত তাকে ধরবার জন্যে ছুটেছে তত ছবিটাও ছুটেছে। ক্রমে উন্মত্তের মত নিতো ছুটেছে। ভুলে গেছে সব কিছু।

আমিও ভেবেছি। যুক্তি তাইই বলে। মনের কল্পনা। যা একাগ্র মনে ভাবে মানুষ, তা ঘুমের ঘোরে নেশার ঘোরে, এমনকি চিন্তা যদি খুব গভীর হয় তবে এই ভাবেই মানুষ ভুল দেখে। ভুল শোনে। এ ভুল মনই করায়।

তোমরা যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে এই ভাবে পথ হেঁটো না একলা অন্ধকারে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ো না।

এ কথার পরেও কিন্তু আমার এই নিমচের জোলের ভুলো-প্রেত সম্পর্কে সংশয় যায়নি। মনে পড়ে এই মাঠে ওই জায়গাতেই অনেক মানুষ এমনি ভুল করেছে। এই ঘটনার বছরখানেক পরে আমি দেখেছিলাম একজনকে। এমনি করেই মাইল খানেক পথ হেঁটেছিলাম। সে অন্য কাহিনী। এবং কে যেন বলে মানুষের হিংসা মানুষের পাপ নির্দোষ মানুষকে হত্যা করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত করেছে—সে যুগান্ত ধরে এমনি করেই সুযোগ পেলে ভুলিয়ে নিয়ে ছুটবে—নদীর দিকে, পাথরের দিকে, পুকুরের গভীর জলের দিকে আর অট্ট হেসে বলবে—আয়-আয়-আয়—হি-হি-হি—আয়। কেমন মজা দেখ।

তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাস্তায় পুরনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোননি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ির গায়ে টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে—

তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ

> এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়। গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি। আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন। বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে।
>
> দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ি।

হাসিয়া বললাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত তার এই বাড়ি?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষীমশায় বাড়ি আছেন?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোনো উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে তো হয় না, আপনার হ'ল কেমন ক'রে এরকম তো দেখিনি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটা গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তবে তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোনো অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন

আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মানিব্যাগটা খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধহয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে ? এটুকু বোধহয় ধাপ্পা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো মন বুঝে শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোরদৌড়, ফাট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ির ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণমাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পসার নষ্ট হইল। তবু ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনোটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমথ হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই ?

আমার মতো গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাইনি

এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে। ভালো ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনোদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন, দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।' তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোনো একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা সুতরাং—হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিকশক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবু এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোনো মূল্য দিই না। আতর তো বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে contact at a distance–এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার

উপর ততক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপ্‌নটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবু তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখনি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের জাদু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাকম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চর্চা যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্ল্যাক্‌ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'ল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ি এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম– চন্দ্রদর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরনের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ির পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামতো নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম—সব দিন ঘটে উঠত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাসতিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিক্‌লিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির, মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়িতে আর মন টেকে না। ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলেছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু-হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু তো কতই দেখি। চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন— বাবাজীর বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর ? তারপর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেছ ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান ?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ি-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শুনিনি ! সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি ক'রে! খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো ?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্ কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোনো পূর্বপুরুষ, ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন?

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা জানেন দেখছি ?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধ পিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোনো ছেলেমানুষির কথার জন্য। সত্যি বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারিনি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস্ কেন ? ধর্মকর্ম করবি বলে ?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম কিছু করগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন ? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস্ নি, ছাড়তে পারবিও নে। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি। যা বাড়ি যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্ নে।

কথা শেষ ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি করে জানলেন বলবেন না ? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোনো কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূরে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস্ ?

আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোনো লাভ হবে না।

তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্ দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোনো হদিশ মেলাতে পারলুম না। সান্ন্যালদের বাড়ির ছেলে-ছোকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ি এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমার বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেননি। অন্তত দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল। বড় বড় কিস্তি চলত। কোনো নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে ব'লে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট?

তিনি অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া আমাদের পুরনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্টিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল? বই-টই লিখছ না কি?

ওদের কাছে কোনো কথা বলিনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোনো অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড়

তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম মা, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন্, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার উপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি।

আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম, মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস্ তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। এ এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখে আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে না রে? তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ওমা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে। পাগলী আমায় দেখে মারমূর্তি হয়ে শ্মশানের একখানা পোড়াকাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরীয়া হয়েছি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই তো আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে। তোর মুণ্ড চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন

খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মতো—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যে উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস্ বল্ তো? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেছিস, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার? বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতার গন্ধবাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য ব'লে মনে হয়নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি তো অবাক্! ইতস্তত করছি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি এরক রকম অসম্বন্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েছে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছে শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসিহাসি মুখে বলছে—রাগ করিস্ নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক্, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাদু করলে না কি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন। বললে— আবার

এসেছিস দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা তো তুই ?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে ? দিনে অপমান ক'রে বিদেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ রকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি ?

পাগলী বললে—পারবি তুই ? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি ? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম ব'লে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা দিবি। ভোর রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যে হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পার। কেমন রাজী ?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন ?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন ? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা ? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে। ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস্ কেন রে, ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া ? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে হৌসে চাকরি কর্ গিয়ে—বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাব, তখন ঠেকাবে কে ?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী ব'লে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম,

তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না, তোকেও ওবেলা গালাগাল দিয়েছি, কিছু মনে করিস নে। ভালোই হয়েছে, তুই সাধনা করতে চাস্ নি। ও সব নিম্ন-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয় ? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক্ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনোদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা !

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া ব'লে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মতো মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে, তাই রাগ করিস্।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহ'লে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না ? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর

মধ্যে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপ্সা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই কি না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে বলল—আ মরণ, কে তার নামটাই বল না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢ'লে পড়ে আর কি। বললে—এসো না, ব'স না এসে পাশে-লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এসো—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব'লে মনে হ'ল না- তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমায় কোনো বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এসো, ব'স।

বললাম—তুমি ও রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোনো ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্ তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর্। কিন্তু যা ব'লে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্ ? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোনো কালেই, তবু কখনও মড়ার উপর ব'সে সাধনা করব এ-কল্পনাও করি নি। কিন্ত রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এসো।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন্ ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধহয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হাল্‌কা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না ; অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো ? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোনো তফাত নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, ও আপদ ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র

আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোনো বিভাষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোনো দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকার দিগবিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একটা টাটকা মড়ার ওপর ব'সে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে কোনো স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে আমার মনে হ'ল শ্মশানের নিচে নদীজল থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব কর্‌রা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই বল! হরি হরি ! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয় নি—পরক্ষণে আমার চারপাশে মেয়েগলায় কারা খলখল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।.... আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনোটার মাথার খুলি ফুটো, কোনোটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধ'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেছে, সে যেই

ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমায় গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে ? যা হোক্, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না ?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেছি অনেক সাধনা ক'রেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি.....বললাম-আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন....আমার জীবন ধন্য হ'ল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করছ কেন ?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। যখন দেখা দিয়েছি তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা... তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর ক'রে বললাম—সাধনা ক'রে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন ?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে ?

আমার মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।....যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না ? আমাকেও চেন না? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ ? দিব্যৌঘ পথের নাম শোন নি তন্ত্রে ? পাষণ্ডদলনের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড ?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে....অত ভয় কিসের!

তুমি না তোকে লাথি মেরেছি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি। তোকে পরীক্ষা না ক'রে কি সাধনার নিয়ম ব'লে দিয়েছি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল!

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোনো তফাত নেই। একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস্ কি?

আমি কথার কোনো উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ ক'রে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলীও না কি?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কাল হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকেবেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোনো কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনোটার মেরুদণ্ড, কোনোটার কপালের হাড়, কোনোটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবু তাদের নৃত্য সমানেই চলছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ!

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মতো, আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুথালু বেশে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল, বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা-মেঘে ছেয়ে গেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাত্রে! শেয়ালের চিৎকার ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দুচোখ ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে কি ভীষণ ক্রূর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিৎকার করে কেঁদে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেছে ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে। ছাপ্পান্ন বছর.... কাকেই বা বলি ? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পুবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী ব'সে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে... সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না ?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করছে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনায় বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা! তুই তার জানিস্ কি ? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধসুরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকটমূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না ; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল— কি সেটা ?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস্, তিনি মহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন ?

তারপরে সে হঠাৎ হি হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কাবরার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই ? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে এলি ? এই তো সবে সন্ধ্যে—!

—আঁ্যা!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা

হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল—ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিলশকুনির ঝাঁক—সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে ? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে ?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম নয়, তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনোদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন ? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন ?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্ম এমনি কেটেছে—এ-জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাইনি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনোদিন।

তখন আমি চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত— তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝবে ? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও ? এসো চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাতত চন্দ্রদর্শন অপেক্ষা গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

মায়া

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনো অল্প অল্প যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে রাস্তা চলে গেল সিঁদরানির দিকে। চলি সেই রাস্তা ধরেই। রাঁধুনী বামুনের চাকরিটুকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক্, তাতে কোনো দুঃখু নেই, দুঃখু এই, অবিচারে চাকরিটা গেল। ঘি চুরি আমি করিনি, কে করেচে আমি জানিও না, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্ষে, বেজেরডাঙা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল। খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পয়সা থাকলেও খাবার দোকান এ পর্যন্ত এ-সব অজ পাড়াগাঁয়ে চোখে পড়ল না।

রাস্তার এক জায়গায় ভারি চমৎকার একটা পুকুর। স্নান করতে আমি চিরকালই ভালোবাসি। পুকুরের ভাঙা ঘাটে কাপড় নামিয়ে রেখে জলে নামলাম। জলে অনেক পানা-শেওলা, সেগুলো সরিয়ে পরিষ্কার জলে প্রাণ ভরে ডুব দিলাম। বৈশাখের শেষ, গরমও বেশ পড়েচে, স্নান করে সত্যি ভারি তৃপ্তি হোল। পুকুরের ধারে একটা তেঁতুলগাছের ডালে ভিজে কাপড় রোদে দিলাম। শরীর ঠাণ্ডা হোল কিন্তু পেট সমানে জ্বলছে। এ সময় কোনো বনের ফল নেই ? চোখে তো পড়ে না, যেদিকে চাই।

এমন সময় একজন বুড়ো লোক পুকুরটাতে নাইতে আসচে দেখা গেল। আমাকে দেখে বললে—বাড়ি কোথায় ?

আমি বললাম,—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপাততঃ বড় খিদে পেয়েচে, খাবো কোথায়, আপনি কি সন্ধান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বললে—রোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্চি!

স্নান সেরে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে জঙ্গলে ঘেরা একটা পুরোনো বাড়িতে ঢুকলো। বললে—আমার নাম নিবারণ চক্রবর্তী। এ বাড়ি আমার, কিন্তু আমি এখানে থাকিনে। কলকাতায় আমার ছেলেরা ব্যবসা করে, শ্যামবাজারে ওদের বাসা। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আর সেখানে মাত্র তিনখানা ঘরে আমরা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবার আসি, বাড়ি দেখাশুনো করি। ছেলেরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে আসতে চায় না। মস্ত

বাগান আছে বাড়ির পেছনে। তাতে সব-রকম ফলের গাছ আছে—বারো ভূতে খায়। তুমি এখানে থাকবে?

বললাম—থাকতে পারি।

—কি কাজ করতে?

—রাঁধুনীর কাজ।

—যে ক'দিন এখানে আছি, সে ক'দিন এখানে রাঁধো, দুজনে খাই।

—খুব ভালো।

আমি রাজি হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারী খুশী হোল। আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বললে—বিশ্রাম করো।

পথ হেঁটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বেলা তখন নেই। রাঙা রোদ বড় বড় গাছপালার উঁচু ডালে। এরি মধ্যে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শুরু হোল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরোনো আম-কাঁঠালের বন আর জঙ্গল! কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে কেবল একটা ভাঙা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, শুধু চামচিকের আড্ডা।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্কত্তি বসে তামাক খাচ্চে! আমায় বললে—চা করতে জানো? একটু চা করো। চিঁড়ে ভাজো। তেল-নুন মেখে কাঁচালঙ্কা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বললে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ঘি আছে, আলু ভাতে ভাত,—ব্যস্!

—যে আজ্ঞে!

—তোমার জন্যে ঝিঙের একটা তরকারি করে নিও। ঝিঙে আছে রান্নাঘরের পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—রান্নাঘরে সর্বদা আলো জ্বেলে রাখবে।

—তা তো রাখতেই হবে, অন্ধকারে কি রান্না করা যায়?

—হ্যাঁ, তাই বলচি।

মস্ত বড় বাড়ি। ওপরে নীচে বোধ হয় চোদ্দ-পনেরোখানা ঘর। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালা দেওয়া। রান্নাঘরের সামনে মস্ত বড় লম্বা রোয়াক, রোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকোল গাছ আর একটা বাতাবি লেবুর গাছ। ঝিঙে তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও-মুড়োয় গিয়ে আমায় উঠোনে নামতে হবে, তারপর ঘুরে রান্নাঘরের পেছন দিকে যেতে হবে। তখনো সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়নি, আলোর দরকার নেই ভেবে আমি এমনি শুধুহাতেই ঝিঙে তুলতে গেলাম।

বাবাঃ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো ঝিঙে গাছ, যাকে এঁটো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক ঝিঙে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি ঝিঙে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো, একটি বৌ-মতো কে মেয়েছেলে আমার সামনাসামনি হাত দশেক দূরে ঝোপের মধ্যে নীচ হয়ে আধঘোমটা দিয়ে আমারই মতো ঝিঙে তুলচে! দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছন ফিরে সাত-আটটা কচি ঝিঙে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বৌটি তখনো ঝিঙে তুলচে।

নিবারণ চক্কত্তি বললে—ঝিঙে পেলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক ঝিঙে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল। নিবারণ বিস্ময়ের সুরে বললে—কোথায় ?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষ মানুষ ?

—না, একটি বৌ।

নিবারণ চক্কত্তির মুখ কেমন হয়ে গেল। বললে—কোথায় বৌ ? চলো দিকি দেখি।

আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছুই না।

নিবারণ বললে—কৈ বৌ ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ও ঝোপটার কাছে।

—হুঁঃ, যতো সব! চলো, চলো। দিনদুপুরে বৌ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-ঝি দুটো জংলী ঝিঙে তুলতে এসেই থাকে, তবে তাতে এত খাপ্পা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো ঝিঙে কে চৌকি দেবে ?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্কত্তি-বুড়ো আবার সেই ঝিঙে চুরির কথা তুললে। বললে—আলো নিয়ে যাওনি কেন ঝিঙে তুলতে ? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে ? কেন তা যাওনি ?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হোল! বুড়োটা খিটখিটে ধরনের। বিনা আলোতে যখন সব আমি দেখতে পাচ্চি, এমন কি ঝিঙে-চুরি করা বৌকে পর্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেচি কি ?

বুড়ো বললে —না, না, সন্ধ্যার পর সর্বদা আলো কাছে রাখবে।

—কেন ?

—তাই বলচি। তোমার বয়স কত ?

—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।

—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষট্টি। যা বলি কান পেতে শুনো।

—আজ্ঞে, নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের যেন ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারা যেন বাক্স-বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাচ্চে। ভারী জিনিস সরাচ্চে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিসপত্র গোছাচ্চে! কিন্তু এত রাত্তিরে?

বাবাঃ! কি বাতিকগ্রস্ত মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বললে—আমি?

—হ্যাঁ, অনেক রাতে।

—ও! হ্যাঁ—না—হুঁ—ঠিক।

—আমাকে বললেই হোত আমি গুছিয়ে দিতাম!

চক্কত্তি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাল-ভাত আর ঝিঙেভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোঁটলা বেঁধে সে রওনা হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের লোকের মত থেকো ঠাকুর। পেয়ারা আছে, আম-কাঁঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পোঁতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিন বিঘে। ভদ্রাসন হোল দেড় বিঘের ওপর। লোক—অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেচো—তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখাশুনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—

—কি?

চক্কত্তি-বুড়ো অকারণ সুর খাটো করে বললে—কত লোকে ভাঙচি দেবে। কারো কথা শুনো না যেন। বাড়ি দেখাশুনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই খাবে। দুটো ঘর খোলা রইল তোমার জন্যে।

বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল। আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্য রয়েচে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই! বাড়িতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েচে বুড়ো, প্রায় আধ-মণটাক সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কাঁঠাল। এ যেন ভগবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ!

বিকেলের দিকে তেল-নুন কিনবো বলে মুদির দোকান খুঁজতে বেরুলাম। বাপ রে, কি বন-জঙ্গল গাঁখানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ি তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুঁড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচ্চে, হাতে তেলের ভাঁড়। আমায় দেখে বললে—বাড়ি কোথায়?

—এখানে আছি নিবারণ চক্কত্তির বাড়ি।

—নিবারণ চক্কত্তির? কেন?

—দেখাশুনো করি। কাল এসেচি।

—ও বাড়িতে থাকতে পারবে না।

—কেন ?

—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়িতে এল গেল। ওরা নিজেরাই থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বৌয়েরা কস্মিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক। খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উঁচু দোতলা বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। সত্যি, বাড়িখানার চেহারা কি রকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো ক্ষুদ্র লোককে যেন গিলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে! অমনতর ওর চেহারা কেন ?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নুন কিনতে যাই তখন আমার মনে দিব্যি ফুর্তি ছিল—হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ হচ্চে ওই লোকটার ভয়-দেখানো কথাবার্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার ? চক্কত্তি-বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না, গাছপালার ফল-ফুলুরি গাঁয়ের লোক চুরি করে খায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যাবেলা ঝিঙে চুরি করছিলো।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিনি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে কখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেরে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দোতলার নালির মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা ধুলে জল পড়ে-বেশ মোটাধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটাধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্কত্তি মশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে ?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হোল, চক্কত্তি মশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা ঘড়াতে জল রেখে দিয়েছিলেন ওপরের

বারান্দাতে, সেই কলসী কিভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে গেল, জানলা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের।

কি ফুল?

ঘুমের ঘোরেই ভাবচি এমন কোন সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিনি!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেচি—ভুল হবার নয়! আমি তখুনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হোল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, ঐ বৌটি যেন এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ! না, কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে! একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেচি? ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সে-ই ছড়িয়ে গিয়েচে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়!

সে-রাত্রে সেই পর্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হোল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কাজ-কর্মে ভালো করে মন দিলাম। বন-জঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড্ড নির্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একঘর লোকও থাকতো, তবে কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হোল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অট্টহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থমথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিছুই না। নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন থেমে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েচে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড্ডা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে।

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সূর্যের আলো। এ সময়ে মনের মধ্যে কোন ভূতের সংস্কার থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তবে বোধ হয় ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে ঝিঙের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রচুর ঝিঙে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইচ্ছে তুলে নিয়ে খাও। আমারই বাড়ি, আমারই ঝিঙে-লতা। মালিক হওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুঝচি। আমার মতো গরীব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রইলাম ওপরের ঘরে কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছুঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়ে বাড়িতে ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়! হয়ত সবটাই আমার মনের ভুল! মনের সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল!

এর পর ন'দিন আর কোনো কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অপ্রীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিব্যি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বোঝালুম, ওসব কিছু না। কি শুনতে কি শুনেচি, বৌ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনাও কানের ভুল! সব ভুল।

এ ন'দিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই,আর শুধু ঘুমুই। কাজ-কর্ম কিছু নেই-কেমন একরকমের কুঁড়েমি পেয়ে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণত খুব খাটিয়ে লোক, শুয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েচে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হোল রান্নাঘরের পেছনে সেই ঝিঙের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, ঝিঙের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে ঝালের চারা পুঁতবো, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েচে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে রান্নাঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে ; কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিড়েন, শাবল, কুড়ুল, সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইস্তক।

অল্পক্ষণ মাত্র কাজ করেছি—আধ ঘণ্টাও হবে না।

হঠাৎ দেখি, সেই বৌটি ঝিঙে তুলতে এসেচে। নীচু হয়ে ঝোপের মধ্যে ঝিঙে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হোল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জনপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-হৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানলা যেন একটা ঝড়ের ঝাপট লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে দাঁড়ালাম—কৈ, একটা দরজা-জানলার কপাটও খোলেনি দোতলার! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি ? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি ? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার ওঠে কেন ? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেচি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোন শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার ঝিঙে তুলতে এসেচে এই গোলমালের মধ্যে। দৌড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভারি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েচি, সামান্য তন্দ্রা এসেচে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চার পাশে অনেক লোক জড়ো হয়েচে—তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েচে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বহু আরশিতে যেন একটা মুখই দেখচি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেচে!

একজন তার উত্তর দিলে—এখানে একজন পৃথিবীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেচি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে। সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েচে।

—সব মিথ্যে! কোথায় বাড়ি ?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরম্ভ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের নেত্য! শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার স্বচক্ষে দেখলাম। সে কি কাণ্ড! অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলে, আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হল্লা!

আমার বিছানার বা আমার দেহের কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হুঙ্কার আর ভৈরব নৃত্যে আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতনভাবে জানলার বাইরের জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ভোর হয়ে গেল।

বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুনিদ্রা হোলে শরীর যেমন ঝরঝরে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করচি।

তবে সে ভূতের নাচ কে দেখেছিল ? সে নাচ কি তবে ভুল ? খেয়েদেয়ে পরম

আরামে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছি?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েচি, তা কোথা থেকে এলো? সেই বৌটি যখন চলাফেরা করে, তখনি অমন সুবাস ছড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গন্ধ আমার নাকে লেগে রয়েচে!

কোনো অজানা বন-ফুলের সুবাস হয়তো! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বললে—কি রকম আছো? বলি, কিছু দেখচো নাকি?

—না।

—শুনচো কিছু?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক। তুক-তাক জানো নাকি? ভূতের মন্তর?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আচ্ছা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন দ্যাখোনি? বৌ-মত? কোনো গন্ধ পাওনি?

—কিসের গন্ধ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ?

—না।

—খুব বেঁচে গিয়েচ তুমি। তোমার আগে যারা ওখানে থাকতো, তারা সবাই একটি বৌকে দেখতো ওখানে প্রায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিন দিন শুকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যেতো। দুটি লোকের এই রকম হয়েচে এ পর্যন্ত। বাড়িতে ভূতের আড্ডা। ভূতে লোককে পাগল করে দেয়ে। তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, এমন ভালো লাগে এ বাড়ি—না খেয়ে, না দেয় ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না! তুমি দেখচি ভূতের মন্তর জানো। আমরা তো ও বাড়ির ত্রি-সীমানায় যাইনে। মাথা খারাপ করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাথা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত আমারও হোল নাকি? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমারও মনে হোল, নাঃ, সব ভুল! পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাবো? বেশ আছি, খাসা আছি, তোফা খাসা আছি!

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্কত্তি মশায় মাইনে-টাইনে কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাশুনা করি, বেগুন-কলা বেচি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইনে বাড়ি ছেড়ে।

গিন্নি-মা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দরজার কড়া নাড়বার শব্দ শুনে যে আধবুড়ী মানুষটা দরজা খুলল তার পরনের কাপড়ে হলুদের ছোপ। চাউনিটা কেমন যেন! মলিনাকে সে বলল, 'গিন্নি-মার সেবা-যত্ন করতে এসেছ, বাছা? আমি তরকারিটা চড়িয়েছি। এস। তোমাকে আশীর্বাদ করছি : ভালয়-ভালয় বাড়ি যেন ফিরে যেতে পার।'

মলিনা বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এসেছে আয়ার কাজ করতে। ভালয়-ভালয় কেন যে সে বাড়ি ফিরতে পারে, কেন বুড়ীর আশীর্বাদ— কিচ্ছু সে বুঝতে পারল না।

এই আধবুড়ী মানুষটা পাগলি-পাগলি ধরনের। আপন মনেই কথা কয়। রান্নাঘরে যাবার সময় আপন মনে গজগজ করতে করতে সে বলে চলল, 'আবার জোয়ান ছুঁড়ি.... কতগুলো ছুঁড়ির সব্বনাশ হতে দেখলাম যে.... নারায়ণ, নারায়ণ, মেয়েটা যেন বাঁচে.... ঢলঢলেপনা মুখটা....আমার সেই মেয়েটার মত... নারায়ণ, নারায়ণ.... মেয়েটা যেন....'

তরকারি সাঁতলে মলিনাকে বলল, 'খুব সাবধান। প্লেট-টেটে যেন কিচ্ছু না পড়ে। ইদিক-উদিক হলেই গিন্নি-মা তুলকালাম করবে।'

প্লেটে খাবার সাজিয়ে দোতলায় গিন্নি-মার ঘরের ভেজান দরজার সামনে পৌঁছে মলিনার বুকের ভিতরটা দুরদুর করে উঠল। কেন যে হাত-পা শিরশির করতে লাগল সে বুঝল না। আয়ার কাজ সে নতুন করছে না। প্রায় পাঁচ বছর হল করছে। মিলনের সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই। নইলে সংসার চলে না। কিন্তু এমনটা তো কই আগে কখনো হয়নি! ভয়ডর নেই বলে মনে তার বেশ গর্ব ছিল। কিন্ত আজ এ কী ব্যাপার? নিজের উপর সে বিরক্ত হল।

তারপর বেশ সন্তর্পণে হাঁটু দিয়ে ভেজানো দরজাটা খুলে সে ঘরের ভিতরে গেল।

রাস্তার দিকে দক্ষিণের জানালার একটা পাটি খোলা। আর সব জানালা বন্ধ। ঘরটায় তাই আবছা আলো। খাটটা জানালা থেকে হাতখানেক দূরে। পর-পর তিনটে বালিশে মাথা রেখে গিন্নি-মা শুয়ে। শীতকাল, তাই গিন্নি-মার শরীর লেপে ঢাকা। শুধু দুটো হাত আর মুখ বেরিয়ে আছে। লেপ-ঢাকা শরীর ছোটখাটো পাহাড়ের মত। আর হাত তো নয়, যেন হাতির পা। ঝুলে-পড়া গাল দুটোর মধ্যে কত স্তর যে মেদ জমেছে কে জানে। মনে হয় তার শরীরে থলথলে মেদের নিচে হাড়গোড় বলে কিছু নেই।

কিন্তু চোখ দুটো অসম্ভব তীক্ষ্ণ। চোখে চোখ পড়লে বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসে! সাপের চোখের মত। এ-রকম নিষ্ঠুর চাউনি, এরকম মোটা শরীর জীবনে

মলিনা দেখেনি।

সে শুনেছিল পঞ্চান্ন বছর ধরে পক্ষাঘাতে গিন্নি-মা বিছানায় শুয়ে। পঞ্চান বছর হাঁটা-চলা নেই। তাই বেজায় মোটা হয়ে পড়েছেন। কোনদিন এ-রকম মানুষের মুখোমুখি যে হতে হবে মলিনার কল্পনাতেই ছিল না।

কুতকুতে চোখ দুটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মলিনাকে বিঁধে বাজখাঁই স্বরে গিন্নি-মা বললেন, 'তুই তা হলে নতুন ছুঁড়ি, আয়ার কাজ করতে এসেছিস ? বেশ-বেশ। পাশের টেবিলে ট্রে-টা নামা। কাছে আয়। ভাল করে দেখি।'

ট্রে নামিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে গিন্নি-মার চোখ দুটোর দিকে আবার তাকাতেই মলিনার মাথার মধ্যে সবকিছু যেন উলটো-পালটা হয়ে গেল। মনে হল তার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন কারেন্ট বয়ে যাচ্ছে। মনে হল সে যেন ডুবতে বসেছে। তার শরীরটা যেন গলে যাচ্ছে। মনে হল, এই ঘরটা যেন নেই, খাট-চেয়ার-টেবিল-আলমারি নেই। গিন্নি-মাও যেন নেই। আছে শুধু কুতকুতে দুটো চোখ আর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর একটা চাউনি। আর কিছু নয়.....

কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ঘর, চেয়ার-টেবিল খাট-আলমারি আর গিন্নি-মার ঢাউস শরীরটা।

গিন্নি-মা চোখ বুঁজে বললেন, 'তোর বয়েসটা বেশ কাঁচা বলেই মনে হয়। বাইশ-তেইশের বেশি নয়। শরীরটা মজবুত আর বেশ পুরন্তও। কিন্তু রূপের জোলুশ নেই। তোর বয়েসে আমি ছিলাম—যাকে বলে ডান-কাটা পরী। একমাথা ঘন চুল, মাখনের মত গায়ের চামড়া। ছিপছিপে শরীর। কোমরটা তোর মত ভারী নয়। কত ছোঁড়ার যে মাথা ঘুরিয়ে দিতাম। কত ছোঁড়া যে আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরত, যদি জানতিস,— কিন্তু আজ ? পঞ্চান্ন বছর ধরে বিছানায় পড়ে। পঞ্চান্ন বছর মেঝেয় পা দিইনি। কিন্তু সে দিনগুলোর কথা ভুলিনি, যখন রূপসী ছিলাম, যখন জোয়ান ছিলাম, যখন যৌবন ছিল।'

গিন্নি-মার কথা শুনে তাঁর জন্য মলিনার কিন্তু বিন্দুমাত্র করুণা হল না। তার শরীরের অবশ ভাবটা আর নেই। কিন্তু তার বদলে মাথার মধ্যে হঠাৎ শুরু হয়েছে অসহ্য একটা যন্ত্রণা। মাথার মধ্যেকার দপদপ যেন কানের মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে! মলিনা তখন ঘর থেকে এক দৌড়ে একতলার রান্নাঘরে আধবুড়ী মানুষটার কাছে পালাতে পারলে বাঁচে।

হঠাৎ সুর পালটে গিন্নি-মা বলে উঠলেন, 'এই ছুঁড়ি, জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বালিশগুলো একটু উঁচু করে দে। নইলে খাব কী করে ?'

মলিনা মাথার বালিশগুলো ঠিকঠাক করছে এমন সময় গিন্নি-মা আচমকা তার ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরলেন। উঃ! এই মেদবহুল থলথলে হাত দুটোর মধ্যে এমন প্রচণ্ড শক্তির কথা কে কল্পনা করতে পেরেছিল ? গিন্নি-মার ঠোঁটে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। তারপর অন্য হাত দিয়ে মলিনার কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত বোলাতে লাগলেন। একবার আলতোভাবে চিমটি কাটলেন।

হাত বোলাতে বোলাতে গিন্নি-মা বলে চললেন, 'তুই ভেবেছিলি আমি একটা থলথলে বুড়ী ? মোটেই নয়। শুধু খাবারে আমার তৃপ্তি নেই। জোয়ান বয়েসের

দিনগুলোর কথা একটুও ভুলিনি। জোয়ান বয়েসের গা-শিউরনো আয়েসগুলোর কথা। ভেবেছিস বুঝি ডবকা ছুঁড়ি বলে একাই তুই সেগুলো ভোগ করবি! তাই না ? তোর সিঁথিতে সিঁদুর। নিশ্চয়ই তা হলে বিয়ে হয়েছে। বরটা বেঁচে আছে ? তোর বরের গল্প করে যা। ছোকরা লম্বা ? জোয়ান ? কী রকম জোয়ান ? রোজ তোর সঙ্গে প্রেম করে ? কবার করে প্রেম করে ? খুব তাগড়া ? খুব তাগড়া ? বলে যা, বলে যা, বলে যা—কেমন করে প্রেম করে—কেমন করে প্রেম করে—'

মরিয়া হয়ে একটা ঝটকায় মলিনা তার হাত ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি-মার স্বর থেমে গেল। চোখের পাতা বুজে এল। তারপর ফাঁকা চোখে তাকিয়ে ট্রের দিকে থলথলে হাতটা তিনি বাড়ালেন।

রান্নাঘরে সে যখন পৌঁছল সর্বাঙ্গ তার থরথর করছে। গা গুলিয়ে-গুলিয়ে উঠছে। কী ঘিনঘিনে মন! কী জঘন্য মন! তার ইচ্ছে করছিল সবকিছু আছড়ে-আছড়ে ভাঙতে।

বালতি থেকে মগ-মগ জল তুলে দু-হাতে হুড় হুড় করে সে ঢালতে লাগল।

আধবুড়ী মানুষটা তার দিকে সামান্য অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে চলল, 'এর মধ্যেই গিন্নি-মার সঙ্গে খিটিমিটি বাধিয়েছ বাছা ? মানুষটার সঙ্গে মানিয়ে চলা খুবই যে কঠিন সে-কথা মানছি। তবে পরের বাড়িতে চাকরি করতে গেলে অনেক কিছু সইতে হয়। তাই খুব সমঝে চল। কত মেয়েকেই যে আসতে যেতে দেখলাম আয়ার কাজ করতে! কেউই টিকতে পারে না। সত্যি কথাটা বলেই ফেলি। গিন্নি-মার মেজাজের দরুন সেই যে শ্রাবণ মাসে আয়া-মেয়েটা বাড়ি থেকে পালাল, আজ মাঘ মাসের আমাবস্যে—এর মধ্যে আয়ার কাজের জন্যে কাউকে জোগাড় করতে পারিনি। এ ক'টা মাস খেটে-খেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমার মত দুটো আধবুড়ী আয়ার জোগাড় করেছিলাম। গিন্নি-মা তাদের দূর দূর করে তাড়াল। আধবুড়ী আয়া গিন্নি-মার দু চোখের বিষ। চায় জোয়ান-জোয়ান ছুঁড়ি। রোজ-রোজ কোথায় ছুঁড়ি ধরি বল তো বাছা ? আর ছুঁড়িদের যেমন স্বভাব। ক'টা দিন কাটতে না কাটতেই গিন্নি-মার ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে নকল করতে শুরু করে দেয়। আমাকে গেরাজ্যিই করে না। গিন্নি-মার মত হাত নাড়ে, গিন্নি-মার মত চোখ ক্ষুদি-ক্ষুদি করে কেমনতর যেন তাকায়, চোখ ঘোরায়। একটা তো গিন্নি-মার গলার স্বর অবিকল নকল করতে শুরু করেছিল। দেখেশুনে তো গায়ে কাঁটা দিত। বুকের রক্ত হিম হয়ে আসত। মেয়েটা তোমার বয়িসী ছিল। মাসখানেক টিকে ছিল। তারপর এক ভোরে বাগানের আমগাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে মরে। কেন যে গলায় দড়ি দেয় আজ পর্যন্ত কেউ তার হদিশ করতে পারেনি। সে এক দারুণ হুজ্জত। দারোগা পুলিশে বাড়ি গিসগিস। হদিশ করতে পারেনি।'

মলিনার দু-চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল ঝরছিল। সেদিকে তাকিয়ে আধবুড়ী মানুষটা বলে চলল, 'কেঁদো না বাছা, কেঁদো না। বুড়ী মানুষ। মাথার কি আর ঠিক আছে ? ভীমরতি ধরেছে যে। যা বলে তা কি আর ভেবে চিন্তে বলে ? তার কথায় কান দিয়ো না। মুখটি বুজে কাজ করে যেয়ো। আর একটা কথা বাছা—ওই সব ধিঙ্গি ছুঁড়িদের মত গিন্নি-মাকে আড়ালে-আবডালে কক্ষনো ভেংচি

কেটো না—'

কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল মলিনার মাথার যন্ত্রণাটাও বাড়তে লাগল তত। তার সঙ্গে অন্যমনস্কও হয়ে উঠতে লাগল। পদে-পদে কাজে তার ভুল হতে লাগল। পেঁয়াজ কুঁচোতে গিয়ে বুড়ো আঙুল কাটল। হাত থেকে পড়ে চাটনির পাথরের বাটিটা চুরমার।

বেজায় বেজার হয়ে বুড়ী মানুষটা বলল, 'হাত-পায়ে যে বশ নেই বাছা। বলি মনটা কোথায় পড়ে আছে গো ? বরের কাছে ?'

দুপুরের খাবার ট্রে-তে সাজিয়ে মলিনা গিন্নি-মার কাছে গেল। হাত-পা তখন বেজায় কাঁপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু গিন্নি-মা তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। একটি কথাও কইলেন না।

মলিনা রান্নাঘরে ফিরে গেল। কাঁপা হাতে বাসন-পত্র ধুলো। কোন মতে নাকে-মুখে কিছু গুঁজল। আর কেবল ভাবতে লাগল সাড়ে সাতটা কখন বাজবে ? কখন তার বরের ছুটি হবে ? কারখানার ডিউটি সেরে মিলন তাকে কখন নিয়ে যেতে আসবে তার স্কুটারে ?....মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে... মিলন—মিলন, কখন তুমি আসবে ?..... মিলন—মিলন....

বুড়ী মানুষটার কাছ থেকে রাতের খাবারের ট্রে নিয়ে গিন্নি-মার ঘরে মলিনা যখন ঢুকল তখন সে মনস্থির করে ফেলেছে। গিন্নি-মা যদি আগের মত তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে নির্বিঘ্নে কথাগুলো বলেন, তাহলে সে আর ছেড়ে কথা বলবে না। নখ দিয়ে ফালি-ফালি করে ফেলবে থলথলে মুখটা। গেলে দেবে তাঁর সাপের মত ক্রূর চোখ দুটো।

উঃ, কিন্তু কী হয়েছে তার ? এ-রকম ভাবনা কখনো তো তার মাথায় আসেনি। আর মাথা—মাথায় তার এমন যন্ত্রণা আর তো কখনো হয়নি!

কিন্তু কী আশ্চর্য! এবারও গিন্নি-মা তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। একটি কথাও কইলেন না। মলিনা রান্নাঘরে ফিরে কাঁচের বাসনগুলো ধুলো। তারপর নিজের মুখ-হাত পরিষ্কার করে পুরোন হাতব্যাগ থেকে সিঁদুর কৌটো বার করে কপালে পরল বেশ বড়সড় লাল একটা টিপ।

এমন সময় দরজার সামনে শোনা গেল মিলনের স্কুটারের চাপা হর্ন। স্কুটারে সে কারখানায় যাতায়াত করে। ঠিক ছিল ফিরতি পথে এসে সে হর্ন দেবে। তারপর মলিনাকে পিছনে বসিয়ে বাড়ি ফিরবে।

এমন সময় আধবুড়ী মানুষটা গিন্নি-মার ঘর থেকে রান্নাঘরে ফিরে মলিনাকে বলল, 'যাও বাছা, গিন্নি-মার সঙ্গে দেখা করে যাও। গিন্নি-মা বলে দিয়েছেন। তোমার বর এসে গেছে দেখছি। তাকে গিয়ে বলছি দু' মিনিট সবুর করতে।'

অসহায় চোখে বুড়ী মানুষটার দিকে তাকিয়ে মলিনা আবার গেল দোতলায় গিন্নি-মার ঘরে।

গলায় মধু ঢেলে গিন্নি-মা বললেন, 'তোর বর এসে গেছে, তাই না ? জানলা দিয়ে তাকে স্কুটারে বসে অধৈর্য হয়ে হর্ন দিতে দেখছি।'

মলিনা বলল, 'হ্যাঁ গিন্নি-মা।'

আবার গলায় মধু ঢেলে গিন্নি-মা বললেন, 'বেশ, বেশ। বাড়ি যাবি বৈকি

বাছা। বরের স্কুটারের পেছনে বসে, তাকে সাপটে ধরে। তোকে আর ধরে রাখব না। এবার আমি ঘুমোব। শুধু যাবার আগে মাথার তলা থেকে একটা বালিশ সরিয়ে দিয়ে যা।'

তখনি মলিনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল ঘর থেকে দৌড়ে পালানো। উচিত ছিল সেই সর্বনেশে হাত দুটোর নাগালের মধ্যে না যাওয়া। কিন্তু গিন্নি-মার মধু-ঝরা স্বরে তার মন খানিকটা ভিজেছিল।

বিছানার কাছে গিয়ে গিন্নি-মার মাথার তলা থেকে একটা বালিশ সে সরালো আর বিদ্যুতের মত সেই সাঁড়াশি-শক্ত একটা হাত বজ্র মুঠোয় মলিনার একটা কব্জি ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনল।

মলিনার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর গিন্নি-মা সাপের মত হিসহিস করে বলে চলেছেন, 'নাড়ে ছুঁড়ি, স্কুটারের পেছনে বসে বরকে সাপটে ধরে তোর আর বাড়ি ফেরা হবে না। জোয়ান বরটার সঙ্গে জীবনে আর রাতভোর আয়েস করে শিউরে-শিউরে উঠে প্রেম করা হবে না। বরটা তোর কোন দিন টেরও পাবে না সে-কথা! তুই যে আর মলিনা নোস, কী করে জানবে তোর তাগড়া বর ? ভাববে তার জোয়ান ছুঁড়ি ডবকা বউ আরো জোয়ান হয়েছে! কী খুশি সে যে হবে....!'

মনে হোল গিন্নি-মা যেন কথা কইছেন না। কথা কইছে সাপের মত তাঁর ক্রূর চোখ দুটো। দেখতে দেখতে ঘরের আবছা আলো আরো আবছা হয়ে উঠল। সেই ক্রূর চোখ দুটো কয়লাখাদের মত নিকষ কালো হয়ে গেল। কালো আর গভীর। তারপর দুটো চোখ যেন এক হয়ে গিয়ে অমাবস্যার রাত হল। আর মলিনা সেখানে ডুবতে লাগল, ডুবতে লাগল.....

ঘরটা বেজায় স্তব্ধ।

মলিনার মাথার মধ্যে আর যন্ত্রণা নেই। সর্বাঙ্গে শুধু একটা ঝিমঝিমে অবসাদ। সেই অবসাদ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল তার ঊরুতে, তার পায়ে, তার পায়ের গোছে। পা দুটো তার কী মোটা হয়ে গেছে! লেপের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে। সাড়া নেই কোন পায়েই।

নিজেকে দেখতে লাগল মলিনা। বিছানা ছেড়ে সে উঠল। কোমরের কশি আঁট করল। ঠিকঠাক করে নিল তার আঁচল। বড় আয়নায় নিজেকে দেখে মুখ টিপে হাসল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তারপর শুনতে পেল সিঁড়িতে তার চটি-পরা-পায়ের চটপট শব্দ।

এই প্রথম সে টের পেল পঞ্চান্ন বছর ধরে সে হাঁটেনি। জীবনে আর কোনদিন সে হাঁটতে পারবে না!

দুটো হাত তার নিশপিশ করতে লাগল। কী আশ্চর্য—হাত দুটোয় তার কী আশ্চর্য ক্ষমতা!

জানালা দিয়ে সে দেখল—মিলনের স্কুটারের পিছনের সিটে বসে তাকে সে সাপটে ধরেছে।

মিলনের গলা তার কানে এল, 'এত দেরি কেন ?'

নিজের স্বর সে শুনতে পেল, 'গিন্নি-মা মাথার বালিশটা সরাতে ডেকেছিলেন।'

ক্লাইম্যাক্স্

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা থেকে গল্পটা ফেঁদেছি, উদ্দেশ্য, গল্পের ক্লাইম্যাক্স্ জিনিসটা কি তাই বোঝানো। শ্রোত্রী বা শিষ্যা আমার স্ত্রী এবং তাঁর চতুর্দশবর্ষীয়া ভগ্নী মীরা। প্রথমে সংজ্ঞাটা সম্বন্ধেই ধারণাটুকু পরিষ্কার করে দিলাম ; বললাম, ক্লাইম্যাক্স্ হচ্ছে কোন রচনা বা রচনাংশের চরম পরিণতি— সে রচনা গল্প, উপন্যাস, কাব্য, মহাকাব্য যাই হোক। কোন একটা বিশিষ্ট ব্যাপক অনুভূতিকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে চূড়ান্ত পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হল ক্লাইম্যাক্স্। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে যেমন সমগ্র বইখানার শেষাংশ তার ক্লাইম্যাক্স্ হতে পারে, তেমনি তার একটা অধ্যায় বা আরও খণ্ডিত অংশেও একটি বিশেষ অনুভূতি বা পরিস্থিতির ক্লাইম্যাক্স্ সৃষ্ট হতে পারে। এই ক্লাইম্যাক্স্টিকে ঠিকমত ফুটিয়ে তোলাতেই রচনা বা রচনাংশের সার্থকতা। ক্লাইম্যাক্স্ জিনিসটা খুব পরিষ্কার রূপ নিয়ে ওঠে কোন তীব্র অনুভূতি নিয়ে রচনার মধ্যেই। তাতে পাঠক বা শ্রোতা তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যে এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে যেতে পারে যে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বসতে পারে, কী বলছি, কী করছি, কোথায় আছি সে বিষয়ে কোন সম্বিৎই থাকে না। এমন কি পরিণতিটা যতই খারাপ হোক, হঠাৎ উল্টে গেলে একটা আশাভঙ্গের ধাক্কাও লাগে বুকে। মীরার দিকে চেয়ে বললাম—"এই সবের জন্যেই তোমার দিদি বই হাতে করে রান্নাঘরে ঢুকলে শুক্ত হয়ে যায় টক, অম্বল হয়ে যায় তেতো, দুধ হয়ে যায় নোন্তা, ডাল হয়ে যায়...."

স্ত্রী বললেন, "গল্পটা বলবে তো বসি, ব্যাখ্যানা করতে হয় তো শুধু ওর কাছেই করো।"

"বসো।"—বলে আরম্ভ করে দিলাম।

"এক বার দিন সাতেকের জন্যে আমি আমার বন্ধু বিকাশের ওখানে বেড়াতে যাই। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দিনের কথা, বিকাশ একটা বিশেষ দরকারে সকালেই বাইরে বেরিয়ে গেল, ফিরবে খানিকটা রাত করেই। সমস্ত দিনটা বই পড়ে আর এদিক-ওদিক করে সন্ধ্যার একটু আগে মনে হল খানিকটা বাইরে ফাঁকা থেকে না হয় বেড়িয়ে আসি, বিকাশ এলেই তো আবার শহর দেখা, রাজবাড়ি দেখা, পার্টি, ক্লাব এই সব আরম্ভ হবে। ট্রেনে আসবার সময় শহর থেকে আন্দাজ মাইল দুয়েক দূরে একটি জায়গা বড় ভাল লেগেছিল ; একটি বেশ চওড়া নদী—তা কলকাতার গঙ্গার প্রায় আধা-আধি হবে সব নিয়ে—ওপরে একটা নেড়া পুল, তার ওপর দিয়েই গাড়িটা এল, দূরে দূরে পাহাড়; কাছেও, পাহাড় না হোক এখানে-ওখানে

কিছু টিলা ছড়ানো, কয়েকটা বেশ খানিকটা উঠেও গেছে। আমাদের গাড়িটা পাস্ করল ঠিক সূর্যাস্তের মুখে। পাহাড়ে নদী, মাঝখানে শুধু কয়েকটা জলের রেখা ছড়ানো রয়েছে, বাকি সমস্তটায় ধু ধু করছে বালি। সেই গেরুয়া রঙের বালির ওপর প্রচণ্ড সূর্যের রাঙা রশ্মি পড়েছে ছড়িয়ে, গাংচিলের ছোটবড় ঝাঁক বাসায় ফিরছে, জলের ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচার গায়ে সোনালী রোদটা ঝিক-ঝিক করে উঠছে—সমস্তটুকু মনে গেঁথে গিয়েছিলে। জানতাম বিকাশকে বলতে যাওয়া বৃথা, কেননা যারা বইয়ের নেশায় ডুবে থাকে তাদের মতন, কবি বল, ঔপন্যাসিক বল, কোন লেখককেই ও বিশেষ পছন্দ করে না—অর্থাৎ তার ঐ অংশটাকে নেকনজরে দ্যাখে না...”

স্ত্রী একটু বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে শুনছিলেন, ওঁকে কটাক্ষ করছি ভেবে মন্তব্য করলেন, “কেউই দ্যাখে না নেকনজরে।”

বললাম, “আমি অবশ্য ঠিক সে জিনিসটি দেখতে পাব না। কেননা বাড়ি থেকে বেরুতেই সূর্যাস্ত হয়ে যাচ্ছে, পৌঁছুব ক্রোশ-খানেক পথ হেঁটে। তবে শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি যাচ্ছে, একটা অন্যরূপে দেখতে পাব, সে বোধ হয় আরও ভালই হবে।

“রেলের লাইন ধরে একটু পা চালিয়েই গেলাম। যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য একেবারেই ডুবে গেছে, শুধু আকাশে এদিক-ওদিক ছড়ানো যে মেঘের টুকরোগুলো রয়েছে তাতে একটু একটু রঙের পোঁচ লেগে রয়েছে ; কোনটাতে হাল্কা, কোনটাতে একটু গাঢ়। আকাশের মাঝখানে চাঁদটা স্পষ্ট হয়ে আসছে। আমি পুলটা পেরিয়ে একেবারে ওপারে চলে গিয়ে লাইন থেকে নেমে পাশেই একটি ছোট্ট টিলার ওপর গিয়ে বসলাম। বসলাম পশ্চিমমুখো হয়ে, সামনে হাত-পাঁচেক পরেই নদীর তীরটা গেছে নেমে।

“দেখলাম, আগে বেরুবার কথা যে মনে পড়ে নি, খুব ভালই হয়েছে। এমন একটি পরিপূর্ণ স্তব্ধতার মধ্যে আমি বহু দিনই পাই নি নিজেকে, এর আগে কখনও পেয়েছি বলেই মনে পড়ছে না। চঞ্চল জীবনের সব শব্দই গেছে থেমে, শুধু অনেক দূরে নদীটা একটা বাঁকের পর যেখানে জ্যোৎস্নার মধ্যে মিলিয়ে গেছে, খুব ক্ষীণ একটা পাখীর ডাক, খুব সম্ভবত চখা-চখী, ওরা শুনেছি দূরে আলাদা আলাদা থেকে এইরকম করে ডাকতে থাকে পরস্পরকে। বোধহয় ভাবে এতে দাম্পত্য কলহের সম্ভাবনাটা একেবারে দূর না হোক, কমে আসে। একেবারে কাছে জীবন্ত কোন শব্দই নেই, শুধু একটা টানা হাওয়া যেটাকে আমার কেমন করে যেন মনে হচ্ছিল, এই যে মুমূর্ষু দিনটি পৃথিবীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে, তারই যেন দীর্ঘশ্বাস। এরকম অবস্থায় মনটা আপনিই কি করে এক হয়ে যায় এইরকম পরিস্থিতির সঙ্গে। আমার বয়সও তো প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি ; আমারও জীবনের সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এইবার বিদায়ের পালা—এই মনে করে চোখের পাতা ভিজে ভিজে হয়ে আসছে—একটা দীর্ঘশ্বাসও ঠেলে আসছে বুকে, এমন সময়...”

“মীরা, জিজ্ঞেস কর্ বাজে কথাই চলবে ? তা হলে উঠি, আমার কাজ আছে ঢের। সাহিত্যিক নই।”

এবার অন্যরকম ভাব, বেশ কিছু গুরুতরই মনে হল। আমি স্বভাবদোষে পড়ে গিয়েছিলামই একটু ঘোরে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে আবার শুরু করে দিলাম, 'দীর্ঘশ্বাসটা চেপে আসছে বুকে, এমন সময় যেন হুঁশ ফিরে এল— নিজের মনেই বললাম—বা-রে! এরকম যদি বাজে কাব্যিতে পেয়ে বসে এখানে তা হলে তো সমস্ত রাত বসেই থাকতে হবে। তখন বেশ কিছুক্ষণ কেটেও গেছে সেখানে, ফিরতে অনেকটা পথও, তার ওপর নতুন জায়গা, ভাবলাম এইবার উঠে পড়া যাক। কিন্তু ভাবুকতাটুকু মন থেকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিলেও, জায়গাটার নিজের একটা মোহ আছেই, মনে হল আর একটু বসে যাই, এ সুযোগ তো জীবনে বেশি আসে না। এইরকম ওঠবার কথা মনে হতেই আর একটু বসে যাই করে করে অনেক বারই হয়ে গেল। কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। কোন আত্মীয়-কুটুমের বাড়ি গেলে—যেমন ধর, যখন তোমাদের বাড়ি যাই, একবার এর কথায় একবার ওর কথায় আটকে যেতে হয়। এখানে জায়গাটাই যেন টেনে টেনে রাখছে। বেশ খানিকটা এইভাবে কাটবার পর হঠাৎ এক সময় যেন আমার চমক ভাঙল, যেন কোথায় বা কিসের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম—হয়তো বা নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও, এই আবার ভেসে উঠেছি। ভেসেও যে উঠলাম তাও একটা নতুন পরিস্থিতির মধ্যে। সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ, সেই যে হাওয়ার শনশনানিটুকু ছিল তাও আর নেই। তোমরা আবার চটে যাবে, নইলে বলা যেত হঠাৎ যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সেই দিনটার মৃত্যু ঘটে গেছে কখন্। আমার নিজের অনুভূতিটাও গেছে বদলে একেবারে। সেই মুগ্ধ আনন্দের ভাবটা গিয়ে গভীর রাতে এই রকম খোলা নির্জন জায়গায় নিটোল নিস্তব্ধতা আমায় সম্পূর্ণ অন্যভাবে অভিভূত করে ফেলছে আস্তে আস্তে! গাটা ছমছম করে আসছে, একটা অহেতুক ছেলেমানুষী ভয় বুকটাকে চেপে যেন সত্যিই শ্বাসরুদ্ধ করে করে আনতে লাগল। শনশনানিটুকু গেলেও হাওয়া একটু রয়েছেই, এত খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, আমার মন শুধু যেন বলতে লাগল—'একটু শব্দ দাও, পৃথিবীর এতটুকু শব্দও শোনাও আমায় কেউ।'

ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা শব্দ উঠল আকাশ-বাতাস চকিত করে। শব্দের সেরা শব্দই—রাম-নাম : কিন্তু বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। পেছন ফিরে দেখি লাইনের পাশ দিয়েই, প্রায় শ'খানেক গজ দূরে কতকগুলো লোকের একটা ছোট দল চালি করে একটা শব নিয়ে আসছে। জানো বোধ হয়, এইরকম উপলক্ষ্যে হিন্দুস্থানীরা 'রাম নাম সত্ হ্যায়' বলে পথ চলতে থাকে। ওরা ঐখানেই লাইনের বাঁধ থেকে নেমে গেল। আমি তা হলে একটা শ্মশানের কাছেই বসে আছি।

সেই ভয়টা যেমন বেড়ে গেল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সাহসও খানিকটা এল ফিরে। হোক শ্মশান, কিন্তু কাছাকাছি অনেকগুলি লোকের সঙ্গ তো পাওয়া গেল। একটু বসেও রইলাম, তার পর ফিরব, দাঁড়িয়েও উঠেছি, ওদের মধ্যে একটা যেন কি নিয়ে একটু চঞ্চল আলোচনা উঠল। শ্মশানটা খানিকটা দূরেই, কিন্তু ঐ রকম ফাঁকা জায়গায় আওয়াজটা স্পষ্ট হয়েই ভেসে আসে। একটু কান পেতে থাকতেই বুঝতে পারলাম, শবদেহটা তীরের কোল থেকে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে এসে দাহ করবার কথা হচ্ছে, কারণটাও টের পেলাম— নদীতে জল নেমেছে।

পাহাড়ী নদীতে এই রকম হয়। এদিকে কিছুই নেই, দূরে পাহাড়-অঞ্চলে বৃষ্টি নেমে হঠাৎ প্রবল তোড়ে দু-কূল চেপে জল নেমে আসে। তার সঙ্গে ছোটবড় গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, অসাবধান থাকলে মানুষও। কোটালের বানের চেয়েও নাকি ভয়ানক। কখনও দেখি নি, ঠিক করলাম দেখে যেতে হবে।

শোঁ-শোঁ একটা শব্দ উঠেছে দূরে।

একটু দোমনা হয়ে গেছি, এপারে বসেই দেখে নোব, না, ওপারে গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে দেখব ? ঠিক করলাম, পেরিয়েই যাই, নীচে স্রোত থাকলে একটু নার্ভাস করে দিতে পারে। পা বাড়ালাম। কিন্তু এই সময় সেই শব্দই হঠাৎ বেড়ে গেল। আবার বসে পড়লাম আমি, ভাবলাম, তোড়টা ঠিক এসে পড়ার মুখে পুল পেরুনো আরও খারাপ হবে।

এইখানে মস্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেল। ঠিক যে জেনেশুনে ভুল তা নয়, হিসেব বা আন্দাজ করতে ভুল। জলের তোড়টা সেই অনেক দূরের বাঁকটা ঘুরতে শব্দটা হঠাৎ বেড়ে উঠেছিল, এসে পৌঁছুতে যে সময়টা নিল, দেখলাম তাতে আমি স্বচ্ছন্দে পুলটা পার হয়ে যেতে পারতাম। এ যা প্রলয়কাণ্ড দেখছি—হাজার উঁচুতেই হোক না কেন পুলটা, সম্পূর্ণ নিরাপদ, কিন্তু ঐ দশটা কামানের গর্জন কানে নিয়ে, আর ঐ তোড়ের ওপর দৃষ্টি রেখে—রাখতেই তো হবে—এখন পেরুই কি করে ?....অনেক ওপরে আমি, দেখছি এপার-ওপার নিয়ে বোধ হয় পাঁচ-ছ ফুট উঁচ একটা ফণা তুলে নেমে এল স্রোতটা—কী গর্জন, ছোট বড় গাছপালা বুকে চেপে কি আপসানি! কী সে ওলট-পালট খাওয়া! দেখতে দেখতে পুলের থামগুলোয় ধাক্কা খেয়ে যেন আরও ক্ষেপে উঠে হুঙ্কার দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। তার পর দেখতে দেখতেই নদীর জল এক ফুট দু ফুট করে বাড়তে বাড়তে তীরের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠে এল।

"দেখা হল একটা জিনিস জীবনে, পঞ্চানন রুদ্রের ভ্রূকুটি-কুটিল আননটা। কিছুক্ষণ পর্যন্ত যেন কোন চিন্তা করবার ক্ষমতাই হারিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হল। সেই তখনকার মতনই গেছি তলিয়ে—তখন ছিলাম সৌন্দর্যের মধ্যে, এখন যেন প্রলয়ের বিভীষিকায়। তখনকার মতনই এক সময় ভেসেও উঠলাম সেই অতল থেকে ; চিন্তা হল—পেরুই কি করে ?

"গোড়াতেই যেমনটা ছিল, শুকনো নদীর ওপর হঠাৎ যেন সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়া, এখন ঠিক ততটা না হলেও খুবই ভীষণ তো। নেড়া পুলের এক ফুট অন্তর পাতা কাঠের স্লিপারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে পেরুনো, একটু যদি মাথা ঘুরে পা টলে গেল তা হলেই আর দেখতে নয়। শুনেছি এসব স্রোত যেমন হঠাৎ আসে তেমনি হঠাৎ চলে যায়, কিন্তু সে-হঠাতের তো কোন আন্দাজ নেই ; জলের পরিমাণ যেমন দেখছি, পাহাড়ে বৃষ্টি থেমে গিয়ে থাকলেও এ জল বেরিয়ে যেতে অন্তত সমস্ত রাত কেটে যাবে। বৃষ্টি হতে থাকলে তো কথাই নেই।

"কি করব ভাবতে ভাবতেই রাত অনেকটা এগিয়ে গেল। ঘড়িটা নিয়ে যাই নি, কিন্তু আকাশে চাঁদ যেমন ঢলে পড়েছে নীচে, প্রায় বোধ হয় দশটা হয়ে এল।

"ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ একটা কথা মনে হল; এক জন সঙ্গী পাওয়া গেলে

বোধ হয় সুবিধে হত, যদি নেমে গিয়ে ওদের বলি, এক জন কাউকে দেয়—শুধু পুলটা পেরিয়ে দিয়ে আসতে....

'আমার চিন্তাটাই যেন রূপ নিয়ে আমার পাশে এসে পৌঁছাল ; দেখি আমার পেছন দিয়ে কখন্ একটি লোক এসে রেলের বাঁধের ওপর উঠতে যাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি, আমি গিয়েছিলাম পুজোর ছুটিতে, পুজো শেষ করে, বেশ একটু ঠাণ্ডার ভাব এসে গেছে তখন। লোকটার গায়ে আগাগোড়া একটা সাদা চাদর জড়ানো, মাথার ওপর দিয়েও ঘুরিয়ে আনা, এদিকে বেশ সরল বলে মনে হল। একেবারে তালের মাথায় পেটে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, ওই, যেন এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, হঠাৎই দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'বাবু, আপনি অসময়ে এখানে বসে যে!'

"হিন্দীতেই করল জিজ্ঞেস। বললাম, 'দেখো না, বেড়াতে এসেছিলাম, আচমকা নদীতে এই বান ডেকে এসে...'

"পেরুতে ভয় হচ্ছে ?'—একটু অদ্ভুতভাবে হাসল লোকটা, মনে হল তাতে যেমন ভরসা দেওয়ার চেষ্টা আছে, তেমনি একটু যেন ব্যঙ্গও রয়েছে মেশানো, বলল—'অমন হয় পেরুতে ভয়, ভয়ঙ্কর নদীই তো। কিন্তু আসলে ভয়ের কিছুই নেই। এই তো আমিই যাচ্ছি, আসুন না, আসবেন ?... আসুন তা হলে, আমার আবার সময় নেই।'

"বলতে বলতেই পা বাড়িয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি নেমে এসে সঙ্গ নিলাম; ও আগে আগে, আমি ঠিক পেছনে। পুলের ওপর উঠে যেতে যেতে একটু কথাও হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ঐ ওদের দলের লোক ?... যেন ওদিক থেকেই উঠে এলে মনে হল।'

"বললে, 'হ্যাঁ।'

"কোথা থেকে আসছ তোমরা ?'

"কি একটা নাম বললে মনে নেই। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, লোকটার বেশ সহজ সিধা চাল দেখেই হোক, বা যে জন্যেই হোক, আমিও বেশ স্বচ্ছন্দেই স্লিপারের ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছি, ভয়ের ভাবটা একেবারেই নেই। সেই কথাই বললাম ওকে। বললাম, 'এক জন সঙ্গী পেলে সত্যিই বড় সুবিধে হয়। তোমার আবার দেখছি পা খুব শক্ত, একটুও এদিক-ওদিক হচ্ছে না।'

"আমার যে অভ্যেস হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, একথা ঠিক বলেছেন যে এক জন সঙ্গী পেলে ভালই হয়। নৈলে এ অবস্থায় বড্ড যেন একলা আর অসহায় বোধ হয়, না ?'

"বললাম, 'সত্যি তাই, খুব পেয়ে গেলাম তোমায়, কপালের জোর বলতে হবে আমার।'

"আবার ঘুরে চেয়ে সেই রকম হেসে বলল—'কপালের জোর কি আমারই নয় ? কেমন পথের মাঝেই পেয়ে গেলাম আপনাকে।.... যেন আমার জন্যে বসেছিলেন নয় কি ?'

"আমিও হেসেই বললাম, 'তা ভিন্ন আর কি ? কিন্তু, হ্যাঁ, ঠিক কথা, ভুলেই

যাচ্ছিলাম, তা তুমি সবাইকে ছেড়ে হঠাৎ এমন করে একলা যে নদী পেরুতে যাচ্ছ? যাচ্ছই বা কোথায়?'

"এবার আর কথায় নয়। এ প্রশ্নের উত্তরটা একেবারে অন্যভাবে পাওয়া গেল : দেখি কেউ নেই আর আমার সামনে !

"ঠিক পরের মুহূর্তটা আমার কি হয়েছিল মনে নেই। খোলা ঠাণ্ডা হাওয়া থাকার জন্যে বা যে কারণেই হোক, সম্বিৎটা ফিরে আসতে নিশ্চয় দেরি হয় নি। দেখি পুলের মাঝখানে একটি স্লিপার প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছি। বিপদটা খুব উগ্র গোছের হওয়ার জন্যেই বোধ হয় জ্ঞানটা বেশ তাড়াতাড়ি আর স্পষ্ট হয়েই ফিরে এল, লোকটার... আর লোক বলিই বা কি করে— প্রত্যেকটি কথা তার আসল অর্থে ফুটে ফুটে উঠল আমার কাছে—বুঝতে বাকি রইল না কী দুকূল হারা নদী পার হয়ে ওর কাছে এ নদী যে গোষ্পদমাত্র এখন! সত্যিই কত যে অসহায় ও, কী যে একা!

"এই 'একা' কথাটা হঠাৎ আমার কাছে যেন অতিরিক্ত বিভীষিকাময় হয়ে উঠে ভয়ের তোড়ের ওপর আর একটা তোড় এনে ফেললে—একা, তাই কি অনন্তপথের যাত্রী এই বিদেহী আত্মা আমায় তার সঙ্গী করে নিতে এসেছিল? নিজের প্রশ্নটাতেই ভয়ে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা উৎকট হুঙ্কার শুনে সামনে চাইতেই দেখি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু ছুটে আসছে সামনে। এক মুহূর্তের বিভ্রম, তার পরেই ব্যাপারটা বুঝলাম, সামনের উঁচু টিলাটা ঘুরে একটা ট্রেন মত্ত গতিতে আসছে ছুটে, তার ইঞ্জিনের সার্চলাইট এসে পড়েছে আমার ওপর, দেখেছে ড্রাইভার, প্রাণপণে হুইসিল দিতে দিতে সতর্ক করতে করতে ছুটে আসছে—কিন্তু ফল কি আর সতর্কতার? মৃত্যু আমার দু দিকেই—সামনে ঐ, নীচে এই বিক্ষুব্ধ প্রলয়-পয়োধি।

"তবু ঝাঁপিয়েই পড়ে লোকে এ-অবস্থায়, কিন্তু শরীরের সমস্ত স্নায়ু আমার তখন একেবারে শিথিল হয়ে গেছে। ওদিকে আর এইটুকু মনে আছে যে দুটোহাতে চোখ দুটো চেপে ধরে মাথাটা দিয়েছি নুয়ে।

"তার পরেই মনে পড়ছে একটা যেন বিকট অন্ধকার মূর্তি, ঠিক হাত দুয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে বজ্র-কঠোর হুঙ্কার ছাড়ছে....

"ইঞ্জিনটা আর কি। ড্রাইভার ব্রেক্...."

"যাঃ ! বেঁচে গেলেন!"

মুখ থেকে কথাটা যেন হঠাৎ ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল মীরার, তীব্র উৎকণ্ঠায় হাত দুটো মুঠো করে বুকের ওপর চেপে ধরেছিল, আলগা হয়ে গেল।

স্ত্রীও ঠিক ঐ ধরনেরই কিছু বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন, সামলে নিয়ে ওর পিঠে একটা মৃদু চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, "দুৎ, অমন করে বলে! হুঁশ হারাস যে গল্প শুনে !...."

"উঃ! ভাগ্যিস!" বলে আরও খানিকটা সামলে নিলেন।

রহস্য

সতীনাথ ভাদুড়ী

বাড়ি ঢুকেই দোলগোবিন্দ চৌধুরীর মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। ভেবেছিলেন এক কাপ চা খেয়েই বেরুবেন ফুটবল ম্যাচ দেখতে। এরকম ম্যাচ গ্রামে বড় একটা হয় না। ভট্টাচায্যি বাড়িতে মেয়ের বিয়ে। বরযাত্রী এসেছে। তারাই ফুটবল খেলবে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে।

দেখলেন বারান্দায় মেঝের উপর ঘড়ি শুয়ে। ঘড়ির মা ঘটিতে করে মেয়ের মাথায় জল ঢালছেন ; আর এক হাতে পাখা। তাহলে এখনই মূর্ছা গিয়েছে ; পাঁচ মিনিটও এখনও হয়নি। মাথায় জল দিয়ে মিনিট পাঁচেক পাখা করলেই মেয়ের জ্ঞান ফিরে আসে ; কিন্তু তারপর তার শরীর হয়ে যায় খুব দুর্বল; পুরো একদিন বিছানায় শুইয়ে রাখতে হয় ; এই সময় ভয়কাতুরে মেয়েটা তন্দ্রার ঘোরেও চমকে চমকে ওঠে ; একজন কেউ তখন কাছে না বসে থাকলেই নয়। ...তাঁদের একমাত্র মেয়ের বেয়ারামের গতিবিধির এইসব খুঁটিনাটি তাঁর মুখস্থ। থাকবারই কথা! জন্ম থেকেই মেয়ের এই ব্যামো। আটমাসে হয়েছিল বলে এ মেয়ে চিরকাল ক্ষীণজীবী। মধ্যে মধ্যে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। কী দেখে যে ভয় পায় ছোটবেলায় বোঝা যেত না। বড় হয়ে যখন কথা বলতে শিখল, তখন বোঝা গেল। মাকড়সা। মাকড়সার ভয়েই মরে। কোথা থেকে যে এই মাকড়সার ভয় এল ! দোলগোবিন্দবাবুর বিশ্বাস যে মেয়ে এ জিনিস পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। ঘড়ি যখন পেটে তখন তার মায়ের নাকে আর উপরের ঠোঁটে খুব ঘা হয়। কবিরাজমশাই বলেছিলেন মাকড়সায় চেটেছে। এক রকম নাকি মাকড়সা আছে যেগুলো রাত্রিতে ঘুমন্ত মানুষের নাকের মধ্যে দাঁড়া ঢুকিয়ে রক্ত শুষে খেতে আসে। এই কথা শুনবার পর থেকে কিছুকাল ঘড়ির মা রাতে ঘুমোতে পারতেন না মাকড়সার ভয়ে। মায়ের সেই ভয়ই মেয়েতে বর্তাল নাকি ? কে জানে।...

দোলগোবিন্দ চৌধুরীর ফুটবল ম্যাচ দেখা মাথায় উঠল। স্ত্রীর হাত থেকে পাখাখানি নিয়ে তিনিও বসলেন মেয়ের মাথার কাছে।

বাইরের ঘরের ঘড়িতে পাঁচটা বাজল ঢং ঢং করে। ভারী মিষ্টি আওয়াজ ঘড়িটির—বিলাতের একটি বিখ্যাত গির্জার ঘণ্টাধ্বনির নকল করা। বহুকালের পুরনো কোন সাহেবের যেন ছিল ; ঠাকুরদা সদরে এক নিলামের ডাকে কিনেছিলেন। তখন চৌধুরী বাড়ির এতটা দৈন্যদশা ছিল না ; এখন তো ঘটিবাটি

পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে ; কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যেও ঠাকুরদার শখের জিনিস বলে, এই দেয়ালঘড়িটিকে বিক্রি করেননি দোলগোবিন্দবাবু। পুরনো হলে কী হবে ; এখনও সুন্দর 'টাইম' দেয়। বিক্রি না করার আরও কারণ আছে। ওই ঘড়িটা অন্যলোকে নিয়ে যাবে শুনলে তাঁদের একমাত্র মেয়ে কেঁদেকেটে অনর্থ বাঁধাবে। ছোটবেলা থেকে তার ওই ঘড়িটার উপর টান। বাড়ির ভিতরে হয়তো খুব কান্নাকাটি করছে, বাইরের ঘরে নিয়ে এলেই সব কান্না থেমে যেত ; হাঁ করে তাকিয়ে থাকত দেয়ালঘড়ির নড়ন্ত পেণ্ডুলামটির দিকে। হাঁটতে শিখবার পর তো কথাই নাই। ফাঁক পেলেই চলে আসত বৈঠকখানায়। এসেই ঘড়ি দেখবার আনন্দে হেসে একেবারে কুটিপাটি। তখনও মেয়ের নাম ঘড়ি হয়নি। কথা বলতে শিখবার পর সে বলত যে ঘড়িটা তাকে খুব ভালবাসে ; পোষাঘড়ি তাই সে কাছে গেলেই আহ্লাদে জোরে জোরে শব্দ করে। আরও কত মজার মজার কথা বলত ঘড়িটার সম্বন্ধে তার ঠিক নেই।...

মেয়ে হাতের মুঠো খুলেছে। মা বাবা বুঝলেন যে এতক্ষণে মেয়ের জ্ঞান ফিরে এল। 'ও ঘড়িমা, ভয় কী ? এই তো আমরা রয়েছি। চোখ খোল।'

ঘড়ি চোখ খুলল। মুখ এখনও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে। মা বাবার এসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে আজকাল... মেয়েটা সকাল থেকে বিয়েবাড়ি যাবার জন্য নাচানাচি করছিল। আর যাওয়া হল না। আজকের দিনটাও এই বিদঘুটে রোগ মেয়েটাকে রেহাই দিল না! দুঃখের কথা বই কি।

এ গল্প সে গল্প করে মেয়ের মন ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন বাবা।

ওদিকে স্কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই রেফারির খেয়াল হয় যে তাঁর রিস্টওয়াচটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ; তখন দরকার পড়ল আর একটি ঘড়ির। খোঁজ! খোঁজ! দেখা গেল দর্শকদের কারও কাছে হাতঘড়ি নেই। রেফারি নিজেও বরযাত্রীদলের লোক। বরযাত্রীদের মধ্যে যারা খেলতে এসেছে তারা ঘড়ি আনেনি মাঠে। শেষ পর্যন্ত স্কুলবোর্ডিং থেকে আনা এলার্মওলা একটি টেবিলঘড়ি হাতে নিয়ে রেফারি কাজ চালিয়ে নিলেন। সেই সময় বরযাত্রীদের ঠাট্টার উত্তরে গ্রামের কে একজন যেন উত্তর দিয়েছিল 'ঘড়ির দরকার কি মশাই এ গ্রামে? এখানকার মেয়েরা পর্যন্ত বিনা ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক কটা বেজেছে বলে দিতে পারে।'

এই কথার থেকেই ব্যাপারটি আরম্ভ। রেফারি ছিলেন একজন সাংবাদিক। শুনেই তাঁর কান খাড়া হয়ে উঠেছিল। খেলা শেষ হলে তিনি নিজে থেকে কথাটা পেড়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে। তারপর ঘড়ি নামে সেই মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিলেন। কৌতূহল চাপতে পারেননি। অসুস্থ শরীরের উপরও মেয়েটি ঠিক ঠিক সময় বলে দিয়ে, সেদিন তাঁর কৌতূহল পূরণ করেছিল। দোলগোবিন্দবাবু খুব কথা বলতে ভালবাসেন। রেফারি শুধু জিজ্ঞাসা

করেছিলেন—'এর নাম ঘড়ি রেখেছিলেন কবে থেকে?' উত্তরে দোলগোবিন্দবাব একেবারে বিরাট পর্ব শুনিয়ে ছেড়েছিলেন।

.....'তখন ও মেয়ে কত ছোট! ওর মা একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করে—দেখ তো কটা বাজল বাইরের ঘড়িতে। মেয়ে খেলা করছিল ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায়। সেখান থেকে সে-ই জবাব দিল—একটা কাঁটা একেবারে উপরে, আর একটা একেবারে নিচে। আমরা অবাক! সত্যিই বাইরের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজতে শোনা গেল। তখনও মেয়ে ঘড়ি দেখতে জানে না।—সেই থেকে ওর মা ওকে ঘড়ি বলে ডাকতে আরম্ভ করে।... ঘড়িমার আমার সব ভাল ; শুধু শরীরটা চিরকাল ওই একই রকম থেকে গেল। আমাদের এই একটিমাত্র সন্তান! তারও এই স্বাস্থ্য!.. ভেবেছিলাম বড় হয়ে সেরে যাবে। কই আর সারল! দশ বছর পূর্ণ হয়ে যাবে তার আসছে মাসে।'.... রেফারিসাহেব পরদিন সকালে আবার এসে মেয়েটির ফটো তুলে নিয়ে গেলেন। দিন কয়েক পরই শ্রীমতী ঘড়ির ফটো ও তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা খবরের কাগজে বার হল। বিবরণ বিস্তৃত।

গ্রামের লোকে এতকাল ঘড়ির এই দৈব ক্ষমতায় বিশেষ আমল দেয়নি।—পারে তো পারে ; অমন কত কিছুই আছে দুনিয়াতে ; চাঁদ সূয্যি তারা দেখে সময় বলা, ওসব তো চিরকালই আছে। কিন্তু খবরের কাগজে তাদের গ্রামের নাম এত বড় বড় অক্ষরে বার হবার পর আর ব্যাপারটাকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

উড়িয়ে দেবার উপায় ছিল না! কেননা এর পর থেকে গলায় ক্যামেরা ঝোলানো, একজন দুজন লোক প্রায়ই আসতে আরম্ভ করল গ্রামে, ঘড়িকে দেখবার জন্য। বহু রকমের খবর বার হতে লাগল বিভিন্ন খবরের কাগজে মেয়েটি সম্বন্ধে।

পাড়ায় সবচেয়ে বেশি হইচই পড়ে গেল যেদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর সিভিল সার্জনের গাড়ি এসে লাগল দোলগোবিন্দ চৌধুরীর বাড়ির দুয়ারে। উপরওয়ালার হুকুমে তাঁরা এসেছিলেন।

ব্যাপার হয়েছিল কী—তখন কলকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। একজন পৃথিবীবিখ্যাত আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ওই সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি মানুষের দুর্বোধ্য অলৌকিক ক্ষমতাগুলো নিয়ে ইদানীং গবেষণায় মেতেছিলেন। কুমারী ঘড়ির ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতার সংবাদ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি মেয়েটিকে দেখতে উৎসুক হয়ে বলেন যে, এর মধ্যে যদি কোনো বুজরুকি না থাকে, তাহলে তিনি মেয়েটিকে আমেরিকা নিয়ে যেতে চান। সেখানে তাঁর মনোবিদ্যা গবেষণাগারে একে কিছুকাল পরীক্ষাধীন রাখতে হবে। মেয়েটির মা বাবা সেখানে সঙ্গে যেতে পারেন। পড়াশোনা, থাকা কোনো বিষয়ে টাকা পয়সার অভাব হবে না। ব্যাপারটির মধ্যে কোনো রকম চালাকি আছে কি

না সেইটা এখানে আগে নিজে যাচাই করে নিতে চান তিনি।

এইজন্য সরকারীভাবে উপর থেকে আদেশ এসেছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ঐ বৈজ্ঞানিককে যথাসম্ভব সাহায্য করতে এ বিষয়ে। সিভিল সার্জন আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রথমে এসে ঘড়ির অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা নিয়ে নিজেরা নিঃসন্দেহ হয়ে নিলেন। তারপর দোলগোবিন্দবাবুকে আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের ইচ্ছার কথা জানালেন। আমেরিকা যাবার প্রস্তাবে তাঁরা কিছুতেই রাজী নন। শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন এই ভেবে যে সেখানে গেলে মেয়ের পুরনো রোগটি সারাবার একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

ঠিক হয়ে গেল যে ঘড়ির প্রাথমিক পরীক্ষা নিতে আসবেন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক জেলা সদরে। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি নাই ; আরও অনেক রকম অসুবিধা। সেইজন্য সিভিল সার্জন সদর হাসপাতালের একটা দিক একেবারে খালি করে দিলেন। সেইখানেই ঘড়িকে এনে রাখতে হবে দিন পনের ধরে, তার মা বাবার সঙ্গে। পুলিস পাহারা থাকবে চারিদিকে। ভিতরে যে যাবে বা যে থাকবে তাদের তন্ন তন্ন করে সার্চ করে ঢুকতে দেওয়া হবে। কালো পর্দা টাঙিয়ে ঘরদুয়ার একেবারে অন্ধকার করে দেওয়া হল যাতে রোদ্দুর বা ছায়া দেখে বেলার আন্দাজ না পাওয়া যায়। পিচকারি দিয়ে মাকড়সা মারবার ওষুধ ছিটানো হল যাতে মেয়েটি ভয় না পায়। বাইরে থেকে পাখির ডাকের আওয়াজটি পর্যন্ত যাতে না পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করা হল। সব দিকে বৈজ্ঞানিকের সজাগ দৃষ্টি ; কোনো রকম ফাঁকির সুযোগ যাতে না থাকতে পারে পরীক্ষায়।

আমেরিকার ব্যাপার। সারা পৃথিবীর কাগজে প্রচার হয়ে গেল এ পরীক্ষার কথা। দিন কয়েক আগে থেকেই এসে এই শহরে ডেরাডাণ্ডা গাড়লেন বহু কাগজের প্রতিনিধি, আর হুজুগে লোকের দল। সাধারণ লোকে এরই মধ্যে ঘড়িমা বলে ডাকা আরম্ভ করেছে মেয়েটিকে ; পুলিস পাহারা ঠেলে এসে প্রণাম করতে চায়। যে গ্রামটির নাম মেয়েটির দৌলতে পৃথিবীর মানচিত্রে লেখা হয়ে যাচ্ছে সেখানকার লোকেদের আজ গর্বের অন্ত নেই।

কেমনভাবে কখন ঘড়ির পরীক্ষা নেবেন সেকথা বৈজ্ঞানিক দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলেননি। ঠিক হল ঘড়িকে বেশির ভাগ সময় শুয়ে থাকতে হবে বিছানায় ; অল্প অল্প করে যখন তখন খাওয়ানো হবে। খিদে পাওয়া বা ঘুম পাওয়া দেখে যাতে সে সময়ের আন্দাজ না পায়। এই ব্যবস্থা চলল কয়েকদিন। পরীক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে দোলগোবিন্দবাবু, তাঁর স্ত্রী, তাদের গ্রামের লোক, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বা সিভিল সার্জনের কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সাংবাদিকদের মধ্যে অধিকাংশের ছিল। ফলাফলের জন্য দিনকয়েক প্রতীক্ষা করে তারা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সেই সময় একদিন হঠাৎ ঘড়ির ঘুম ভাঙিয়ে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন কটা বেজেছে?'

ঘড়ির মা বাবাকে তিনি বিশ্বাস পাননি। তাই তাঁরা মেয়ের কাছে বসে থাকা সত্ত্বেও দোভাষীর কাজ করছিলেন সিভিল সার্জন। ঘড়ি কয়েক সেকেন্ড চোখ বুঁজে ভাবতে চেষ্টা করল। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল—'নটা বেজে দশ মিনিট।' বৈজ্ঞানিক ঘড়ির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সিভিল সার্জনকে নিয়ে।..... এর মধ্যে যে বুজরুকি আছে তা তিনি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন। এসব ধাপ্পাবাজি তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনে অনেক দেখেছেন।... কিন্তু এতটা ভুল তিনি আশা করেননি। রাত দেড়টার সময় বলছে সাড়ে নটা.... কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কি এত তাড়াতাড়ি মত স্থির করে নেওয়া উচিত ?.... তিনি আর একটা সুযোগ দেবেন মেয়েটিকে।......

ঘড়ি কিন্তু বুঝতে পারেনি যে সে ভুল বলেছে ; তার মা বাবাও না। সে মিনিট পনের পর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘণ্টা তিনেক পর আবার বৈজ্ঞানিক সিভিল সার্জনকে সঙ্গে করে এসে, ঘড়ির ঘুম ভাঙালেন।

সময় জিজ্ঞাসা করায় ঘড়ি চোখ বুঁজে একটু ভাবতে চেষ্টা করে।.... মা বাবা একদৃষ্টে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।... কিন্তু একি ? মেয়ের কপালে রেখা পড়ল কেন ?..... স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সে খুব ভাবছে! এত তো তাকে ভাবতে হয় না কখনো ! দুশ্চিন্তার রেখা ওগুলো।

সাহেব মনে মনে হাসছেন এতটুকু মেয়ের এই নাটুকে ভান করা দেখে।

এতক্ষণে ঘড়ি চোখ খুলেছে। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ!...ভয় পেল নাকি ?...কী যেন বলতে চায়। সে উঠে বসল। দোলগোবিন্দবাব অবাক।... এমন তো কখনও হয় না!.... হল কী ?

ভয় পেয়েছে কি না, জিজ্ঞাসা করতে চান মেয়ের মা। কিন্তু স্বামীর কটমট চাউনি দেখে থেমে গেলেন—সাহেবের যে হুকুম কেউ কথা বলা দূরে থাক, আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারবে না মেয়ে উত্তর দেবার আগে।...মা বাবার উপরই সাহেবটির সন্দেহ বেশি ; পর্দার আড়ালে লোক মোতায়েন আছে, তাঁদের উপর নজর রাখবার জন্য।

ঘড়ি অতটুকু মেয়ে হলে কি হয়। আবছাভাবে বুঝছে যে তার অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষার সঙ্গে জড়ানো আছে তাদের পরিবারের প্রত্যেকের সততার সম্মানের প্রশ্ন।......হতাশার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার মুখে। 'আমাকে ছেড়ে দাও ;—আমি চাই না বলতে।' তার চোখ ফেটে জল আসছে। ঝাপসা চোখে সে তাকাল তার মায়ের মুখের দিকে। মায়ের চাউনিতে আশ্বাস ভরা— বলতে চান 'যা পারিস তুই বল না।' মনের বাধা ঠেলে মরিয়া হয়ে ঘড়ি বলল—'এখন এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট।'

কথাটা কোনোরকমে বলেই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কেঁদে ওঠে ঘড়ি। সময় ঠিক বলতে পারেনি তা সে জানে!...কেন আন্দাজ এমন হল।...এমন তো জীবনে

কখনও হয়নি তার।

সাহেব নিজের ঘড়ি দেখলেন—চারটে বেজে ষোল মিনিট—সকাল হবার আর বেশি দেরি নেই। বৃথাই কয়েকদিন সময় নষ্ট হল—নিষ্পাপ মেয়েটাকে অযথা কতকগুলো মিথ্যে কথা বলা শেখাচ্ছে! বাপমায়ের দিকে একটা রূঢ় অবজ্ঞার দৃষ্টি হেনে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাইরে প্রতীক্ষমাণ সাংবাদিকদের দিকে। তাঁর কাছে মাপ চাইবার ভাষা খুঁজে পান না সিভিল সার্জন আর জেলাম্যাজিস্ট্রেট ; খুব বোকা বানিয়েছিল বটে পরিবারটা এ' কদিন তাঁদের।

মা মেয়েকে কোলের মধ্যে টেনে নিলেন। দোলগোবিন্দবাবুর চেয়ে কেউ বোধ হয় বেশি অবাক হয়নি। ঘড়ি একটু শান্ত হলে তিনি তাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেন। মেয়ের উত্তর থেকে তিনি মোটামুটি বুঝলেন ব্যাপারটা।

সময় জিজ্ঞাসা করলেই ঘড়ি মুহূর্তের জন্য চোখ বুঁজে ভেবে নিত। তখন তার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠত বৈঠকখানার দেয়ালঘড়ির ডায়ালটা! সেইটা দেখেই সে বলত ক'টা বেজেছে। একদিনের জন্যও এই রকম ভাবে বলা তার উত্তর ভুল হয়নি। ঘড়ির অলৌকিক ক্ষমতায় কোনো ফাঁক ছিল না; শুধু সে যে মানসচক্ষে ঘড়ির ডায়ালটা দেখতে পায়, এই কথাটি মা বাবা কারও কাছে বলতেন না। মেয়েকেও একথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আজ হল কী?

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে— 'প্রথমবার দেখলাম নটা দশ। তারপর আবার যখন ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তখন দেখে ন'টা বেজে দশ মিনিট।...এ তো হতে পারে না।.....দুইবারই এক সময় কী করে হবে?... বুঝে গেলাম যে আমি বলতে পারব না.....তখন ভুল জেনেও আন্দাজে একটা যা তা বলে দিলাম।....'

তার কান্না আর থামে না।

বাইরে তখন লোকে লোকারণ্য। ঠাট্টা বিদ্রূপ গালাগালির স্রোত বইছে। তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ পর্দাঘেরা গাড়িতে করে পরিবারটিকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। দোলগোবিন্দবাবু প্রথমেই ছুটে গেলেন বাইরের ঘরের ভিতর।

....দেয়ালঘড়িটা নটা বেজে দশ মিনিটে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

....বন্ধ হবার তো কথা নয়। এ ঘড়িতে যে পনের দিন পর পর দম দিতে হয়। ....তিনি যে যাবার আগে নিজ হাতে দম দিয়ে গিয়েছিলেন!

ঘড়িটা খুলে দেখলেন, মাকড়সায় জাল বুনেছে ভিতরে। তাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে।.....একটা খুদে মাকড়সা লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেল।

পাতালকন্যা

মনোজ বসু

হরিপ্রসন্ন আমার বাল্যবন্ধু। দায়ে পড়ে তার চাকরি নিয়েছি। তবে সে লোক ভাল। আমি কর্মচারী, সে মনিব—বাইরের লোক আপনারা কোনক্রমে বুঝতে পারবেন না। যেন বন্ধুই আমি, খাতিরে তার কাজকর্ম করে দিই। মাসান্তে হঠাৎ একদিন খানকয়েক নোট আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে চট করে সরে পড়ে। এই হল মাইনে দেওয়ার প্রক্রিয়া।

সুন্দরবন অঞ্চলে হরিপ্রসন্নর অনেকগুলো চক। নতুন আইন পাশ হল, এবারে জমিদারি গুটিয়ে নেবার পালা। কতক জমি বিক্রি করে, কতক বা বেনামি করে, আর কতকটা জায়গায় বাগান-পুকুর ইত্যাদি বানিয়ে তড়িঘড়ি যতদূর বের করে নেওয়া যায়। এরই তোড়জোড়ে আজকাল বাদাবনে তার ঘনঘন যাতায়াত।

একবার আমায় বলল, যাবি ?

অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নয়, যেতেই হবে। রুবিকে নিয়ে মুশকিল— কার কাছে রেখে যাই ? দুর্ভাগা মেয়ে, ছ মাস বয়সে মা হারিয়েছে, আমিই মা-বাপ দুই হয়ে দেখাশুনা করি। খুড়িমা সম্পর্কের একজনকে অনেক বলে- কয়ে এবং নগদ কুড়ি টাকা হাতে দিয়ে দশ দিনের কড়ারে মেয়েটাকে গছিয়ে রওনা হলাম।

বৈশাখ মাস। যা গরম পড়েছে—গাঙে খালে কয়েকটা দিন তোফা হাওয়া খেয়ে বেড়ানো যাচ্ছে। এটা উপরি লাভ। সুন্দরবন শুনে ভাববেন না বনজঙ্গলই শুধু। জঙ্গল তো বটেই—হঠাৎ তার মধ্যে দেখবেন, পঙ্খের কাজ-করা প্রায়-অভগ্ন পাকা কুঠুরি—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কোন অনুচর বানিয়েছিল। হয়তো রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার ইদানীং মহানন্দে বিনা-ভাড়ায় তথায় সগোষ্ঠী বসতি করছে। কখনো বা নজরে পড়বে অনেকটা ফাঁকা জায়গা—হাসিল হয়ে সেখানটা আবাদ হচ্ছে। কিংবা নদী-খালের ধারে দেখতে পাবেন ছোটখাটো দিব্যি একটা গ্রাম। কাছাকাছি বনকর-অফিস, তাকে ঘিরে মানুষ ঘরবাড়ি তুলছে। অথবা গ্রামের মতন দেখেই সরকারি অফিস বসিয়েছে সেই জায়গায়। নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন না—স্বচক্ষে দেখে আসুন, কতটুকুই বা পথ আপনাদের জায়গা থেকে!

প্রথম আমরা শিবনগর কাছারিবাড়ি উঠলাম। নায়েবের সঙ্গে সেহা-কড়চা রোকড়-খতিয়ান নিয়ে বিষম আয়োজনে হিসাবপত্তর চলেছে। কিন্তু জানি তো হরিপ্রসন্নকে। ছটফটে স্বভাবের মানুষ—দিন চারেক পরে বিরাট কড়চা-খাতা সশব্দে বন্ধ করে বলল, এদিকে ভালই হচ্ছে নায়েবমশায়, হাঁসখালি চকের কী

গতিক একবার দেখে আসা দরকার। ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিতে বলুন—এই ভাঁটায় বেরিয়ে পড়ব।

এই হাঁসখালি যাওয়ার পথেই কাণ্ডটা ঘটল। কুক্ষণের যাত্রা—বাপ-ঠাকুর্দার পুণ্যে প্রাণে বেঁচে এসেছি। কিংবা বলব, পরম লগ্নে বেরিয়েছিলাম— ভাবতে আজও রোমাঞ্চ লাগে। বলছি, বলছি—অত তাড়াবেন না। বলবার জন্যে তো আসর সাজিয়ে বসলাম।

দুপুরবেলা আমাদের পানসি পাশখালি দিয়ে যাচ্ছে। গোটা দুই বাঁক পার হতে পারলে বড়-গাঙ। হরিপ্রসন্ন থামতে ইশারা করল মাঝিকে। হামেশাই জঙ্গলে আসে, ঝানু শিকারি—আমরা চতুর্দিকে নিঝুম নিঃসাড় দেখছি, সে তার মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের চলাচল টের পেয়েছে।

পানসি এক হেঁতাল-ঝোপের আড়ালে নিয়ে রাখল। পনের-বিশ মিনিট যায়, বন্দুকে টোটা ভরে হরিপ্রসন্ন জঙ্গলের দিকে তাক করে আছে। তার পরে দুড়ুম দুড়ুম। হরিণ পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলে। এ রকম যাওয়া ঠিক নয়—কিন্তু স্ফূর্তির চোটে বাদার নীতিনিয়ম ভুলে গেছে।

টানাটানি করে শিকার তো নৌকায় তুলেছে—বাঁকের মুখে এমন সময় মোটরলঞ্চ। শিকারের লাইসেন্স নেওয়া নেই, তার উপরে মাদি-হরিণ পড়েছে—হেন অবস্থায় বনকরের লঞ্চের সামনে পড়া আর বাঘের মুখে পড়া একই কথা। হরিপ্রসন্ন তা বলে ঘাবড়ায় না। যেন ওদেরই প্রতীক্ষায় ছিল। সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল বড্ড বাঁচিয়ে দিলেন মশায়রা। নয়তো নৌকো নিয়ে বেগোন ঠেলতে হত আপনাদের অফিস অবধি। ফিস্টি হবে— দাড়িওয়ালা সেই লোকটা আছে তো, সেই যে আহা-মরি মাংস রাঁধে? হরিণটা লঞ্চে তুলে দাও হে—

হরিণ তোলবার আগে নিজেই উঠে পড়েছে। আমাদের হাঁক দিয়ে বলে, বড়-গাঙে বেড়িয়ে বিষখালির মোহানায় চাপান দিয়ে থাকগে। নিঃশ্বেস ফেল না, তোমাদের ফিস্টি—রাঁধা-মাংস নিয়ে আসব। শুধু উনুনে চাট্টি ভাত চাপিয়ে রেখ, ব্যস!

সে হল দুপুরবেলার কথা। এক পহর রাত হয়ে গেল, পেটের ভিতর বাপান্ত করছে। দেখা নেই কারো—না হরিপ্রসন্ন, না তার আহা-মরি মাংস। সারাদিন বড্ড ধকল গেছে, পাশখালিতে জল ছিল না—কাদায় নেমে তিন-চার মাইল নৌকো ঠেলেছি। মাঝিমাল্লারা সন্ধে থেকে নাক-ডাকাচ্ছে। একা বসে বসে আমিও কখন শুয়ে পড়েছি—একদম কিচ্ছু জানি নে।

পানসি হেলছে দুলছে—ঘুমের মধ্যে এক সময় টের পেলাম। অর্থাৎ জোয়ার এসে গেছে। বাচ্চাকে দোলনায় চাপিয়ে মা যেমন দোলা দেন, ঠিক তেমনি। মন্দ লাগে না। খানিক এমনি গেল। ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন দেখছি—

হঠাৎ মাঝি চেঁচিয়ে ওঠে ঃ সর্বনাশ হয়েছে--নৌকো বানচাল !

লাফিয়ে উঠে বসে আতঙ্কে থরথর কাঁপি। জোয়ারের টানে কাছি ছিঁড়ে নৌকো

তীরের মতন ছুটেছে। নোনা জলের তরঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে সাদা দাঁত মেলে হাসছে খলখল শব্দে। যা অবস্থা, সবসুদ্ধ এতক্ষণ জলতলে যাইনি—সেই তো আশ্চর্য !

মাঝি হাল চেপে ধরে সামলাতে গেল তো মড়াৎ করে হাল দুই খণ্ড। চরমক্ষণের অল্পই আর বাকি। হাত-পা কোলে করে সময়টুকু কাটিয়ে দাও—কোন-কিছুই করার নেই। জলের কল্লোলধ্বনি আমার রুবির কান্নার মতন লাগছে। করাল অন্ধকারের পার থেকে রুবির কান্নাভরা ডাক শুনি যেন: বাবা গো, বাবা—

ঘন অন্ধকারে কোন জায়গায় কী অবস্থার মধ্যে ছুটছি, বোঝবার জো নেই। পাগলা হাতির মতো মাথা নাড়তে নাড়তে নৌকো হঠাৎ গতি বন্ধ করে দাঁড়াল। পাড়ে লেগেছে, লতাপাতায় আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে কাছি বাঁধার মতো হয়েছে। এমন তো হয় না—বেঁচে গেলাম তবে নাকি ? টেমি জ্বেলে চৌখুপি-লণ্ঠনের মধ্যে পুরে উঁচু করে ধরলাম। দুটো উদ্দেশ্য—কোথায় কি ভাবে আটকে আছি, তার কিছু হদিশ পাওয়া। আর জায়গাটা যদি গরম অর্থাৎ ব্যাঘ্রসংকুল হয় আলো ধরে জানোয়ারদের ভয় দেখানো।

মস্ত এক বাঁকের মাঝামাঝি কি গতিকে কিনারায় এসে পড়েছি। যে জোরে আসছিল, পাড়ে ধাক্কা খেয়ে পানসির কুচি-কুচি হয়ে যাবার কথা। কিন্তু বুনো-লতা জালের মতো আটকে ধরল। বিধাতাপুরুষ আমাদের বেমক্কা পরমায়ু দিয়েছে, এই থেকে বোঝা যাচ্ছে।

গাঙের পাশাপাশি দীর্ঘ বিসর্পিল এক বস্তু—বাঁধ বলে তো মনে হচ্ছে। আরে, মানুষ কথা বলছে। মানষেলায় এসে পড়েছি তবে তো !

স্ফূর্তিতে নেমে পড়লাম। বিস্তর গোলঝাড়—সেগুলো পার হয়েই বাঁধ। বড় বড় কেওড়াগাছ জায়গাটায় আঁধার জমিয়ে তুলেছে। বাঁধের ওধারটা একেবারে ফাঁকা। মেঠো-জমি ভেঙে হনহন করে কারা আসছে, গুনতিতে পনের-বিশ জন। বিলের মুক্ত বাতাসে ওদেরই কথাবার্তা কানে গিয়েছিল।

এসেই ধমক দিয়ে ওঠে আমার উপর : আচ্ছা মানুষ! আঘাটায় নেমে পড়ে লণ্ঠন দেখাচ্ছ। সন্ধে থেকে আমরা হা-পিত্যেশে পথ তাকিয়ে আছি। এস, চলে এস—

কোথায় ?

পালোয়ান গোছের এক ব্যক্তি হুংকার দিয়ে উঠল : কোথায় যেন জানেন না! আকাশ থেকে পড়লেন।

আকাশ থেকে পড়িনি, জোয়ারের টানে এসে পড়েছি। সত্যিই আমি কিছু জানি নে।

থাক, থাক। জাত-যাওয়া কাণ্ড—রাতদুপুরে উনি এখন রঙ্গরস শুরু করলেন।

হাত ধরল। উঃ, উঃ— হাড় যেন গুঁড়ো হয়ে যায়। লোকটা হাত ছেড়ে দিয়ে

ব্যঙ্গের সুরে বলে, ননীর পুতুল! গুটিগুটি অমন পা ফেললে চলবে না, জোর কদমে চল। লগ্নের আর দেরি নেই।

পাকা-গোঁফ এক প্রবীণ মানুষ এগিয়ে এসে হাতের লাঠিটা আমার হাতে গুঁজে দিলেন। ভাল মানুষ তিনি, কোমল কণ্ঠে বললেন, তোমার লণ্ঠনটা আমার হাতে দাও দাদাভাই। অজানা পথ—লাঠি ধরে সাবধান হয়ে আমাদের সঙ্গে এস।

চোখ রগড়ে পরখ করি, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছি না তো? সকাতরে বললাম, লগ্ন—কিসের লগ্ন? বুঝতে পারছি নে, কেন যেতে হবে আপনাদের সঙ্গে।

হেসে উঠলেন সেই প্রবীণ মানুষটি : ও রামশরণ, শোন শোন— নাতজামাই কেন আমাদের সঙ্গে যাবে, বুঝতে পারছে না। দুনিয়ার এত মুল্লুক থাকতে শোলাদানায় কেন এসে পড়ে, তা-ও বোধ হয় জানে না।

হো-হো হা-হা বহু কণ্ঠে উচ্ছল হাসির ধ্বনি। একজন বলল, মশালগুলো ধরিয়ে ফেল হে! ভূতপ্রেতের মতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ, বর ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

আমার সেই লণ্ঠন খুলে একে একে টেমিতে মশাল ধরিয়ে নিল। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে, মশালের আলো কাঁপছে কালো কালো মূর্তিগুলোর উপর।

প্রবীণ লোকটি বললেন, আগে পিছে মশাল ধর। মেঠো-পথ—হোঁচট না খায়। নাতজামাই হাঁটিয়ে নিয়ে বাড়ি তুলতে হচ্ছে। তোমারই দোষ দাদাভাই। ষোল-বেহারার পালকি ঘাটে বসে আছে এখনো। খবরাখবর করে তাদের নিয়ে আসবার সময় নেই। উঃ, যা কষ্টটা দিয়েছ! বসে বসে বিরক্ত হয়ে শেষটা ওরা বলল, গাঙের কিনারা ধরে এগিয়ে দেখা যাক। তাইতো তোমায় পেয়ে গেলাম।

মাঠে নেমে পড়েছি এখন। থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, নৌকোর ওদের কিছু যে বলা হল না—

যা বলবার আমরা বলব। যেতে বলা হচ্ছে, তাই চল না তাড়াতাড়ি।

অধিক তর্ক করবার তাগত নেই। একটিবার হাত ধরেছিল, তার জ্বলুনি থামেনি এখনো। রহস্যময় লোকগুলো আমায় ঘিরে নিয়ে চলল। কোথাও খানাখন্দ, কোথাও আল-পথ, কোথাও বা ধান কেটে-নেওয়া জমির উপর দিয়ে চলেছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই—দম-দেওয়া এক কলের-পুতুল হয়ে চলেছি।

অবশেষে পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। তেমাথা-পথের উপর তেঁতুলগাছ। অদূরে বাড়ির উঠানে সামিয়ানা খাটানো, বিস্তর লোকের আনাগোনা অকুস্থলে পৌঁছে গেছি।

বর নিয়ে এসেছি—

অমনি ঢোল-কাঁসি-শানাই বেজে উঠল কোনদিক থেকে। উলু দিচ্ছে মেয়েরা, শাঁখ বাজাচ্ছে। মাঠের দিককার আকাশে শোঁ-শোঁ করে হাউই উঠে তারা কাটছে।

কন্যাপক্ষ অবস্থাপন্ন। বিয়ের আসর খাসা সাজিয়েছে। কাচের হাঁড়ি ঝোলানো সারি সারি, বাতি জ্বেলে দিয়েছে। রুপো-বাঁধানো হুঁকোগুলো লোকের হাতে হাতে ঘুরছে—হুঁকোদানের উপর বড় একটা বসতে পায় না। গোলাপজল ছিটোচ্ছে ঘন ঘন।

পুরুত তৈরি হয়ে আছেন। উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে তিনি আর-এক দফা বকতে লাগলেন : ছি-ছি, বড্ড ছেলেমানুষ! একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে তোমাদের! জাত মারবার জো করছিলে। আর দেরি কোরো না, বরাসনে বসে পড়।

আত্মাভিমান হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রুবির মুখ ভেসে উঠল মনের উপর। মৃত্যুপথযাত্রিণী রুবির মার বাচ্চা মেয়েটাকে সেই আমার কোলে তুলে দেওয়া।

মারুন, কাটুন, যা ইচ্ছে করুন—কিছুতে আমি আসনে বসছি নে। গায়ের জোরে বিয়ে দেবেন নাকি ?

এক-উঠোন লোকের মধ্যে কেউ চটে না। হাসে, যেন ভারি এক মজার ব্যাপার।

শোন, শোন—গায়ের জোরের বিয়ে নাকি! বর বলছে এই কথা।

আর একজন বলে উঠল, উপোস করে আছে। তার উপর এ-ঘাট ও-ঘাট করে মাথা বিগড়ে গেছে। আসনে বসিয়ে হাওয়া কর, ঠিক হয়ে যাবে।

সেই নিশিরাত্রে বনের প্রান্তে বাতির অনুজ্জ্বল আলোয় বিচিত্র জন-সমাবেশের মধ্যে আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে যাচ্ছি। অতীত ধুয়ে মুছে প্রায় নিশ্চিহ্ন। শহরের পিচঢালা রাস্তা, পাঁচতলা-সাততলা বাড়ি, সিনেমা-থিয়েটার, ট্রামগাড়ি, মোটরগাড়ি—সমস্ত বুঝি মনের আজগুবি কল্পনা! স্বপ্ন দেখছিলাম নাকি এতক্ষণ—স্বপ্নের ঘোরে এক লহমায় যেন জীবনের তিরিশটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন বিষম হাসি পাচ্ছে কলকাতা-শহর ইত্যাদি হাস্যকর অবাস্তব কতকগুলো জায়গার কথা মনে ভেবে।

শুভদৃষ্টি। চৌকির উপর দাঁড়িয়েছি টোপরে চাদর ঢাকা দিয়ে। পিঁড়ির উপর কনে বসিয়ে সাত পাক ঘোরাচ্ছে। চোখ নিচু হয়ে আছে আমার। চোখ মেলে বউ দেখব, এর চেয়ে বেহায়াপনা আর কী হতে পারে! বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করছে। দেখন-সরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। সরার মধ্যে নানা রকম বাজির মশলা, জ্বালিয়ে দিলে চারিদিকে যেন দিনমান হয়ে যায়। শুভদৃষ্টির সময় জ্বালে এইগুলো। সরা জ্বালিয়ে পাশ থেকে বলছে, চোখ মেল—চোখ মেল গো! শুভক্ষণে চার চোখের মিলন হবে, তবেই তো আমোদ-আহ্লাদে কাটবে সারাজীবন।

মুদিত পদ্মকলির মতন দু'টি ডাগর চোখ আমার দৃষ্টির সামনে। থরথর কাঁপছে চোখের পাতা—ভোর-রাত্রে পদ্মকলি এমনি করেই বুঝি পাপড়ি মেলে। সরার উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, দুই চোখে দীঘির মতো কালো গভীরতা। জল উছলে পড়ল সেই দীঘি ছাপিয়ে চোখের প্রান্ত বেয়ে। কী তোমার মনোব্যথা ওগো কন্যা ? ইচ্ছে করে, আদর করে চোখ মুছিয়ে দিই। কিন্তু চারিদিকে এত মানুষ—লজ্জায় ঘাড় তুলতে পারিনে, তা হাত দিয়ে চোখ মোছাব!

বাসরঘরে এক শয্যায় আমরা দু'জনে। কত রাত্রি হয়েছে, বলতে পারব না। মাটির দেয়ালের কুলুঙ্গিতে পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলছে। মেয়ে-বউগুলো

ঠাট্টাতামাসায় অনেক জ্বালাতন করেছে, জানলার বাইরে এখনো পাতান দিয়ে আছে কি না জানি নে। থাকে থাকুক। ঠোঁটই নড়ছে আমাদের, ঠোঁটে ঠোঁটে সামান্য ব্যবধান—কথাবার্তা কারো আর শুনতে হবে না।

মন্ত্র পড়ার সময় নামটা পেয়েছি-পদ্ম। সেই নিঃশব্দ কণ্ঠে বললাম, পদ্ম, তুমি কেঁদেছিলে তখন—

না তো !

তা হলে বলছ, কানা তোমার বর ?

পদ্ম চুপ করে থাকে।

আমায় পছন্দ হয়নি বোধহয় ?

পদ্ম বলল, অমন বললে আমার কত কষ্ট হয় জান! সকলে বলছিল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি রাগ করতে লাগলে, বিয়েয় কিছুতে বসবে না। আগে একবার নাকি বিয়ে হয়েছিল তোমার—একটা মেয়ে আছে। শুনে আমার ভয় করতে লাগল। আচ্ছা, ও সব কি সত্যি ?

গোটা কলকাতা শহর যায় যাক স্বপ্ন হয়ে—কিন্তু আমার রুবি! বিষম সন্দেহের দোলায় দুলছি। গুটিসুটি হয়ে রুবি আমার কোলের মধ্যে ঘুমোয় আজ পাঁচ-পাঁচটা বছর। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে ফিরতে একটু দেরি হলে। ও বাবা, তোমার বিছানা করে রেখেছি এই দেখ। ঐটুকু মেয়ের কাজ দেখলে তাজ্জব হয়ে যাবেন।.... আর, এইখানেই বিয়ে হয়ে গেল খানিক আগে—পাশে নববধূ—উপোস করে ছিলাম এই বিয়ের জন্য—পথ ভুল করে —দেরি হয়ে গেছে বিয়ে বাড়ি পৌঁছতে, সেজন্য এরা খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল— এতজনের কাছে শুনে শুনে মনে হচ্ছে, এটাই সত্য। যে-জীবন এতখানি বয়স ধরে কাটিয়ে এসেছি, সমস্ত কেমন ধোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। ভয় হচ্ছে, রুবিও শেষটা ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে না যায়।

এই দেখ, আবার তুমি মুখ অন্ধকার করলে। হাসো—হাসতে হয় গো আজকের দিনে। তোমার মুখে সব সময় যাতে হাসি থাকে জীবন দিয়ে আমি তাই করব।

আমিও সেটা মনে-প্রাণে মেনে নিচ্ছি। দ্বিধা-সন্দেহ-ভয় অনেক ছিল, সমস্ত মুছে গেছে এইটুকু সময় পদ্মর সঙ্গে কাটিয়ে। বললাম, পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার—কাল বোধহয় বাসিবিয়ে-টিয়ে—কাল আর যাওয়া হচ্ছে না, যাব আমরা পরশু সকালবেলা। গিয়েই তুমি রুবিকে কোলে তুলে নিও সকলের আগে। রুবির মা হোয়ো। আমার মেয়ে যদি হাসে—দেখো, কত হাসি হাসব তখন আমি।

পদ্ম বলল, এরা যদি যেতে না দেয় ?

সে কি!

ধর, যদি ঘরজামাইয়ের মতো এখানে থাকতে হয় চিরকাল। কোন কিছুর অভাব-অনটন রইল না। তুমি মনিব হলে, কর্তা হলে—আমি তো দাসীবাঁদী আছিই, সকলে তোমার হুকুমদার হয়ে কাজকর্ম করবে।

না, না, রুবি তবে ভেসে যাবে নাকি?

শুয়ে ছিল পদ্ম, উঠে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে রুবির কথা খানিকক্ষণ। তারপর গুম হয়ে থেকে আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

সামনে রোয়াক। রোয়াক পার হয়ে কোন দিকে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চাঁদ উঠেছে, খোলা দরজায় এক ফালি জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটছে, দিনমানের মতো পরিষ্কার।

পদ্ম ফিরে এল এক আঁচল স্বর্ণচাঁপা নিয়ে। সুগন্ধে ঘর ভরে গেছে। বলে, নিচু ডালে অনেক ফুটে ছিল। তোমার জন্যে তুলে নিয়ে এলাম। নাও।

দু-হাত পেতে নিলাম। অঞ্জলি ভরে গেল। ফোঁস করে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে পদ্ম—আমার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। বললাম, তুমি বড় ভাল পদ্ম—তোমার জন্য সমস্ত ছাড়তে পারি। কেবল সেই আমার মা-হারা মেয়ে—কেউ নেই তাকে দেখাশুনা করবার। পাঁচ-দুয়োরে ঠেলা খেয়ে মরবে। আসবার সময় দু-হাতে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল, হাত ছাড়িয়ে দিয়ে চলে এলাম।

আবার বলি, রাগ করলে পদ্ম ?

জবাব দিতে গিয়ে পদ্মর কথা ফোটে না। জ্যোৎস্নার আলোয় মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরি। বললাম, কী ভাবছ তুমি বল—

চল, কথা বলতে বলতে যাই।

কোথায় ?

এস না। এদের কথায় এদ্দূর আসতে পারলে, আমার কথায় যাবে না কেন ?

বিয়েবাড়ি এখন শান্তিতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে, একটি মানুষ জেগে নেই। তেমাথার তেঁতুলগাছ ছাড়িয়ে দুই চোর আমরা টিপিটিপি চলেছি। আরও খানিক এগিয়ে পদ্মর এবার গলা ফুটল। আহা, গানের সুরও এমন মিঠা হয় না। বলে, রুবির কথা ভাবছি। মা না থাকার কষ্ট আমি জানি। আমারও মা নেই—ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে মারা গেলেন। তখন আমি একেবারে ছোট, ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়ে। বাবা আর গাঁয়ের মানুষরা ঘুরতে ঘুরতে শেষটা এই দক্ষিণ দেশে ধান-চালের আবাদে এসে নতুন করে ঘরবাড়ি তুললেন।

আমি বললাম, ছিয়াত্তুরে নয়—পঞ্চাশের মন্বন্তর। তোমার ভুল হচ্ছে।

এই তো সেদিনের কথা—ভুল হবার কী আছে! পলাশিতে সিরাজদ্দৌলার নবাবি গেল, তার কিছু পরেই তো।

পদ্ম পাগল নাকি তবে ? এতক্ষণের এত কথাবার্তায় টের পাই নি। চলার ধরনেও মনে হচ্ছে পাগল বটে! হাত ধরে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে আমায়।

আমি বলি, আস্তে, আস্তে—

পদ্ম আকাশের দিকে তাকায়। শুকতারা উঠে গেছে। আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে, গতিবেগ আরও বাড়ায়। বলে, সকাল হয়ে গেলে আর তুমি যেতে পারবে না। কোনদিন যাওয়া হবে না। এস, এস—বাঁধে উঠতে হবে ভোর হবার আগে।

পায়ে কত কাঁটা ফুটল, নখ ছিঁড়ে গেল উঁচু-নিচু মাটিতে আঘাত লেগে, শামুকে পা কাটল জলের মধ্য দিয়ে যেতে। সে যে কত পথ চললাম, তার হিসেব নেই। অবশেষে বাঁধ দেখতে পাচ্ছি—বাঁধের উপরের সেই গাছগুলো।

বাঁধের নিচে এসে পদ্ম হাত ছেড়ে দিল। বলে, দাঁড়াও একটু।

দুই পায়ে মাথা গুঁজে সে প্রণাম করল। অনেকক্ষণ ধরে করছে, ওঠে না।

সস্নেহে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলি, আবার দেখা হবে পদ্ম। আমি আসব।

গাছে চড়ার মতন দু-হাত ধরে উঁচু বাঁধে উঠছি। নোনা নদী ঝিকমিক করছে গোলঝাড়ের ওদিকে। গা শিরশির করে ওঠে– বড্ড শীত।

পদ্ম, জ্বর আসার মতন মনে হচ্ছে। কাঁপুনি লেগেছে।

কোথায় পদ্ম! তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। বাঁধের আড়ালে পালিয়ে কৌতুক করছে বুঝি!

পদ্ম, পদ্মরাণী—

মুক্ত আকাশ-তলে গাঙের কিনারে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কত ডাকলাম! পদ্ম যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

সকাল হল। দিনের আলোয় মাঠের দিকে তাকিয়ে অবাক, মাঠ কোথা, বিশাল জলাভূমি। কিন্তু আমি যে এই কেওড়াগাছতলা থেকে ডাইনে নেমেই বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম। ভুল হবে কেমন করে? ঠোক্কর খেয়ে ডান-পায়ের একটা নখ উল্টে গেছে। আর জামার পকেট ভর্তি পদ্মর দেওয়া স্বর্ণচাঁপা। জলের মধ্যে, আর যাই হোক, স্বর্ণচাঁপা ফুটবার কথা নয়।

কপাল ভাল—বিকেলবেলাই নৌকো পেয়ে গেলাম। গোলপাতা কাটতে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে। নৌকো না পেলে রাত্রিবেলা জলজঙ্গলের মধ্যে বাঘের পেটে না-ও যদি যাই–অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় কার্তিকমাসের নতুন হিমে কেওড়াতলায় নিশ্চয় মরে পড়ে থাকতাম। আরও এক তাজ্জব—কাল সবে এসেছি, একদিনের মধ্যে বোশেখ থেকে কার্তিকমাসে পৌছই কি করে!

দুকড়ি মাঝি মাতলায় থাকে। এ ক'দিন অনেকের সঙ্গে এই গল্প করেছি। নৌকো থেকে ডাঙায় পা দিয়েই দুকড়ির কাছে গেলাম। বাদাবনের সকল সুলুকসন্ধান তার নখদর্পণে। এখন শক্তিসামর্থ্য নেই, আর বাদায় যেতে পারে না, দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে বসে তামাক টানে। লোকজন কাউকে পেলে বাদাবনের গল্প শোনায়।

দুকড়ি বলে, জায়গাটা চিনলাম—শোলাদানার বাঁওড়। শোলাদানা বলে জমজমা এক গাঁ ছিল—ভূমিকম্পে বসে গিয়ে বাঁওড় হল সেখানে। পুরো গ্রামই আছে জলের তলে, দায়ে-দরকারে কখনো সখনো ভেসে ওঠে। শোলাদানায় গিয়ে তুমি যে আবার ফিরে এলে—এমন কখনো হয় না। জোর কপাল বটে তোমার!

লাল চুল

মনোজ বসু

ছ'মাস ধরিয়া বিয়ের দিন সাব্যস্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল তো গোল বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনেরো বাকি, হঠাৎ নীলমাধবের চিঠি আসিল—কাজিডাঙা অবধি যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, তাঁহারা বড়জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস ; চিঠি লইয়া সে-ই আসিয়াছিল। ভিড় সরিয়া গেলে আসল কারণটা সে শেষকালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরীদের সীমানা কাজিডাঙার ক্রোশ তিনেকের মধ্যে। বলা তো যায় না, তিন ক্রোশ দূর হইতে কয়েক শত লাঠিও যদি আচমকা বিয়ের নিমন্ত্রণে চলিয়া আসে! তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অন্ধকারে গাঙ পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগাঁয়ে জলজঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ান ছাড়া আর কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে ; জমিদারের ছেলে ওই একটি মাত্র। অতএব এই ছ'মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়িতে শুভকর্মের গুরুতর আয়োজন চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্যকার চেহারটা সহসা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে মেয়ের বাপের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন।— ওই তেইশে মেয়ের বিয়ে আমি দেবই—বারবার এইরকম গোছগাছ করে শেষকালে যে—না হয় তুমি সেই বি-এ ফেল ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করে ফেল....

কিন্তু অতবড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়া সোজা কথা নয়। শেষ পর্যন্ত আবশ্যকও হইল না। শহরের প্রান্ত সীমায় ভৈরব নদীর ধারে সেরেস্তাদারবাবুর এক নূতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়িটা তিনি কয়েকদিনের জন্যে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইট কাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরযাত্রী বসিবার জায়গা হইল। পিছনে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাৎ বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে তাহা হইলে দোতলার দরদালানে সত্তর-আশিজন করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বিকালে পাঁচখানা গরুর গাড়ি বোঝাই আরও অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া পড়িল। লগ্ন সাড়ে আটটায়।

রানী বলিল, মাসিমা, হিরণের বিয়ের বেলায় আপনি বড় অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু—

মিনুর মা হাসিলেন।

না, সে হবে না, মাসিমা। আমরা সমস্ত রাত বাসর জাগব, কোন কথা শুনব না, বলে দিচ্ছি। নয় তো বলুন, এক্ষুনি ফের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসি।

রসুই ঘরের দিকে হঠাৎ তুমুল গণ্ডগোল। বেড়ার ওপর কে জ্বলন্ত কাঠ ঠেক দিয়া রাখিয়াছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকলের বিশ্বাস, কাজটা বামুন ঠাকুরের ; তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারম্বার ব্রাহ্মণ সন্তান দিব্য করিতেছিল—বিনা অপরাধে তাহার গুরুদণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকার দোষ নাই। তিনদিনের মধ্যে সে কলিকা একেবারে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, খবর কি ? খবর কি ?

শীতল কহিল, খবর ভাল। বর, বরযাত্রী সব ওদের বাসাবাড়ি পৌঁছে গেছেন। জজবাবুর বড় মোটর এনে সাজান হচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল, একশ' বরকন্দাজ গাঙের ঘাট আগলাচ্ছে। কি জানি, কিছু বলা যায় না। আমাদের কর্তাবাবু একবিন্দু খুঁত রেখে কাজ করেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠিতেই ধুপধাপ করিয়া আটদশটা মেয়ে ছুটিল তেতলার ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিরু বলিল, যাওয়া ভাই, অনর্থক। ছাত থেকে কিচ্ছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে—

কৌতূহল চোখমুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে ; ঠাট্টাতামাশা—ছুটাছুটি—মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ ; তার মধ্যে যুক্তি বিবেচনার কথা কে শুনিবে ?

রানী সকলের আগেভাগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল, ওই, ওই—বর—দেখ—

মরবি যে এক্ষুনি পড়ে—ছাতের এখনো আলসে হয়নি দেখেছিস ? বলিয়া আর একটি মেয়ে রানীকে পিছে ঠেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটেই পড়িতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল, কই ? ও রানী, বর দেখলি কোন দিকে।

গলায় ফুলের মালা—ওই যে। দেখতে পাও না—তুমি যেন কি রকম সেজদি!

সেজদি বলিল—মালা না তোর মুণ্ডু। ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুত্থুরে মাগো, তিন কালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুরদাদা। বর এতক্ষণে কোনকালে আসনে গিয়ে বসেছে—

ছাতের উপর হইতে বরাসন নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা। নিরু বলিল, বলেছি তো অনর্থক। তার চেয়ে নিচে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে দেখিগে চল।

চল, চল—

অন্ধকারে নদী মৃদুতম গানের সুর তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলো আলো, ঢাকের বাজনা....। সহসা এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস উহাদের রঙিন শাড়ি, কেশ-বেশের সুগন্ধ উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাগুলি

উড়াইয়া ছড়াইয়া বহিয়া গেল।

ঘুমিয়ে কে রে ? মিনু ? ওমা মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই ; পালিয়ে এসে চিলেকোঠায় ঘুমোনো হচ্ছে!

রানী হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরু বলিল, আহা, সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নিচে যাই—

সেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, গিন্নীপনা রাখ দিকি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে রানী !

বিশেষ করিয়া রানীকেই জিজ্ঞাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সেজদি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাৎ জানিয়া ফেলিয়াছিল। রানী মুখ টিপিয়া হাসিল। দুই হাতে ঘুমন্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া বলিতে লাগিল, মিনু ভাই, জাগো—আজকে ঘুমোতে আছে? উঠে বর দেখবে এস। তারপর মিনুর এলো চুলে হাত পড়িতে যেন শিহরিয়া উঠিল, দেখেছ? সন্ধ্যাবেলায় আবার নেয়ে মরেছে হতভাগী। শুয়ে শুয়ে চুল শুকনো হচ্ছে। ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায় ? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কম ? নিচে উলুধ্বনি উঠিল। পিসিমা, নন্দরানী, শুভা ওদের সবার গলা।

চল—চল—

চুল বাঁধতে হবে—ওঠ মিনু, শিগগির উঠে আয়।—বলিয়া এলোচুল ধরিয়া জোরে একটান দিয়া রানী ছুটিয়া দলে মিশিল। সিঁড়িতে আবার সমবেত পদধ্বনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রানীরা নামিয়া গিয়াছে, ছাতে কেহ নাই। ঘুমচোখে ভাবিল এটা যেন তাদের কাজিডাঙার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে ; ছাতে ঝাপসা ঝাপসা আলো, ওদিকে ভয়ানক গণ্ডগোল উঠিতেছে।....সব কথা মিনুর মনে পড়িল—আজ তার বিয়ে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে.....। হঠাৎ নিচের দিকে কোথায় দপ করিয়া সুতীব্র আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাতের উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সিঁড়ি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে তুমুল হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আসর ভাঙিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল,পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিনু নিশ্চেতন।—জল, জল... মোটর আনো, ভিড় করবেন না মশাই, সরুন ফাঁক করে দিন...আহা-হা কি কর, মোটরে তোল শিগগির। গামছা কাঁধে কোন দিকে হইতে কন্যার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

জজবাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিনু হাসপাতালে চলিল। বড় রাস্তায় রশি দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর যাইতে হইল না।

রসুন-চৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজার পুবদিকে ছোট লাল চাদরের নিচে চারিটা কলগাছ পুঁতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ, তার উপর নূতন গহনা পরিয়া যেন রাজরাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কনে-চন্দন আঁকা শুভ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ জমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশে রক্ত গড়াইয়াছে— মেঘের মত খোলা চুলের রাশি এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

ভিতরে-বাহিরে নিদারুণ স্তব্ধতা—বাড়িতে যেন একটা লোক নাই। শবের মাথার উপরে একটি খরজ্যোতি গ্যাস জ্বলিতেছে। বাড়ির মধ্যে স্তব্ধতা চিরিয়া হঠাৎ একবার আর্তনাদ আসিল—ওমা, ও মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমানিক রাজরানী মা—

নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, হাত পা গুটিয়ে বসে আছ যে—

বরশয্যার প্রকাণ্ড মেহাগ্নি-পালিশ খাট কজনে টানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণ বেণুধরকে লক্ষ্য হয় নাই। এইবার ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মধ্যে কাজললতা তেমনি ধরা আছে। কাচের মত স্বচ্ছ অচঞ্চল আধ-নিমীলিত দুটি দৃষ্টি, মৃতার সেই স্তিমিত চোখ দুটির দিকে নিষ্পলক ভাবে চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুঁকিয়া পড়িয়া পাগলের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, একবার ভাল করে চা দিকি.... চোখ তুলে চা—ও খুকী....

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি থামিলেন না, সজল চোখে বারবার বলিতে লাগিলেন, ও বেয়াই, বিনি দোষে মাকে আমার কত গালমন্দ দিয়েছি—কোন সম্বন্ধ এগুতে চায় না, তার সমস্ত অপরাধ নিদরাত মা ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথাও কয়নি। ও খুকী, আর বকব না—চোখ তুলে চা' একবার—

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ক্রুদ্ধকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তোমরা ? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও।

সাড়ে আটটায় লগ্ন ছিল—বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, যেন শুভ লগ্নে তাহাদের শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জানত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।... ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর ঢালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুঁড়িয়া দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পালাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল ; সর্বাঙ্গ দিয়া ঘামের ধারা বহিতেছে ; পা টলিতেছে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মোটরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মত্তের মত সে বলিয়া উঠিল—চালাও এক্ষুনি—

গাড়ি চলিতে লাগিলে হুঁশ হইল, তখনো আগাগোড়া তাহার বরের সাজ, একবোঝা কোট কামিজ, তার উপর সৌখীন ফুলকাটা চাদর—বিয়ের উপলক্ষে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেনা। একটা একটা করিয়া খুলিয়া পাশে সমস্ত স্তূপাকার করিতে লাগিল। তবু কি অসহ্য গরম। বেণুর মনে হইল, সর্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবার বুঝি ঘামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—খুব জোরে চালাও গাড়ি—

সোফার জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ?

যেখানে খুশি। ফাঁকায়— গ্রামের দিকে—

তীব্র বেগে গাড়ি ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মত বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সুমুখ-আঁধার রাত্রি, তার উপর মেঘ করিয়া আরও আঁধার জমিয়াছে। জনবিরল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাহিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া বেণুধর শিহরিয়া উঠিল, এমন নিবিড় অন্ধকার সে জীবনে দেখে নাই। দুধারের বাড়িগুলির দরজা-জানলা বন্ধ, ছোট শহর ইতিমধ্যেই নিশুতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে আম কাঁঠালের বড় বড় বাগিচা।.... সহসা কোথায় কোন দিক দিয়া উচ্ছল হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিল, অতি মৃদু অস্পষ্ট কৌতুক-চঞ্চল অনেকগুলো কণ্ঠস্বর—বউ দেখিয়ে যাও, বউ দেখিয়ে যাও গো—

আশপাশের সারি সারি ঘুমন্ত বাড়িগুলির ছাদের উপর, আমবাগিচার এখানে সেখানে, ল্যাম্পপোস্টের আবছায়ে নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতূহল-ভরা চোখে ভিড় করিয়া বউ দেখিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। বধূ তাহার পাশে রহিয়াছে, সত্যই একটা বউ মানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা নোয়াইয়া একেবারে গদির সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, গায়ে ছোঁয়া লাগিলে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, সে তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোঝা, মানবী নয়। এই গাড়িতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল ; সে বসিয়া নাই, তার দেহের দু-এক ফোঁটা রক্ত হয়তো গাড়ির গদিতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীর ধারে ধারে গাড়ি ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিল। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে ; চারিদিকে নিঃশব্দতাকে পিষিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সুকরুণ আর্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লীকিশোরীর এইদিনকার সকল সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বাহিরে ঘন তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি—জনশূন্য মাঠ—কোনদিকে আলোর কণিকা নাই। সৃষ্টির আদি যুগের অন্ধকারলিপ্ত নীহারিকামণ্ডলীর মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আর পাশে পাশে পাল্লা দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিঃশব্দচারিণী

মৃতরূপা তার বধূ। লাল বেনারসীতে রূপের রাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙিয়া শতখান হইয়া এখানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু একটি মুহূর্তের ঘটনার পরে এখন তার স্থান হইয়াছে সীমাহীন আশ্রয়হীন বিপুল শূন্যতায়—রাত্রির অন্ধকার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরনের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকি ছিটকাইয়া যায়, গতির বেগে সামনে ঝুঁকিয়া-পড়া ঘন চুল ভরা মাথাটি—মাথার চারিপাশ দিয়া রক্তের ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলো চুল উড়ে—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল।

দুই হাতে মাথা টিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ি চলিতে লাগিল। খানিক পরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া হাটুরে চালার মধ্যে বাঁশের মাচায় অনেকক্ষণ মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে মন কিছু শান্ত হইলে বাসাবাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

নীলমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বরযাত্রীর অনেকে মেল ট্রেন ধরিতে সোজা স্টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাত্র—যাহারা খুব নিকট আত্মীয় বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা পুঁটুলি বই যা হয় একটা কিছু মাথায় দিয়া যে যার মত শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক রাত্রি। হেরিকেনের আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। আলোর সামনে ঠিক মুখোমুখি নির্বাক নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লে—মোটর নিয়ে গিয়েছ শুনে ভাবলাম, বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তাও নয়। ভারি ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজ বাবুর বাড়িতে বিজয় গিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল, বড্ড মাথা ধরল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুরে এলাম—

বলে যাওয়া উচিত ছিল—। বলিয়া নীলমাধব চুপ করিলেন।

ছেলে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, তোমার খাওয়া হয়নি। দক্ষিণের কোঠায় খাবার-ঢাকা আছে, বিছানা করা আছে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়—রাত জাগবার দরকার নেই।

ঘরে গিয়া নীলমাধবের ভয়ে ঢাকা খুলিয়া খাবার খানিকটা সে নাড়াচাড়া করিল ; মুখে তুলিতে পারিল না।

দালানের পিছনে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্টগন্ধের আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাচ্ছন্ন আধ-অন্ধকারে চারিদিক চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, ঘর ভরিয়া কে একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধরিবার জো নাই—অথচ তাহার স্নিগ্ধ লাবণ্য বন্যার মত ঘর ছাপাইয়া যাইতেছে ; কোণের দিকে দলিল-পত্র ভরা সেকেলে বড় ছাপবাক্সের আবডালে নিবিড় কালো বড় বড় চোখদুটি অভুক্ত খাবারের দিকে বেদনাহতভাবে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে তাহাকে সাধাসাধি করিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য অকস্মাৎ বেণুধরকে কঠিনভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিল।.....

বাহিরের বৈঠকখানায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, পোড়াকপালী আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল।

তারপর চুপ। অনেকক্ষণ আর কথা নাই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল, বুদ্ধি শ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্তাবাবু, সেই পাকা দেখা দেখতে গিয়ে আপনি বললেন, আমার মা নেই, একজন মাকে খুঁজতে এসেছি। আপনার কথা শুনে মেয়েটি কেমন হেসে ঘাড় নিচু করে রইল—

নীলমাধব গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, থামো শীতল!

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দুজনে চুপচাপ। আলো জ্বলিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল ; জীবনকালের মধ্যে কোনদিন যাহাকে দেখে নাই, মৃত্যুপথবর্তিনী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাড়ি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানালা গলিয়া অন্ধকার রখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ; জানালা খোলা, শেষরাতে পূর্বদিগন্তে চাঁদ উঠিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিসারী ভৈরব শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কি একটা ভারি অন্যায় হইয়া যাইতেছে....হঠাৎ বড় ঘুম আসিয়া পড়িয়াছিল....কে আসিয়া কতবার ডাকাডাকি করিয়া বেড়াইতেছে। ঘুমের আলস্য তখনও বেণুধরের সর্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে ; তাহার তন্দ্রা-বিকাশ মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক্-ঠক্-ঠক্

খিল-আঁটা কাঠের কপাটের ওপাশে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

হাতের চুড়িগুলি গোছার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোণে কান্না জমিয়াছে। একটু আবদারের কথা কহিল, একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিসফিস করিয়া বধূ বলিতেছে, দুয়ার খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনার দরকার ; কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয়া কিছুতেই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে রাজী নয়। বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছের উপরের লতা যেমন পড়িয়া যায়, ঝুপ করিয়া তেমনি দোর গোড়ায় বধূ পড়িয়া গেল। সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহার নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এলাইয়া পড়িতেছে—বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফর্সা হইয়া আসে। আম বাগানের ডালে ডালে সদ্য ঘুম ভাঙা পাখির কলবর.... ও ঘর হইতে কে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে...। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট ও প্রখর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালের দিকে সুবিধা মত একটা ট্রেন আছে। অথচ নীলমাধব নিশ্চিন্তে পরম

গম্ভীরভাবে গড়গড়া টানিতেছিলেন।

বেণু গিয়া কহিল, সাতটা বাজে—

বিনাবাক্যে নীলমাধব দু'টা টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, চা-টা তোমরা দোকান থেকে খেয়ে নাও—

বাড়ি যাওয়া হবে না?

না—। বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কি কাজে বাহিরে যাইবার উদ্যোগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বেণুধর ব্যাকুল কণ্ঠে পিছন হইতে প্রশ্ন করিল, কবে যাওয়া হবে ? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের?

মুখ ফিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে কি ছিল, তিনিই জানেন—ক্ষণকাল মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, শীতল ঘটক ফিরে না এলে সে তো বলা যাচ্ছে না।

অনতি পরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকি রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গ্রামটা নদীর আর পারে ক্রোশ খানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্তা চলিয়াছিল। খুব বনিয়াদী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে ; কিন্তু ইদানীং কৌলিন্যটুকু ছাড়া সে পক্ষের বিশেষ কিছু সম্বল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রোশ বেণু তাহারই উপর মিটাইল। কহিল, কশাই তোমরা সব!

অথচ সে একেবারেই নিরপরাধ। কিন্তু সে-তর্ক না করিয়া বিজয় সান্ত্বনা দিয়া কহিল, ভয় নেই ভাই, ও কিছু হবে না। ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, সে কি হয় কখনো ? কাকার যেমন কাণ্ড—

একটু পরেই দেখা গেল, ঘটক হাসিমুখে হনহন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। সামনে পাইয়া সুসংবাদটা তাহদিগকেই সর্বাগ্রে দিল, পাকপাকি করে এলাম ছোটবাবু—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, পাকাপাকি করে এলে কি রকম ? এই ঘণ্টা দুই তিন আগে বেরুলে—কোন খবরাখবর দেওয়া নেই। এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেল ?

শীতল সগর্বে নিজের অস্থিসার বুকের উপর একটি থাবা মারিয়া কহিল, এর নাম শীতল ঘটক, বুঝলেন বিজয়বাবু, চল্লিশ বছরের পেশা এই আমার। কিছুতেই রাজী হয় না—হেনো তেনো কত কি আপত্তি। ফুসমন্ত্রে সমস্ত জল করে দিয়ে এলাম।—বলিয়া শূন্য মুখ তুলিয়া ফুৎকার দিয়া মন্ত্রটার স্বরূপ বুঝাইয়া দিল।

বেণুধর কহিল, আমি বিয়ে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর দিকের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবার ভাবিল, বেণুধর পরিহাস করিতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিগ্ধ সুরে বলিতে লাগিল, তাই

কখনো হয় ছোটবাবু, লক্ষ্মী ঠাকুরণের মত মেয়ে—ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে দেখুন—কালকের ও মেয়ে এর দাসী বাঁদির যুগ্যি ছিল না।

বেণুধর কঠোর সুরে বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি যা বলার বলে দিয়েছি শীতল, তুমি বাবাকে আমার হয়ে বলো—

বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ক্ষণপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন, শুনলাম, বিয়েতে তুমি অনিচ্ছুক?

বেণু মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন, তাহলে আমায় আত্মহত্যা করতে বল ?

কোন প্রকারে মরিয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল, কালকের সর্বনেশে কাণ্ডে আমার মন কিরকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আর কিছু দিন সময় দিন আমায়—। বলিতে বলিতে তাহার স্বর কাঁপিতে লাগিল। একমুহূর্তে সামলাইয়া লইয়া বলিল, মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে—

ভ্রূ বাঁকাইয়া নীলমাধব ছেলের দিকে চাহিলেন। একটুখানি নরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এদিকের সর্বনাশটা ভাব একবার। বাড়িসুদ্ধ কুটুম্ব গিসগিস করছে, সতের গ্রাম নেমন্তন্ন। বউ দেখবে বলে সব হাঁ করে বসে আছে। যেমন তেমন ব্যাপার নয়,এত বড় জেদাজেদীর বিয়ে—আর চৌধূরীদের সেজকর্তা আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। চৌধুরীদের সেজকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তিলার্ধ দেরি না করিয়া জপের মালা হাতে লইয়াই খড়ম খটখট করিতে করিতে সমবেদনা জানাইতে আসিবেন—আসিয়া নিতান্ত নিরীহ মুখে উচ্চ কণ্ঠে এক হাট লোকের মধ্যে বৃদ্ধ অতি গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন, বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বল দিকি, বিয়ে এবারও ভাঙল—মেয়ে কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে ?.....

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, না বেণুধর, বউ না নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশ তো, মাঝে এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভাল হয়ে যাবে।....

বারোয়ারির মাঠে যাত্রা বসিয়াছে। বিকাল হইতে গাওনা শুরু। বেণুধর সমবয়সী জন দুই তিনকে পাকড়াইয়া বলিল, চল, যাই।

বিজয় বলিল, আমার যাওয়া হবে না তো। বিস্তর জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদা করতে হবে। রাত্রে ফিরে যাচ্ছি।

কেন ?

গ্রামে গিয়েঁ খবর দিতে হবে বউভাতের তারিখ দুটোদিন পিছিয়ে গেল। কাকা বললেন, তুমি যাও বিজয়।

গাড়ি সেই কোন-রাতে—আমরা থাকব বড়জোর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা—চল, চল—। বেণুধর ছাড়িল না। সকলকে ধরিয়া লইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে পরশু দিন ঠিক হল?

হ্যাঁ—

পরশু রাত্রে ?

তাছাড়া কি—

চুপ করিয়া খানিক কি ভাবিয়া বেণুধর করুণভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল, রাত্রি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিজয়, অপঘাতে মরা মেয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় জ্বালাতন করেছে—

আবার একটু স্তব্ধ থাকিয়া উছ্বসিত কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, মরা ব্যাপারটা আর আমি বিশ্বাস করছিনে—এত সাধ আহ্লাদ ভালবাসা পলক ফেলতে না ফেলতে উড়িয়ে পুড়িয়ে চলে যাবে—সে কি হতে পারে ? মিছে কথা। এ আমার অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি।

বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল, তুমি এসব কথা আর বলো না ভাই, আমাদেরও শুনলে ভয় করে।

ভয় করে ? তবে বলব না।—বলিয়া বেণু টিপি টিপি হাসিতে লাগিল। বলিল, কিন্তু যাই বল, এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয়নি—দূরে পালানো উচিত ছিল। এই আধক্রোশের মধ্যেই কাণ্ডটা ঘটল।

যাত্রা দেখিয়া বেণু অতিরিক্ত রকম খুশি হইল। ফিরিবার পথে কথায় কথায় এমন হাসি রহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না। তখন সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। পথের উপর অজস্র কামিনী ফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাসুদ্ধ তাহার অনেক ডাল ভাঙিয়া লইল। বলিল, খাসা গন্ধ! বিছানায় ছড়িয়ে দেব।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, ফুলশয্যার দেরি আছে হে—

কোথায় ?—বলিয়া বেণু প্রচুর হাসিতে লাগিল। বলিল, এ পক্ষের দিন রয়েছে তো কাল। আর তাহিরপুরেরটার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সম্বন্ধের ফুলশয্যার দিন করেছে কবে ?

বিজয় রীতিমত রাগিয়া উঠিল, ফের ওই কথা? এ পক্ষ—ও পক্ষ—বিয়ে তোমার কটা হয়েছে শুনি ?

আপাতত একটা ; কাল যেটা হয়ে গেল—আর একটার আশায় আছি। বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল, ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি ? ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালরাত্রি—বউয়ের দেখা করবার নিয়ম নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্লভাবে বেণুধর শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে না। আলো নিভাইয়া দিল ; কিছুতে ঘুম আসে না। পাশে কোন বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিকে নিশুতি। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের

সাধনা করিয়া কাহার উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কম্বল ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া জোরে জোরে পায়চারি করিতে লাগিল। খণ্ড চাঁদ ক্রমশ আম বাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।... আবার সে ঘরে ঢুকিল। বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, ফোঁস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কে যেন কোথায় পালাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছপালা খসখস করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে লাগিল, নতুন কোরা কাপড় পরিয়া খসখস করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী বনপথে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুখেই আংটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে বাপের বহুদর্শিতার কথা ভাবিল। নীলমাধব সত্যই বলিয়াছিলেন, এই দুটোদিন সময়ের মধ্যেই তাহার মন আশ্চর্যরকম ভাল হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক ফাঁকে বাপের ঘর হইতে পাত্রীর ছবিটা দেখিয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে। প্রতিমার মত নিখুঁত নিটোল গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়রে তেপায়ার উপর ভাবী বধূর ছবিখানি। ম্লান দীপালোকিত চুনকাম-খসা উঁচু দেয়াল, গম্বুজের মত খিলান করা সেকেলে ছাত, তাহারই মধ্যে মিলনোৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগামী হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে বই পড়িতে লাগিল... একবার কি রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর স্তম্ভিত হইয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—তাহার মধ্যে দিয়া হাত গলাইয়া চাঁপার কলির মত পাঁচটি আঙুল লীলায়িত ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভাল করিয়া তাকাইতেই বাহিরের নিকষ কালো অন্ধকারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া জানালায় আসিল। আর কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সজোরে সে জানালার খিল আঁটিয়া দিল।

আলোর জোর বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওঠা দেয়ালের ওপর কালের দেবতা কত কি নক্সা আঁকিয়া গিয়াছে। উল্টা-করা তালের গাছ....একটা মুখের আধখানা .....ঝুঁটিওয়ালা অদ্ভুত আকারের জানোয়ার আর একটা কিসের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া আছে.....ঝুল কালি ও মাকড়সা জালের বন্দীশালায় কালো কালো শিকের আড়ালে কত লোক আটক হইয়া রহিয়াছে....

চোখ বুজিয়া দেখিতে লাগিল—

অনেক দূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সারি সারি মানুষ চলিয়াছে—পিঁপড়ার মত মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া কে-একজন হাত উঁচু করিয়া কি বলিল। মুহূর্তকাল সব স্থির। আবার কি সংকেত হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপ জঙ্গল আনাচ কানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই রাত্রে আঙিনার ধুলায় কোথায় এক পরম দুঃখিনী এলাইয়া এলাইয়া

পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া দাপাদাপি করিতেছে—

ওমা—মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমানিক রাজরানী মা—

অন্ধকারের আবছায়ে ছোট ছোট ঘুলঘুলির পাশে তন্বী কিশোরীটি নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়রে নূতন বধূ চুপটি করিয়া বাসর জাগে। বর বুঝি ঘুমাইল।...

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পরম স্নেহে স্মিতমুখে শিয়রে তেপায়ার উপরের ছবিখানির দিকে তাকাইল। কাল সারা রাত্রি তাহারা জাগিয়া কাটাইবে।

রুদ্ধ জানালায় সহসা মৃদু মৃদু করাঘাত শুনিয়া বেণুধর চমকিয়া উঠিল। শুনিতে পাইল, ভয়ার্ত চাপা গলায় ডাকিয়া ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি অসহায় প্রীতিমতী বালিকা বাপ-মা ও চেনা-জানা সকল আত্মীয় পরিজন ছাড়িয়া আসিয়া ওই জানালার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর তিলার্ধ দেরি করিল না ; দুয়ার খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িয়া ঝড় বহিতে শুরু হইয়াছে। সন সন করিয়া ঝড় দালানের গায়ে পাক খাইয়া যাইতেছে।

এসো—

উঁহু—

এসো—

না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বেণুধর নির্নিরীক্ষে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য পলায়নপরার পিছনে পিছনে ছুটিল। ঝোড়ো হাওয়ায় কথা না ফুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায় ; তবু সে যুক্ত করে বারম্বার এক অভিমানিনীর উদ্দেশে কহিতে লাগিল, মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না ; আমি যাব না কাল। তুমি এসো—ফিরে এসো—

নিশীথ রাত্রি। মেঘভরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ভৈরবের বুকেও যেন প্রলয়ের জোয়ার লাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কূল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই পরম মুহূর্তে প্রলয়-তরঙ্গ লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—। পলে পলে রাত্রির বক্ষস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক—অনেকক্ষণ পরে মধ্য আকাশ হইতে একটি নক্ষত্র বিদ্যুৎগতিতে খসিয়া পড়ে, ঝনঝন করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহদ্বার খুলিয়া যায়, পৃথিবীর মানুষের শিয়রে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভালবাসে, আদর করে, স্বপ্নের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জাগ্রত দুই চক্ষু দিয়া মৃত্যুলোক-বাসিনীকে সে দেখিতে পাইয়াছে। দুটি হাত নিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে। দিগন্তব্যাপী মেঘবরণ চুলের উপর ডগমগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রায়ান্ধকারের মধ্যে আলেয়ার মত বেণুধরকে দূর হইতে দূরে ছুটাইয়া লইয়া চলিল।

হলুদপোড়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সে-বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিন দিন আগে-পরে গাঁয়ে দু'দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝবয়সী জোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল-সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে।

গাঁয়ের দক্ষিণে ঘোষেদের মজা পুকুরের ধারে একটা মরা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছে। স্থানটি ফাঁকা, বনজঙ্গলের আবরু নেই। কাছাকাছি শুধ কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিস্মিত হলো না। বলাই চক্রবর্তীর এইরকম অপমৃত্যুই আশেপাশের দশটা গাঁয়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনাও করেছিল। অন্যপক্ষে শুভ্রা মেয়েটির খুন হওয়া নিয়ে হৈ-চৈ হলো কম কিন্তু মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না। গেরস্তঘরের সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে, গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো ছিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গাঁয়ে সব শেষের সাঁঝের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জ্বালা হয়েছে, তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভ্রার মতো মেয়েকে কে·বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁসুদ্ধ লোক যেন অপ্রস্তুত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি ছিল, গাঁয়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল ?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে ? বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে গাঁয়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি, যখন হলো পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো! তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী নারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে কবে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গাঁয়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্যের খাদের অভাবে নানাজনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চল্লিশ টাকার চাকরি

ছেড়ে শহর থেকে সপরিবারে গাঁয়ে এসে ক্রমাগত কোঁচার খুঁটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, 'পঞ্চাশ টাকা রিওয়ার্ড ঘোষণা করছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে না পারি—'

চশমার কাঁচের বদলে মাঝে মাঝে কোঁচার খুঁটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গাঁয়ে বাস করার পর নবীনের স্ত্রী দামিনী সন্ধ্যাবেলা লণ্ঠন হাতে রান্নাঘর থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি মৃদু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পুব কোণের তেঁতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লণ্ঠন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে-কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম।

শুভ্রার দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাস্টারি করে। গাঁয়ে সে-ই একমাত্র ডাক্তার পাস-না-করা। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে বি.এসসি. পাস করে সাত বছর গাঁয়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচল্লিশখানা বই নিয়ে লাইব্রেরি, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে বিনামূল্যে ডাক্তারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেঁয়ো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু-বছরে চারটি ছেলেমেয়ের জন্ম হওয়ায় এখন অনেকটা ঝিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবন্ধ হয়ে থাকে, চাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু-চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু-তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয়। চার-আনা আট-আনা ফি নিয়ে এখন সে ডাক্তারি করে, ওষুধও বিক্রি করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হলো, কলসী কলসী জল ঢেলে দামিনীর মূর্ছা ভাঙা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অর্থহীন দৃষ্টিতে,আপনমনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে রেখেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গম্ভীর চিন্তিত মুখে বলল, 'শা'পুরের কৈলাস ডাক্তারকে একবার ডাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাস করা ডাক্তার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।'

বুড়ো পঙ্কজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপরিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, 'ডাক্তার ? ডাক্তার কি হবে ? তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।'

গাঁয়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সায় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, 'কুঞ্জ কত নেয় ?'

ধীরেন বলল, 'ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছ, জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তুমিও কি ব'লে কুঞ্জকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?'

নীবন আমতা-আমতা করে বলল, 'এসব খাপছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয় ভাই।'

বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড় কিন্তু এককালে দু-জনে একসঙ্গে স্কুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধহয় সেই খাতিরেই কৈলাশ ডাক্তার ও কুঞ্জ মাঝি দু-জনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কুঞ্জই আগে এল। লোক পৌছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চক্রবর্তীদের বৌকে অন্ধকারের অশরীরী শক্তি আয়ত্ত করেছে। কুঞ্জ নামকরা গুণী। তার গুনপনা দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

'ভরসাঁঝে ভর করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।'

ওই ব'লে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কুঞ্জ বলল, 'তবে ছাড়তেই হবে শেষতক্। কুঞ্জ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।'

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হলো। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কুঞ্জ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলোচুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে গিয়ে চুলে টান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কুঞ্জ টিটকারি দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, 'রও, বাছাধন রও! এখনি হয়েছে কি! মজাটি টের পাওয়াচ্ছি তোমায়!'

ধীরেন প্রথম দিকে চুপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গাঁয়ের লোক কথা শোনে না, বিরক্ত হয়। এবার সে আর ধৈর্য ধরতে পারল না।

'তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?'

'তুমি চুপ করো, ভাই।'

উঠানে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লণ্ঠন জড়ো হয়েছে। মেয়েদের সংখ্যা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি। কমবয়সী মেয়েরা আসতে সাহস পায় নি, অনুমতিও পায়নি। যদি ছোঁয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুগ্ধের মতো এতগুলি মেয়েপুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন স্টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের রূপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কুঞ্জ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে অদেহী ভয়ংকরের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব। ভয় সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতূহল-ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দুলে দুলে কুঞ্জ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মালসাতে আগুন করে তাতে সে একটি-দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গন্ধে চারিদিক ভরে যায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, একসময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা-বোজা চোখে কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কুঞ্জ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর ঢুলুঢুলু চোখ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

'কে তুই ? বল, তুই কে ?'

'আমি শুভ্রা গো, শুভ্রা। আমায় মেরো না।

'চাটুয্যেবাড়ির শুভ্রা ? যে খুন হয়েছে ?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমায় মেরো না।'

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কুঞ্জ বলল, 'ব্যাপার বুঝলেন কর্তা ?'

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোষালের নির্দেশ এল, 'কে খুন করেছিল, শুধোও না কুঞ্জ ? ওহে কুঞ্জ, শুনছো ? কে শুভ্রাকে খুন করেছিল শুধিয়ে নাও চট্ করে!'

কুঞ্জকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, দামিনী নিজে থেকেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, 'বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।'

নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হলো কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোনো জবাব বার হলো না যে সে শুভ্রা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদপোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কুঞ্জ অন্য একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করছিল কিন্ত কৈলাস ডাক্তার এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাণ্ড শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুরু আর মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। এসে দাঁড়িয়েই ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল, কুঞ্জর আগুনের মালসা তার দিকেই লাথি মেরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোচ্ছি! ওষুধ দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস!'

কৈলাস খুটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলাই-এর দাদামশায়ের আমলের প্রকাণ্ড খাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাঁট করে তার বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে গায়ে ঢুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, 'আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি শুভ্রা। চাটুয্যেবাড়ির শুভ্রা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুভ্রা বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুনে সেটা কেটে গেল। শুভ্রার তিন দিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে ? আর কিছু মারে না ? শ্মশানে-মশানে দিনক্ষণ প্রভৃতির যোগাযোগ ঘটলে পথভোলা পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুঞ্জ গুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শুনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্থন করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটাকে সে ঘুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সম্ভব হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুভ্রাকে খুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধশান্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর ক'রে তার মধ্যস্থতায় শুভ্রাকে খুন করেছে, তার রক্তমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে ?

এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই কথাগুলি ধীরেনের কানে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপুষ্ট গাছে আর আগাছার জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ়-সবুজ অসংখ্য রসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ডুবে ছিল, এখন জল কমে অর্ধেকের বেশি ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুভ্রার জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ভ নিয়ে ঘাটে উঠতে-নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না খায়। পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গাঁয়ের গুজব শুনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উদ্ভট কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হবার অবসরও সে পেল না। ডোবার কোনদিক থেকে কিভাবে কে সেদিন সন্ধ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরানো ভাবনা সে ভাবছিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনস্ক করে দেয়। ক্ষোভ ও বিষাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোনো বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাতের থালা সামনে ধরে দিয়ে শান্তি বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয় তাই হবে। নইলে—'

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধমক দিয়ে বলল, 'চুপ! যা খুশি মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খপর্দার!'

স্কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হলো, মুখে তারা কিছু বলল না কিন্ত তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল ঃ কথাটা তুমি কি ভাবে নিয়েছ শুনি ? পুরুতঠাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোষ

মোচনের জন্য দরকারী ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে স্কুল থেকে ফিরবার সময় তাঁর বাড়ি থেকে সে যেন তার নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে যায়। স্কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত, স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তার সাত বছরের অভ্যস্ত অস্তিত্বকে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘণ্টাতেই ক্লাস ছিল। অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজগাজ ফিসফিস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যঙের মতো মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘণ্টা কাবার হতেই হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন।

'তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।'

'এক মাসের ছুটি?'

'মথুরবাবু এইমাত্র বলে গেলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পড়িয়ে কাজ নেই।'

মথুরবাবু স্কুলের সেক্রেটারি। মাইল খানেক পথ হাঁটলেই তাঁর বাড়ি পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কদিন থেকে হঠাৎ চেতনায় ঝাঁকি লেগে মাথাটা তার এইরকম ঘুরে উঠছে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই ঝাঁকি লাগে। অথবা এমনি ঝাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। একমাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাতে-পায়ে না ধরাই ভালো। মথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন-খুন হয়েছে বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাল্পনিক কেলেঙ্কারি নিয়ে চারিদিকে হৈ-চৈ হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তাহলে মুশকিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন স্কুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঠের পথ ধরে বাড়ি চলেছে। বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতে হবে। দুর্বল শরীর বিছানায় লুটিয়ে দিয়ে ভারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে ছটফট করে কাটিয়ে শেষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শান্তি ঘাট থেকে উঠে আসছিল, ডোবার ধারে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়টার ছায়ায় মানুষের মতো কি যেন একটা নড়াচড়া

করছে।

ধীরেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কে ওখানে ? কে ?'

শান্তির হাতের বাসন ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। উঠিপড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে ? কোনখানে ?'

বাঁশঝাড় থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি, মাস্টারবাবু! বাঁশ কাটছি।'

'কে তোকে বাঁশ কাটতে বলেছে ?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেন্তিপিসি বলল, নূতন একটা বাঁশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সন্ধের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাঁশটা ডিঙিয়ে যেও না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাঁধাবাড়া আর ঘরকন্নার সব কাজ শেষ করে রাখে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাঠ পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশপাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসি ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেত্নী। ব্যাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যেও কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আঁতকে ওঠে। কাল প্রথম রাতে একটা প্যাঁচার ডাক শুনে ধীরেনকে আঁকড়ে ধরে গোঙাতে গোঙাতে বমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পুব প্রান্তে বসে তামাক টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দু-ধারের বাঁশঝাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছারি-ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা পুকুরের তীরে মরা গজারি গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অন্ধকার হবার আগেই কুয়াশায় প্রথমে গাছটা, তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে ?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাঁশটা পেতে দাও।'

'বাঁশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিটের সঙ্গে দুটি প্রান্ত ঠেকিয়ে নিজেই বাঁশটা পেতে দিল। কাঁচা বাঁশের দু-প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশরীরী কোনোকিছু এ বাঁশ ডিঙোতে পারবে না। ঘাট থেকে শুভ্রা যদি বাড়ির উঠানে

আসতে চায়, এই বাঁশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো জ্বালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হলো। সন্ধ্যাদীপ না জ্বেলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি দীপ জ্বেলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাঁখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে খেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেখে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না করে না, এঁটোকাঁটা নাকি অশরীরী আত্মাকে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাঙ্গামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না ?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাসটুকু মুছে যায়নি। দু-তিনটি তারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক মিনিট কি দু-মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশস্ত সময় সন্ধ্যা। ভরসন্ধ্যাবেলা শুভ্রা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও শুভ্রা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরি না করে এখুনি শুভ্রাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাঁশ ডিঙিয়ে ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অদ্ভুত বিকৃত গলার ডাক শুনে শান্তি লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাঁশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিংস্র চাপা গর্জনের মতো গম্ভীর আওয়াজে ধীরেন তার নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখা। ঠোঁট থেকে চিবুক বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

'বাঁশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙিয়ে এসো! বাঁশ ডিঙিয়ে চলে এসো! কি হয়েছে ? পড়ে গেছ নাকি ?

'ডিঙোতে পারছি না। বাঁশ সরিয়ে দাও।'

বাঁশ ডিঙোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাঁশ! শান্তির আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ-চেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্তনাদের পর আর্তনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, গাঁয়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন-চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে স্নান করিয়ে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল। মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিঝুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই ? বল তুই কে ?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।'

অবর্তমান

বনফুল

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যাঁরা কখনও এ কার্য করেন নি তাঁরা বুঝতে পারবেন না হয়তো যে, ব্যাপারটা ঠিক কি জাতীয়। ধু-ধু করছে বিরাট বালির চর, মাঝে মাঝে ঝাউগাছের ঝোপ, এক ধার দিয়ে শীতের শীর্ণ গঙ্গা বইছে। চারদিকে জনমানবের চিহ্ন নেই। হু-হু ক'রে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহলগাঁয়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চ'লে এসেছি, তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল, সারাজীবন ধরে যেন হাঁটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগন্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি-আধটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার— ভ্রমণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শুনলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখি পাওয়া যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে পড়লাম। লোভ শুনে মনে করবেন না যে, আমি মাংস খাবার লোভেই পাখি মারতে বেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষাশী। আলুভাতে ভাত পেলেই আমি সন্তুষ্ট।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চলে এসে প্রথম যখন পৌঁছলাম, তখন হতাশ হয়ে পড়তে হ'ল আমাকে। কোথায় পাখি! ধু-ধু করছে বালির চড়া, আর কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু-একটা উড়ন্ত মাছরাঙা ছাড়া পাখি কোথায়! বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয়, চখার শব্দটা ঠিক সে রকম নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শুনেই বুঝলুম চখা আছে, কোথাও কাছে-পিঠে। একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে! কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুঝলাম, দম্পতির একটিকে কোন শিকারী আগেই শেষ ক'রে গেছেন! এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোচাতে হবে। সাবধানে এগুতে লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আবার সাবধানে এগুতে লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব, আর অমনি— কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরক্ত হ'লে চলবে না, চখা শিকার করতে হ'লে ধৈর্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। আমিও বসলাম। উপর্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়—একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার ধীরে ধীরে এগুতে লাগলাম, কিন্তু উল্টো দিকে। পাখিটা মনে করুক যে, আমি তার আশা ছেড়ে দিয়েই চ'লে যাচ্ছি যেন। কিছূদূর গিয়ে ও-ধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছুদূর ঘুরতে হ'ল— প্রায় মাইলখানেক। গুঁড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ্ ক'রে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব, আর অমনি–কাঁআঁ।

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধ'রে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি, কিন্তু এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় বসল যে, সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোক চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখিটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম, একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়লো না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় ব'সে রইল। মনে হ'ল, অসম্ভব বুঝি সম্ভব হয় ; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল যার কাছে-পিঠে কোন আড়াল-আবডাল। নেই—চতুর্দিকেই ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হ'ল। এবার গিয়ে বেশ ভাল জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছিও আসতে পারলাম—এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল– ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লাগল না। ঝোপে—ঝোপে যা দু-একটা ছোট পাখি ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙাগুলোও চেঁচাতে শুরু করে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা থিতুতে আধ ঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাঁকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

আমি বসেছিলুম একটা বালির টিপির উপর, মুশকিল হ'ল—উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। শুয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না বালির স্তর দিয়ে কোন রকম স্পন্দনই গিয়ে পৌঁছল তার কাছে, তা বলতে পারি না। উঠে দাঁড়ালাম। রোক আরও চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য অস্ত যাচ্ছে। নদীর জল রক্ত-রাঙা। পাখিটা ও-পারের

চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিই নি—ও-ও আমাকে দেয় নি। এখন দুজনে দু'পারে। চুপ ক'রে রইলাম।

সূর্য ডুবে গেল। অস্তমান সূর্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত জ্বলন্ত লাল দেখাচ্ছিল, সূর্য ডুবে যাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল চতুর্দিক। সমস্ত অন্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ন বৈরাগ্য জেগে উঠতে লাগল ধীরে ধীরে। পূরবী রাগিণী যেন মূর্ত হয়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরঙ্গে। হঠাৎ মনে পড়ল—বাড়ি ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানি না।

ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্যগগনে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়িনি। প্রথম প্রথম একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ মন সত্তা অধিকার ক'রে বসল। আমি মুগ্ধ হয়ে ব'সে রইলাম। মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে হ'ল, কত জায়গায় কতভাবে ঘুরেছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়ে নি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়ে নি। নিজেকে কেমন যেন বঞ্চিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হ'ল, আজীবন সব দিক দিয়েই আমি বঞ্চিত। জীবনের কোনও সাধটাই কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি শখ ছিল—ভ্রমণ, সঙ্গীত, শিকার। ভ্রমণ করেছি বটে—ট্রেনে স্টীমারে চেপে এখানে ওখানে গেছি কিন্তু তাকে কি ভ্রমণ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্তপ্রসারিত অনিশ্চয়তায়, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে, হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তুষার-পর্বতশৃঙ্গে যদি না ভ্রমণ করতে পারলাম, তা হ'লে আর কি হ'ল! সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে.; কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা ক'রেও বাগেশ্রীর করুণগম্ভীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে।

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়ছিল ; কিন্তু সেই সুরটি ফুটল না, যাতে আত্মসম্মানী গম্ভীর ব্যক্তির নির্জন-রোদনের অবাঙ্‌ময় বেদন মূর্ত হয়। শিকারই বা কি এমন করেছি জীবনে? সিংহ হাতি বাঘ গণ্ডার কিছুই মারি নি। মেরেছি পাখি আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হ'ল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপরে চখাটা চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা সাধারণত রাত্রে তো ওড়ে না—হয়তো ভয় পেয়েছে কোনরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

আরও খানিকটা নেবে এল।

হঠাৎ বন্দুকটা তুলে ফায়ার ক'রে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখিটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম—দেখলাম, ভেসে যাচ্ছে।

যাক। জীবনে যা বরাবর হয়েছে, এবারও তাই হ'ল। পেয়েও পেলাম না। সত্যি, জীবনে কখনই কিছু পাই নি, নাগালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ ক'রে ব'সে ছিলাম।

চতুর্দিকে ধু-ধু করছে বালি, গঙ্গার কুলুধ্বনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শ্রান্তি কোন কিছুর কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সাগরে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছিলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দীর্ঘকায় ঋজুদেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখন বা নদীতে নাবলেন, কিছুই দেখতে পাই নি।

একটু ইতস্ততের পর জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে?

লোকটি এতক্ষণ আমাকে লক্ষ্যই করেন নি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল—তারপর বললেন, আমি এখানেই থাকি। আপনিই আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।

পরিচয় দিলাম।

ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি? আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।

দীর্ঘকায় ঋজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূর গিয়েই দেখি, একটি ছোট্ট কুটির। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়ে নি আমার। ছোট্ট কুটিরটি যেন ছবির মতন, সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ, চতুর্দিকে রজনীগন্ধার গাছ, অজস্র ফুল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুষ্পায়িত হয়ে উঠেছে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধার ঊর্ধ্বমুখ বিকাশে। মৃদু সৌরভে চতুর্দিক আচ্ছন্ন। আমিও আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভিতরে ঢুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্জি-গোছের কি একটা পাততে লাগলেন।

বসুন।

ব'সে দেখলাম শতরঞ্জি নয়—গালিচা। খুব দামী নরম গালিচা। তিনিও এক প্রান্তে এসে বসলেন। বলা বাহুল্য, আমার কৌতূহল ক্রমশই বাড়ছিল। তবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম, তিনিও চুপ ক'রে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা

বলতে হ'ল।

সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরেছি, কিন্তু আপনার দেখা পাই নি কেন ভেবে আশ্চর্য লাগছে।

সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায় ?

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হ'ল, চোখ দুটো জ্বলছে—মানুষের নয়, যেন বাঘের চোখ।

একটা গল্প শুনুন তা হ'লে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম শুনেছেন ?

না।

শোনবার কথাও নয়। দুজন রামপ্রতাপ ছিল, দুজনেই জমিদার, একজন সুদ-খোর আর একজন সুর-খোর।

সুর-খোর ?

হ্যাঁ, ও-রকম সুর-পাগল লোক ও-অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদদের আড্ডা ছিল তাঁর বাড়িতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গান-বাজনা শিখেছিলুম। বাংলা দেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন গুণী জমিদার আছেন, যিনি সুরের প্রকৃত সমঝদার। প্রকৃত গুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয় নি তাঁর কাছে, গাড়িতে একজনের মুখে কথায় কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিজ্ঞেস করি, তা হ'লে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু তা না ক'রে আমি সপ্তাহখানেক পরে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন ? তিনি ব'লে দিলেন সুদখোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি স্টেশনে নেবে দশ ক্রোশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশে। ডানকুনি স্টেশনে যখন নাবলাম, তখন বেশ রাত হয়েছে। সেদিনও পূর্ণিমা। স্টেশনে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। সুদখোর রামপ্রতাপ ও-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিজ্ঞেস করলুম, সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে, সোজা চ'লে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলেছিলাম তা ঠিক বলতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি, চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ, কোথাও কিচ্ছু নেই। মনে হ'ল যেন শেষও নেই।

কিছুদূরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড রাজবাড়িটা দেখা গেল, যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত হ'ল—সাদা ধবধব করছে, মনে হ'ল যেন মর্মর পাথর দিয়ে তৈরী। মিনার, মিনারের গম্বুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের দু'পাশে দেখি দু'জন বিরাটকায় দারোয়ান ব'সে আছে, দুজনেই নিবিষ্টচিত্তে গোঁফ পাকাচ্ছে ব'সে। ভিতরে ঢুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোন উত্তরই দিল না, গোঁফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্তত করে শেষে ঢুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলো না।

ভিতরে ঢুকে দেখি বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ি জমজম করছে ; প্রকাণ্ড কাছারি-বাড়িতে ব'সে আছে সারি সারি গোমস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা গুনছে, কেউ কেউ কানে কলম গুঁজে খাতার দিকে চেয়ে আছে, সবারই গম্ভীর মুখ। সামনে চত্বরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি। সবাই কিন্তু চুপচাপ, কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে ক'রে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হ'ল না কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে, আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছা রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম, কিছুদূরে ছোট্ট একটা বাগান রয়েছে, বাগানের মধ্যে ধবধবে সাদা মার্বেল পাথরের উঁচু চৌতারা, আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধবধবে সাদা তাকিয়া ঠেস দিয়ে প্রকাণ্ড একটা গড়গড়ায় তামাকে খাচ্ছেন। গড়গড়ার কুণ্ডলী—পাকানো নলের জরিগুলো জ্যোৎস্নায় চকমক করছে। বাগানে ছোট্ট একটি গেট, গেটের দু'ধারে উর্দী-চাপরাস-পরা দু'জন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কেমন ক'রে জানি না, আমার দৃঢ় ধারণা হল, ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দু'জন নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিলে না। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে ঝুঁকে প্রণাম করলাম একবার।

তিনি গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আস্তে আস্তে বললাম, হুজুরকে গান শোনাব ব'লে এসেছি, যদি হুকুম করেন—

তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারী কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধরে যে সে আলাপ চলেছে, তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হুঁশ হল তখন দেখি, একছড়া মুক্তোর মালা তিনি আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। মালাটা দেখবেন ? কুটিরের ভিতর ঢুকে গেলেন তিনি, পরমুহূর্তেই তিনি বেরিয়ে এলেন একছড়া মুক্তোর মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তো আমি আর দেখি নি কখনও।

তারপর ?

আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি, রাজবাড়ির কাছারি-চৌতারা লোকজন—কোথাও কিছু নেই, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুয়ে ঘুমুচ্ছি!

একা! কি রকম ?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গুণী রাজা রামপ্রতাপ অনেকদিন হ'ল মারা গেছেন। বেঁচে আছে সেই সুদখোর ব্যাটা। তার বাড়ির পথ সবাই আমাকে ব'লে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের

একান্ত ইচ্ছে ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখানে আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বকশিশ দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই।

হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গান শুনবেন ?

যদি আপনার অসুবিধে না হয়—

অসুবিধে আবার কি ? সুরের সাধনা করবার জন্যেই আমি এই নির্জনবাস করছি—

আবার উঠে গেলেন। কুটিরের ভিতর থেকে বিরাট এক তানপুরা বার ক'রে বললেন, বাগেশ্রী আলাপ করি শুনুন।

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্রী। ওরকম বাগেশ্রীর আলাপ আমি কখনও শুনি নি। যা নিজে আমি কখনও আয়ত্ত করতে পারি নি কিন্তু আয়ত্ত করতে চেয়েছিলাম তাই যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাও জানি না। ঘুম ভাঙল যখন তখন দেখি, আমি সেই ধু-ধু বালির চড়ায় একা শুয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চখাটা চ'রে বেড়াচ্ছে, মরে নি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গল্পটা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলাম। শিকার উপলক্ষ্যেই আমরা এ অঞ্চলে আসিয়া সন্ধ্যাবেলা এই ডাকবাংলায় আশ্রয় লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া তিনি নিজের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার গল্পটি আমাদের বলিলেন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই বটে! জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর ?

তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবার শুতে যান, আপনাদের তো আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাচ্ছে—

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতূহল হইল, কোন্ অঞ্চলের গঙ্গার চরে এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলে আমরাও একবার জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরে কেহ নাই। চতুর্দিক দেখিলাম, কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাসীকে জাগাইয়া প্রশ্ন করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি কোথাকার লোক ? চাপরাসী উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোন লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায় কেহ বড় একটা আসিতে চায় না।—বলিয়া সে অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল।

দেহান্তর

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরদা বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না তাদের জোর করে বিশ্বাস করাতে যাওয়া উচিত নয়, আমি কখনো সে চেষ্টা করি না। কেবল একবার—'

নিদাঘকাল সমুপস্থিত। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, এই সময় সূর্য প্রচণ্ড হয় এবং চন্দ্র হয় স্পৃহনীয়। সূর্যের প্রচণ্ডতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয় না ; পরন্তু চন্দ্রের স্পৃহনীয়তা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আমরা ক্লাবের কয়েকজন সভ্য সন্ধ্যার পর ক্লাবের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে শতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়াছিলাম। পূর্বাকাশে বেশ একটি নধর চাঁদ গাছপালা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে; তাহার আলোয় পরস্পর মুখ দেখিতে কষ্ট হয় না। অধিকাংশ সভ্যই ঊর্ধ্বদেহিক আবরণ মোচন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ক্লাবের ভৃত্যকে ভাঙের সরবৎ তৈয়ার করিবার ফরমাশ দেওয়া হইয়াছিল। চন্দ্র যতই স্পৃহনীয় হোক, সেই সঙ্গে বরফ-শীতল সরবৎ পেটে পড়িলে শরীর আরও সহজে স্নিগ্ধ হয়। আমরা সতৃষ্ণভাবে সরবতের প্রতীক্ষা করিতে-ছিলাম।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে বরদা যখন বলিল, 'যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না—' ইত্যাদি, তখন আমরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। ছুঁচের মত সূক্ষ্মাগ্র এই প্রস্তাবনাটি যে অচিরাৎ ফাল হইয়া গল্পের আকারে দেখা দিবে, তাহাতে কারও সন্দেহ রহিল না। ভূতের গল্প শোনার পক্ষে গ্রীষ্মের চাঁদিনী রাত্রি অনুকূল নয়, এজন্য শীতের সন্ধ্যা কিংবা বর্ষার রাত্রি প্রশস্ত। কিন্তু বরদা যখন ভণিতা করিয়াছেন, তখন আর নিস্তার নাই।

ভাগ্যক্রমে এই সময় সরবৎ আসিয়া পড়িল। আমরা প্রত্যেকে হৃষ্টচিত্তে একটি করিয়া ঠাণ্ডা গেলাস তুলিয়া লইলাম। পৃথ্বী গেলাসের কানায় একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া বলিল, 'আঃ! দুনিয়াটা যদি মন্ত্রবলে এই সরবতের মত ঠাণ্ডা হয়ে যেত—'

বরদা বলিল, 'দুনিয়া বলতে তুমি কি বোঝ ? এই ভারতবর্ষেই এমন জায়গা আছে, যেখানে এখন বরফ পড়ছে। গত বছর এই সময় আমি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, দেখলুম দিব্যি শীত—'

প্রশ্ন করিলাম, 'পাহাড়ে ? কোন পাহাড়ে ?'

বরদা বলিল, 'মনে কর মসুরী কিংবা নৈনিতাল। নাম বলব না, তবে সৌখিন হাওয়া বদলানোর জায়গা নয়। আমার বড় কুটুম্ব সেখানে বদলি হয়েছেন, তাঁর

নিমন্ত্রণে মাসখানেক গিয়ে ছিলুম। সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল—'

অমূল্য সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'ঘটনা না হয় ঘটেছিল, কিন্তু পাহাড়ের নাম বলতে লজ্জা কিসের ?'

বরদা বলিল, 'লজ্জা নেই। যে গল্প তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি তার পাত্রপাত্রী সবাই জীবিত, তাই একটু ঢাকাঢুকি দিয়ে বলতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন উৎকট ব্যাপার ঘটে যায়—যা হোক, গল্পটা বলি শোন।'—

হিল্ স্টেশনে যাঁরা বাস করেন তাঁদের চালচলন একটু বিলিতি ঘেঁষা হয়ে পড়ে। পুরুষেরা সচরাচর কোট-প্যান্ট পরেন। মেয়েরা অবশ্য শাড়ি ছাড়েননি, কিন্তু হাবভাব ঠিক দিশী বলা চলে না। টেবিলে বসে স্ত্রী-পুরুষের এক সঙ্গে খাওয়া, ডিনারের পর দু'এক পেগ হুইস্কি বা পোর্ট—এসব সামাজিক ব্যবহারের অঙ্গ হয়ে গেছে। দোষ দেওয়া যায় না—শীতের রাজ্যে শীতের নিয়ম মেনে চলাই ভাল।

শ্যালকের চিঠি পেয়ে আমি তো গিয়ে পৌঁছলুম। দু'চার দিন থাকতে না থাকতেই গায়ে বেশ গত্তি লাগল। আমার শ্যালকটি দারুণ মাংসাশী, বাড়িতে রোজ মুর্গি মাটনের শ্রাদ্ধ চলেছে। তার ওপর পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্ষিদে পায়। জায়গাটা সত্যিই চমৎকার ; যেমন জল-হাওয়া, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

কয়েকটি নতুন বন্ধু জুটে গেল। এখানে দশ-বারো ঘর বাঙালী আছেন, সকলেই ভারি মিশুক, নতুন লোক পেলে খুব খুশি হন। একটি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম প্রমথ রায়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি নরম স্বভাব। ভাল সরকারী চাকরি করে ; মনটা অতি আধুনিক হলেও উগ্র নয়। প্রায় রোজই বিকেলবেলা টেনিস খেলে ফেরবার পথে আমাদের বাসায় টুঁ মারত। ছোকরা অবিবাহিত ; একলা থাকে। তাই আমাদের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করে দু' এক পেয়ালা চা কিংবা ককটেল সেবন করে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরত।

একদিন কথায় কথায় আমার শ্যালক প্রেতযোনির কথা তুললেন ; বললেন, 'ওহে প্রমথ, তোমরা তো ভূতপ্রেত কিছুই মানো না। আমাদের বরদা একজন পাকা ভূতজ্ঞানী ব্যক্তি। ভূতের প্রমাণ যদি চাও, ওর কাছে পাবে।'

প্রমথ হেসে উঠল ; বলল, 'আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এইসব বিশ্বাস করেন ?'

কথাটা সে হালকাভাবে বললেও গায়ে লাগল, বললুম, 'শিক্ষিত লোকেরা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করেন যা বিশ্বাস করতে অশিক্ষিত লোক লজ্জা পাবে।'

'যথা ?'

'যথা—ফ্রয়েডিয়ান সাইকো আনালিসিস কিংবা প্যাব্লভের বিহেভিয়া-

রিজম।'

প্রমথ হাসতে লাগল। সে বুদ্ধিমান ছেলে তাই এঁড়ে তর্ক করল না। ভূতের কথা ওইখানেই চাপা পড়ল।

আমার পাহাড়ে আসার পর দু'হপ্তা কেটে গেল। দিব্যি আরামে আছি ; ওজন বেড়ে যাচ্ছে। মনে চিন্তা নেই, গায়ে ঘাম নেই, বিছানায় ছারপোকা নেই ; খাওয়া ঘুমোনো আর ঘুরে বেড়ানো এই তিন কাজে দিবারাত্র কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারি না। জীবনে এরকম সুসময় ক্বচিৎ এসে পড়ে ; কিন্তু বেশি দিন থাকে না।

প্রমথ একদিন আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ করল। আমি আর শ্যালক যথাসময়ে তার বাসায় উপস্থিত হলুম। আর কেউ নিমন্ত্রিত হয়নি জানতুম ; কিন্তু গিয়ে দেখি একটি তরুণী রয়েছেন। এঁকে আগে কখনো দেখিনি। সুন্দরী তন্বী দীর্ঘাঙ্গী, মুখে একটু বিষাদের ছায়া। সাজসজ্জায় প্রসাধনে বর্ণবাহুল্য নেই, কিন্তু যত্ন আছে। চেহারা দেখে বয়স কুড়ি একুশ মনে হয়, হয়তো দু'এক বছর বেশি হতে পারে।

শ্যালক খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে সম্ভাষণ করলেন, 'এই যে, মিসেস দাস, কি সৌভাগ্য! আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, উনি ধরে নিয়ে এলেন।'

প্রমথ তখন মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। ইশারায় বুঝলুম, মিসেস দাস বিধবা। শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে 'হর-জটা' নামে একটি উঁচ গিরিশিখর আছে ; খুব ছোট জায়গা, মাত্র দশ-বারোটি বাংলো আছে। সেইখানে মিসেস দাস থাকেন। হর-জটা থেকে শহরের পথ সুগম নয়, মাঝে একটা উপত্যকা পড়ে ; তাই সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা মাঝে মাঝে শহরে এসে আবশ্যক মত কেনাকাটা করে নিয়ে যান।

চা-কেক সহযোগে গল্প চলতে লাগল। লক্ষ্য করলুম মিসেস দাস একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে আধুনিকা অন্যদিকে তেমনি শান্ত আর সংযত। তাঁর সুন্দর চেহারার একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, অথচ তাঁর সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা করাও চলে না। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে সকলের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রগল্‌ভতা করবার সাহস কারুর নেই। তাঁর সুকুমারত্বই যেন বর্ম।

প্রমথকেও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম। এতদিন বুঝতে পারিনি যে, তার জীবনে প্রেমঘটিত কোন জটিলতা আছে ; এখন দেখলুম বেচারা একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কম্পাসের কাঁটা অন্য সময়ে ঠিক থাকে ; কিন্তু চুম্বকের কাছে এলে একেবারে অধীর অসংবৃত হয়ে পড়ে ; প্রমথর অবস্থাও সেই রকম। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে দিচ্ছে যে, ওই মেয়েটিকে সে ভালবাসে ; লোক-লজ্জার খাতিরেও মনের অবস্থা লুকোবার ক্ষমতা তার নেই।

অথচ মিসেস দাস বিধবা, হোন প্রগতিশীলা আধুনিকা—তবু হিন্দু বিধবা।

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় এই যে বিচিত্র

রোমান্স অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, এর পরিণতি কোথায় ?

চায়ের পর্ব শেষ হতেই মিসেস দাস উঠে পড়লেন, দিনের আলো থাকতে থাকতে তাকে হর-জটায় ফিরতে হবে। তিনি আমাদের তিনজনকে দৃষ্টির আমন্ত্রণে টেনে নিয়ে বললেন, 'একদিন হর-জটায় আসুন না। একটু নিরিবিলি এই যা, নইলে খুব সুন্দর জায়গা। এমন সূর্যোদয় পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। আসবেন।'

আমরা গলার মধ্যে ধন্যবাদসূচক আওয়াজ করলুম। তিনি চলে গেলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে আমরাও উঠলুম। অতিথি-সৎকারের যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রমথ ক্রমাগত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে দেখে তাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না।

বাড়ি ফেরার পথে শ্যালককে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি হে, ব্যাপার কি ? ভেতরে কিছু কথা আছে নাকি ?'

শ্যালক আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, 'তুমিও লক্ষ্য করেছ দেখছি। আমি গুজব শুনেছিলুম, আজ চোখে দেখলুম। প্রমথ সবিত্রীকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছে।'

'ওঁর নাম বুঝি সাবিত্রী ? তা উনি কি বলেন ?'

'যতদূর শুনেছি, সাবিত্রীর মত নেই।'

'মত নেই কেন ? হিন্দু সংস্কার ? না অন্যকিছু ?'

'তা ভাই ঠিক বলতে পারি না। কতকটা সংস্কার হতে পারে, আবার কতকটা মৃত স্বামীর প্রতি ভালবাসাও হতে পারে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'স্বামী কতদিন মারা গেছেন ?'

শ্যালক বলল, 'তা প্রায় বছর দুই হতে চলল। ভদ্রলোক রেলের বড় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন ; হঠাৎ রেলে কাটা পড়লেন।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল ?'

'সামান্য। খুব রাশভারী জবরদস্ত লোক, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর হয়েছিল। মাত্র বছর খানেক সাবিত্রীকে বিয়ে করেছিলেন।'

'মিসেস দাস হর-জটায় থাকেন কেন ?'

'বাড়িটা দাসের ছিল, সাবিত্রী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাছাড়া দাস 'অন ডিউটি' মারা গিয়েছিলেন তাই রেলওয়ে থেকে তাঁর বিধবা একটা মাসহারা পায়। তাইতেই চলে।'

'সাবিত্রী কেমন মেয়ে তোমার মনে হয় ?'

'খুব ভাল ; অমন মেয়ে দেখা যায় না। এই বয়সে একলা থাকে, কিন্তু কেউ কখনো ওর নামে একটা কথা বলতে পারেনি।'

'বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি ?'

'এরকম ক্ষেত্রে হওয়াই ভাল। সারা জীবন অতীতের পানে চেয়ে কাটিয়ে

দেওয়ার কোন মানে হয় না। ছেলেপুলে থাকলেও বা কথা ছিল, কিন্তু সাবিত্রী বোধ হয় বিয়ে করবে না।'

এই ঘটনার পর আরও দিন দশেক কেটে গেল। প্রমথ আর আসেনি। আমরা তার মনের কথা আঁচ করেছি বলেই বোধ হয় সে আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

আমারও স্বর্গ হতে বিদায় নেবার সময় হল। আমি পাততাড়ি গুটোচ্ছি এমন সময় একদিন প্রমথ এল। একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। দু'চার কথার পর বলল, 'মিসেস দাস চিঠি লিখে আমাদের তিনজনকে হর-জটায় নেমন্তন্ন করেছেন, সূর্যোদয় দেখবার জন্যে। যাবেন ?'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্যালক আপত্তি তুললেন, 'সূর্যোদয় দেখতে হলে তার আগের রাত্রে গিয়ে হর-জটায় থাকতে হয়, কিংবা রাত্রি দুটোর সময় এখান থেকে বেরুতে হয়। সে কি সুবিধে হবে ?'

প্রমথ পকেট থেকে চিঠি বার করে বলল, 'তাঁর চিঠি পড়ে দেখুন, অসুবিধে বোধ হয় হবে না।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রীতি নমস্কারান্তে নিবেদন, প্রমথবাবু, দেখছি আমার সেদিনের নিমন্ত্রণ আপনারা মুখের কথা মনে করেছেন। আমি কিন্তু সত্যিই আপনাদের তিনজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। আসুন না। রাত্রে আমার বাড়িতে থেকে সকালে সূর্যোদয় দেখবেন। কষ্ট হবে না ; আমার বাড়িতে তিনজন অতিথিকে স্থান দেবার মত জায়গা আছে।

কবে আসবেন জানাবেন। কিংবা না জানিয়ে যদি এসে উপস্থিত হন তাহলেও খুশি হব। আশা করি ভাল আছেন।

নিবেদিকা—সাবিত্রী দাস

এর পর আর শ্যালকের আপত্তি রইল না। প্রমথ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ শনিবার আছে, চলুন না আজই যাওয়া যাক। পাঁচটার সময় বেরুলে সন্ধের আগেই পৌঁছুনো যাবে।'

তাই ঠিক করে বেড়িয়ে পড়া গেল।

হর-জটা শিখরটি উপত্যকা থেকে দেখা যায়, সত্যি হর-জটা নাম সার্থক। যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের জটা পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠেছে ; তার খাঁজে খাঁজে সাদা বাংলোগুলি ধুতুরা ফুলের মত ফুটে আছে। অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার রাস্তাটি অপূর্ব নয় ; তিন মাইল পথ হাঁটতে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা লাগল।

আমরা যখন মিসেস দাসের বাংলোর সামনে গিয়ে হাজির হলুম তখন দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে ; তবু হর-জটার কুটিল কুণ্ডলীতে সূর্যাস্তের আবীর লেগে আছে। মিসেস দাস বাড়ির সামনের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে ছিলেন, উৎফুল্ল কলকাকলি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের দেখে তাঁর এই অকৃত্রিম

আনন্দ বড় ভাল লাগল।

শোনা যায়, আসন্ন দুর্ঘটনা সামনে কালো ছায়া ফেলে তার আগমনবার্তা জানিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন দুর্ঘটনার বিন্দুমাত্র পূর্বাভাস পাইনি। সেই পার্বত্য সন্ধ্যার গৈরিক আলো—মনে হয়েছিল, এ আলো নয়, অপরূপ এক দৈবী প্রসন্নতা। তার আড়ালে যে লেশমাত্র অশুভ লুকিয়ে থাকতে পারে তা কল্পনা করাও যায় না। আমার বোধ হয় প্রমথও কিছু আভাস পায়নি।

মিসেস দাস আমাদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে ড্রয়িং রুমে এসে দেখি চা তৈরি। বাড়িতে পুরুষ চাকর নেই ; দু'টি পাহাড়ী মেয়েমানুষ কাজকর্ম রান্নাবান্না করে এবং রাত্রে থাকে।

হর-জটায় এখনো বিদ্যুৎবাতি এসে পৌঁছয়নি। কেরোসিন ল্যাম্পের মোলায়েম আলোয় চা খেতে বসলুম। মিসেস দাস চাকরানিদের সাহায্যে আমাদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

ড্রয়িং রুমের দেয়ালে একটা এনলার্জ করা ফটোগ্রাফ টাঙানো ছিল। দূর থেকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিলুম না ; চা খাওয়া শেষ হলে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ইনিই অকাল-মৃত মিস্টার দাস সন্দেহ নেই। ভাল করে দেখলুম। চেহারা সুন্দর বলা চলে না, কিন্তু একটা দৃঢ়তা আছে ; চওড়া চিবুকের মাঝখানে খাঁজ, চোখের দৃষ্টি একটু কড়া। ফটো তোলবার সময় ঠোঁটের কোণে যে হাসি আনার নিয়ম আছে সেটি অবশ্য রয়েছে, কিন্তু হাসি দিয়ে চরিত্রের দৃঢ় বলিষ্ঠতা ঢাকা পড়েনি।

মনে মনে এই মুখখানির সঙ্গে প্রমথর নরম মিষ্টি মুখের তুলনা করছি এমন সময় পাশে মৃদুকণ্ঠের আওয়াজ হল, 'আমার স্বামী।'

দেখলুম মিসেস দাস আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। তারপর প্রমথও এসে দাঁড়াল। মিসেস দাস কিছুক্ষণ ফটোর দিকে তাকিয়ে থেকে চকিতে প্রমথর পানে চাইলেন। তাঁর মুখখানি শান্ত, মুখ দেখে মনের কথা ধরা যায় না; তবু সন্দেহ হল তিনিও আমারই মত ফটোর সঙ্গে প্রমথর মুখ তুলনা করলেন।

আমরা আবার ফিরে এসে বসলুম।

মেয়েমানুষের মন বোঝা সহজ নয় ; বিশেষত মিসেস দাসের মত মেয়ের মন। কবি বলেছেন, রমণীর মন সহস্র বর্ষের সখা সাধনার ধন। আমি ভাবতে লাগলাম, ইনি প্রমথকে বিয়ে করতে অস্বীকার করছেন একথা নিশ্চয় সত্যি, কিন্তু প্রমথ সম্বন্ধে তাঁর মনে কি কোন দুর্বলতা নেই ? এই যে আজ তিনি আমার মতন একজন অপরিচিত লোককে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন এটা কি শুধুই লৌকিক সহৃদয়তা ? না এর অন্তরালে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কাছে পাবার অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল ?

প্রমথর অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সেদিন যেমন দেখেছিলুম আজও ঠিক তাই। চুম্বকাবিষ্ট কম্পাসের কাঁটা, অন্য কোন দিকেই তাঁর লক্ষ্য নেই।

ক্রমে রাত্রি হল। উত্তর দিক থেকে একটা খুব ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে মাথার উপর দিয়ে সাঁই সাঁই শব্দে বইতে লাগল।

রান্নাবান্না হতে স্বভাবতই একটু দেরি হল। আমরা রাত্রির খাওয়া শেষ করে যখন উঠলুম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। মিসেস দাস বললেন, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন গিয়ে। সকাল সাড়ে তিনটের আগে কিন্তু উঠতে হবে, নইলে সূর্যোদয়ের সব সৌন্দর্য দেখতে পাবেন না।'

ভাবনা হল, এখন শুতে গেলে সাড়ে তিনটের সময় ঘুম ভাঙবে কি ? যদি না ভাঙে আজকের অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করলুম, 'অ্যালার্ম ঘড়ি আছে কি ?'

মিসেস দাস বললেন, 'না। কিন্তু সেজন্য ভাববেন না ; আমি ঠিক সময়ে আপনাদের তুলে দেব।'

শ্যালক বললেন, 'কিন্তু আপনার ঘুম যে ভাঙবে তার ঠিক কি ?'

মিসেস দাস একটু হেসে বললেন, 'আমি ঘুমোব না, এই ক'ঘণ্টা বই পড়ে কাটিয়ে দেব। আমার অভ্যেস আছে।'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। আমরা ঘুমোব আর ভদ্রমহিলা সারারাত জেগে থাকবেন ?

হঠাৎ প্রমথ তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তাহলে আমিও জেগে থাকি।' আমাদের দিকে চেয়ে বলল, 'আপনারা শুয়ে পড়ুন।'

আমার মন কিন্তু এ প্রস্তাবে সায় দিল না। আমরা দুজন বয়স্ক ব্যক্তি ঘুমোব, আর এই দুটি যুবক-যুবতী সারারাত্রি একত্র থাকবে—

শ্যালক সমস্যা ভঞ্জন করে দিয়ে বললেন, 'তবে আমরা সকলেই জেগে থাকি না কেন ? আমার আবার নতুন জায়গায় সহজে ঘুম আসে না ; এমনিতেই হয়তো চোখ চেয়ে রাত কেটে যাবে।'

আমি বললাম, 'আমারও ঠিক তাই।'

মিসেস দাস আপত্তি করলেন, কিন্তু আমরা শুনলুম না। ড্রয়িং রুমে বেশ জুৎ করে বসা গেল। চার ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। শ্যালক প্রস্তাব করলেন, তাস খেলা যাক ; কিন্তু বাড়িতে তাস ছিল না বলে তা আর হল না।

প্রথমে খুব উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গল্প চলছে। মিসেস দাস একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে শুয়েছেন ; শ্যালক সোফায় লম্বা হয়ে সিগারেট টানছেন ; আমিও একটা গদি মোড়া চেয়ারে গুটিসুটি হয়ে বেশ আরাম অনুভব করছি ; কেবল প্রমথ অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা ওটা নাড়ছে, আলোটা কখনো কমিয়ে দিচ্ছে কখনো বাড়িয়ে দিচ্ছে—

মিসেস দাসের শান্ত চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

বারোটা বাজল।

শ্যালক উঠে বসলেন ; সিগারের দগ্ধ প্রান্তটুকু অ্যাশট্রের উপর রেখে

বললেন, 'আচ্ছা মিসেস দাস, আপনি এই বাড়িতে একলা থাকেন, আপনার ভয় করে না?'

মিসেস দাস একটু ভুরু তুলে তাকালেন, 'ভয়? কিসের ভয়?'

বাড়ির মাথার ওপর ঠাণ্ডা বাতাসটা সাঁই সাঁই শব্দ করে চলেছে। আমি একটা হাই চাপা দিয়ে বললুম, 'মনে করুন ভূতের ভয়।'

প্রমথ মিস্টার দাসের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়িয়ে বিরাগ-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, আমার কথা শুনে চকিতে ফিরে চাইল ; তারপর আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াল। বিদ্রূপ করে বলল, 'ভূতের ভয়! সে আবার কি? ভূত বলে কিছু আছে নাকি? বরদাবাবুর যত কুসংস্কার।'

মিসেস দাসকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনারও কি তাই মত?'

তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'পরজন্ম আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূত—কি জানি—'

প্রমথ জোর গলায় বলে উঠল, 'ভূত নেই। ভূত শব্দের যে অর্থই ধর, ভূত থাকতে পারে না। আছে শুধু বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। এই কি যথেষ্ট নয়?'

তার মুখের পানে তাকালুম ; মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। প্রমথ গরম স্বভাবের মানুষ, তাকে এত বিচলিত কখনো দেখিনি। যেন সাবিত্রীকে একটা কথা বলবার জন্য তার প্রাণে প্রবল আবেগ উপস্থিত হয়েছে, অথচ আমাদের সামনে বলতে পারছে না।

শ্যালকও ব্যাপারটা বুঝেছিলেন ; তিনি বললেন, 'বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যদি থাকে তবে ভূতও থাকতে বাধ্য। আমাদের সকলেরই অতীত জীবন আছে—সেইটেই ভূত। তোমারও ভূত আছে প্রমথ, তাকে এড়ানো সহজ নয়। তবে মরা মানুষের সঙ্গে আমাদের তফাত এই যে, মরা মানুষের সবটাই ভূত ; আমাদের কিছুটা বর্তমান আর ভবিষ্যৎ আছে।'

শ্যালক যে ভূত কথাটার দু'রকম অর্থ নিয়ে লোফালুফি করছেন, প্রমথ তা বুঝল না ; তার তখন রোখ চেপে গেছে। সে হাত নেড়ে বলল, 'ও সব হেঁয়ালি আমি বুঝি না। মৃত্যুর পর আত্মা যে বেঁচে থাকে তা প্রমাণ করতে পারেন?'

শ্যালক হেসে বললেন, 'আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারি না। প্রেতযোনি সম্বন্ধে বরদা খবর রাখে, ওকে জিজ্ঞেস কর।'

আমি বললুম, 'দেখুন প্রমথবাবু, যে লোক জেগে ঘুমোয় তাকে জাগানো যায় না, আপনিও যদি বিশ্বাস করবেন না বলে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বিশ্বাস করানো কারুর সাধ্য নয়! তবে এইটুকু বলতে পারি, অনেক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিভাবান লোক প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করেছেন। যথা—উইলিয়াম ক্রুক্স, অলিভার লজ, কোনন ডয়েল—'

প্রমথ মুখ শক্ত করে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না। যদি প্রমাণ করতে পারেন তো প্রমাণ করুন, নইলে কেবল কতকগুলি বিলিতী নাম আউড়ে আমাকে কাবু

করতে পারবেন না।'

একটু রাগ হল। বললুম, 'বেশ। বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মিসেস দাস, আসুন, প্ল্যাঞ্চেট করা যাক।'

তিনি একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'প্ল্যাঞ্চেট। ভূত নামাবেন?'

বললুম, 'প্রমথবাবুর অবিশ্বাস ভাঙবার আর তো কোন উপায় দেখি না। তবে আপনার যদি ভয় করে তাহলে কাজ নেই।'

তিনি বললেন, 'না, ভয় করবে না।' চকিতে একবার প্রমথর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো, করুন না। আর কিছু না হোক সময় তো কাটবে। কি চাই বলুন।'

বললুম, 'বেশি কিছু নয়, শুধু একটা তেপায়া টেবিল হলেই চলবে।'

ছোট একটা তেপায়া টেবিল ঘরেই ছিল। আমি তখন দু'চার কথায় প্ল্যাঞ্চেটের প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিলুম। তারপর আলোটা কমিয়ে দিয়ে চারজনে টেবিল ঘিরে বসা গেল।

শ্যালক প্রশ্ন করলেন, 'কাকে ডাকা হবে?'

আমি বললুম, 'যাকে ইচ্ছা ডাকা যেতে পারে। তবে এমন লোক হওয়া চাই যাকে আমরা সবাই চিনি। অন্তত যার চেহারা আমাদের সকলের জানা আছে।'

আমরা যেখানে বসেছিলুম তার অল্প দূরেই মিষ্টার দাসের ছবি দেয়ালে টাঙান ছিল। প্রমথ বসেছিল ছবির দিকে পিঠ করে, আর মিসেস দাস ছিলেন তার সমুখে। মিসেস দাস ছবির পানে চোখ তুললেন ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখও সেই দিকে ফিরল। অল্প আলোতে ছবিটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে না, কেবল মুখখানা স্পষ্ট হয়ে আছে।

মিসেস দাস ছবি থেকে চোখ নামিয়ে আমার পানে চাইলেন। তাঁর চোখের প্রশ্ন বুঝে আমি বললুম, 'হ্যাঁ, ওঁকেই ডাকা যাক। আমি যদিও ওঁকে দেখিনি তবু ছবিতেই কাজ চলবে। সকলে চোখ বুজে মনে মনে ওঁর কথা ভাবুন।'

আঙুলে আঙুলে ঠেকিয়ে টেবিলের ওপর হাত রাখা হল। তারপর আমরা চোখ বুজে মিস্টার দাসের ধ্যান শুরু করে দিলুম।

প্ল্যাঞ্চেটের টেবিলে যখন প্রেতযোনির আবির্ভাব হয় তখন টেবিলটা নড়তে থাকে ; মনে হয় টেবিলটার মরা কাঠে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে, তার ভেতর দিয়ে একটা স্পন্দন বইতে থাকে। আমরা প্রায় দশ মিনিট বসে রইলুম, কিন্তু টেবিল নড়ল না, তার মধ্যে জীবন সঞ্চার হল না। তখন চোখ খুলে আর সকলের পানে তাকালুম।

প্রমথকে দেখেই বুঝলুম প্রেতের আবির্ভাব হয়েছে, টেবিলের ওপর নয়, মানুষের ওপর। এমন মাঝে মাঝে হয়, তার মুখটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে ; মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে গেছে।

প্রেতের উদ্দেশে প্রশ্ন করলুম, 'কেউ এসেছেন কি?'

প্রমথ আস্তে আস্তে মুখ তুলল ; তারপর টকটকে রাঙা চোখ খুলে মিসেস দাসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে দিলুম। এতক্ষণে প্রমথর মুখ ভাল করে দেখা গেল। তার মুখ দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলুম। কঠিন হিংস্র মুখ—ক্রূর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। চোখের দৃষ্টি প্রমথর দৃষ্টি নয়, যেন তার চোখের ভিতর দিয়ে অন্য একজন উঁকি মারছে।

মিসেস দাস সম্মোহিতের মত তার পানে চেয়ে ছিলেন। হঠাৎ প্রমথ উগ্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'সাবিত্রী!'

তার গলার আওয়াজ পর্যন্ত বদলে গেছে। মিসেস দাসের চোখ বিস্ফারিত হতে লাগল ; তাঁর ঠোঁট দুটি খুলে গেল। তারপর তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'অ্যাঁ! তুমি, তুমি!' এই বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

তারপর যা কাণ্ড বাধল তা বর্ণনা করা যায় না। প্রমথ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ; তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। আমি তাকে ধরতে গেলুম, কিন্তু আমার সাধ্য কি তাকে ধরে রাখি। তার গায়ে অসুরের শক্তি। আমাকে এক ঝটকায় দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সাবিত্রীর অজ্ঞান দেহটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাকে দু-হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে গজরাতে লাগল, 'তুমি আবার বিয়ে করতে চাও ? দেব না—দেব না—তুমি আমার—'

ভেবে দ্যাখো, প্রমথর মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বেরুচ্ছে! কিন্তু আমাদের তখন ভাববার সময় নেই, আমি আর শ্যালক দুজনে মিলে টেনে প্রমথকে আলাদা করলুম। ইতিমধ্যে পাহাড়ী চাকরানি দুটো চেঁচামেচি শুনে এসে পড়েছিল ; তারা সাবিত্রীকে তুলে নিয়ে কৌচের ওপর শুইয়ে দিল। আমরা প্রমথকে টেনে নিয়ে চললুম স্নান ঘরের দিকে ; সেখানে তাকে মেঝেয় ফেলে মাথায় বালতি বালতি জল ঢালতে লাগলুম আর চিৎকার করে বলতে লাগলুম, 'আপনি চলে যান—চলে যান—'

'না, যাব না—সাবিত্রীকে বিয়ে করতে দেব না—' দাঁত ঘষে ঘষে প্রমথ বলতে লাগল। আমরা জল ঢালতে লাগলুম। ক্রমে তার গলার আওয়াজ জড়িয়ে এল ; হাত-পা ছোঁড়াও বন্ধ হল।

আধঘণ্টা পরে দুজনে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় শুইয়ে দিলুম। তখন তার গায়ে আর শক্তি নেই, তবু বিজবিজ করে বকছে, 'দেব না—দেব না—'

শ্যালককে তার কাছে বসিয়ে ড্রয়িং রুমে গেলুম। দেখি মিসেস দাসের জ্ঞান হয়েছে। আমাকে দেখে তিনি ভয়ার্ত কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, 'এ কী হল, বরদাবাবু, এ কী হল ?'

মেয়েদের মনের অন্তরতম কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তাদের লজ্জা আর ভয়ের অন্ত থাকে না, কান্নাই তখন তাদের একমাত্র আবরণ। আমি মিসেস

দাসের পাশে বসে তাঁকে যথাসাধ্য ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম। তারপর চাকরানিদের বললুম, 'এক পেয়ালা কড়া চা শিগগির তৈরি করে নিয়ে এস।'

সেদিন সূর্যোদয় দেখা মাথায় উঠল। দুই ঘরে দুটি রুগীর পরিচর্যা করতেই বেলা সাতটা বেজে গেল।

যা হোক, মিসেস দাস তো সামলে উঠলেন, কিন্তু প্রমথ সেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না। জোর করেও ঘুম ভাঙাতে সাহস হল না, আবার হয়তো বিদঘুটে কাণ্ড আরম্ভ করে দেবে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের আজ ফিরে যেতেই হবে, নইলে অনেক হাঙ্গামা।

বেলা একটা পর্যন্ত যখন প্রমথর ঘুম ভাঙল না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলুম। ভাগ্যক্রমে একজন বৃদ্ধ ডাক্তার হর-জটায় বাস করেন, তাঁকে ডাকা হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'বুকে একটু ঠাণ্ডা বসেছে, বিশেষ কিছু নয়; কিন্তু আজ এঁর বিছানা থেকে ওঠা চলবে না।'

আমরা কাতর চক্ষে মিসেস দাসের পানে চাইলুম। তিনি এতক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, বললেন, 'প্রমথবাবু আজ এখানেই থাকুন। আপনারা যদি নিতান্তই না থাকতে পারেন—'

শ্যালক অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'দেখুন, যাওয়া খুবই দরকার, কিন্তু আমরা না থাকলে আপনার যদি কোন লজ্জার কারণ হয়—'

মিসেস দাস বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না।'

বৃদ্ধ ডাক্তার আমাদের কথা শুনছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'ভাবনার কি আছে ; আমি তো কাছেই থাকি, আমি না হয় রাত্রে এসে সাবিত্রী মা'র বাড়িতে থাকব ; দরকার হলে আমার স্ত্রী এসে থাকতে পারেন। আপনারা ফিরে যান।'

বৃদ্ধ ডাক্তারটি মরমী লোক ; অযথা প্রশ্ন করেন না। আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রমথ সম্বন্ধে চিন্তার কারণ নেই ; ঘুম ভাঙলেই সে সহজ মানুষ হয়ে পড়বে।

বেরুবার সময় মিসেস দাস আমাদের একটু আড়ালে বললেন, 'কাল রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোন আলোচনা না হলেই ভাল হয়।'

আমরা আশ্বাস দিলুম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তারপর হর-জটা থেকে নেমে এলুম।

পরদিন সন্ধের সময় খবর পেলুম প্রমথ ফিরে এসেছে। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল না।

এদিকে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, দু'এক দিনের মধ্যে বেরুতে হবে। ভাবলুম, যাই, আমিই প্রমথর সঙ্গে দেখা করে আসি। এইসব ব্যাপারের পর তার হয়তো আসতে সংকোচ হচ্ছে।

পরদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফেরার পথে তার বাসায় গেলুম। সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই প্রমথ এসে দোর খুলে দাঁড়াল। তার চেহারায় কী একটা সূক্ষ্ম

পরিবর্তন হয়েছে। সে কটমট করে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল, তারপর দড়াম্ করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

প্রমথর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। তার পরদিনই পাহাড় থেকে নেমে এলুম।

এই পর্যন্ত বলিয়া বরদা থামিল। ইতিমধ্যে চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। ভাঙের নেশার জন্যই হোক বা বরদার গল্প শুনিয়াই হোক, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

পৃথ্বী প্রশ্ন করিল, 'তোমার গল্প এইখানেই শেষ ? না আর কিছু আছে ?"

বরদা একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আর একটু আছে। মাসখানেক পরে শ্যালকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। তিনি এক আশ্চর্য খবর দিয়েছেন ; সাবিত্রীর সঙ্গে প্রমথর সিভিল ম্যারেজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা হয়েছিল, যে ব্যাপার ঘটেছে, তারপর তাদের বিয়ে অসম্ভব। প্রমথ যে শেষকালে আমার সঙ্গে অমন রূঢ় ব্যবহার করেছিল, সেটাও আমি তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া মনে করেছিলুম। কিন্তু দেখলুম, আমার হিসেব আগাগোড়াই ভুল।

'শ্যালক আর একটি খবর দিয়েছেন, সেটি আরও অদ্ভুত। এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রমথর চেহারা নাকি অনেকখানি বদলে গেছে ; সকলেই বলছে, তার চেহারা ক্রমশ গতাসু মিস্টার দাসের মতন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন কি তার চিবুকের মাঝখানে একটা খাঁজ দেখা দিয়েছে—'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া বরদা বলিল, 'এতক্ষণ আমি সরলভাবে ঘটনাটি বলে গেছি, নিজের টীকা-টিপ্পনী কিছু দিইনি। এখন তোমরাই এর টীকা-টিপ্পনী কর—এটা কি, মিস্টার দাসের প্রেতাত্মা কি প্রমথকে তার দেহ থেকে উৎখাত করে নিজে কায়েমী হয়ে বসেছেন এবং নিজের বিধবাকে আবার বিয়ে করেছেন ? কিংবা—আর কি হতে পারে ?'

আমরা কেহই উত্তর দিলাম না। বরদা তখন কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'যদি তাই হয় তাহলে প্রমথর আত্মাটার কী হল ? কোথায় গেল সে ?'

অকস্মাৎ আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চিৎকারধ্বনি হইল। আমরা চমকিয়া ঊর্ধ্বে চাহিলাম ; দেখিলাম, বাদুরের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে– কালো ত্রিকোণ পাখা মেলিয়া পাখিটা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল।

কণ্টকিত দেহে আমরা চাহিয়া রহিলাম।

কে তুমি ?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম আমি কখনও দেখিনি। শহরেই জন্ম, শহরেই বড় হয়েছি। শহরেই কেটেছে এই পঁচিশটি বসন্ত।

আমার এক বন্ধু জুটেছে চাকরি করতে গিয়ে। বন্ধুর নাম সুজিত। বীরভূমি জেলায় কোন একটি গ্রামে তার বাড়ি। বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। হঠাৎ একদিন সুজিত আমাকে বললে, যাবি আমাদের বাড়ি ? গ্রাম কখনও দেখিসনি বলছিস, দেখে আসবি।

সামনে চারদিন ছুটি। বললাম, যাব।

সুজিতদের গ্রামে এসেছি। রেল-স্টেশন থেকে বহুদূরে—কতক গরুর গাড়িতে, কতক বা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে তাই গেলাম।

গ্রামখানি চমৎকার। ঢেউ-খেলানো মাটি, চারিদিকে ধানের মাঠ। দক্ষিণে একটি জঙ্গল। শাল তাল তমাল গাছের সারি। মনে হয় প্রতিটি গাছ যেন যত করে পোঁতা। একে এরা জঙ্গল কেন বলে বুঝতে পারি না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটির ওপর শ্রেণীবদ্ধ গাছের ছায়ানিবিড় তপোবনের মত স্নিগ্ধ শ্যামল জায়গাটি আমার এত ভাল লাগল যে সহজে সেখান থেকে আসতে মন চাইল না।

সুজিতের বাড়িখানা পুরোন। আগেকার দিনের তৈরি দোতলা বাড়ি—কিছ ভেঙেছে, কিছু বা মেরামত করা হয়েছে।

· দোতলার একটি ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দক্ষিণ দিকের জানলাটি খুললে দেখা যায়—পাশেই একখানি মাটির বাড়ি। পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হয়। লোকজন কেউ বাস করে না। উঠোনে একটি আমের গাছ। গাছে তখন অজস্র মুকুল ধরেছিল। আমের মুকুলের গন্ধে আমার ঘরখানা যেন ভরে আছে।

রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। সেদিন কার ডাকে যেন ঘুম ভেঙে গেল শুনছেন ? শুনছেন ?

স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর।

জানলার পথে তাকিয়ে দেখলাম, সেই পোড়ো বাড়িটার উঠোনে আম গাছটির তলায় তন্বী এক তরুণী দাঁড়িয়ে। জ্যোৎস্নার আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছিল মেয়েটির সর্বাঙ্গে। মেয়েটি সুন্দরী বলেই মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছেন ?

মেয়েটি বললে, আমার মা কোথায় বলতে পারেন ?

বললাম, আমি নতুন এসেছি এ-গ্রামে। আমি কিছু জানি না।

আর কিছু বললে না মেয়েটি।

মনে হল যেন সে চলে গেল। আলোছায়া ঘেরা সেই গাছের তলায় তাকে আর দেখতে পেলাম না। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না।

ঘটনাটা আমি ভুলতে পারছিলাম না। পরের দিন সকালে বললাম সুজিতকে।

সুজিত বললে, ও জানলাটা আর খুলো না। বন্ধ করে দিয়ো।

কেন বল দেখি ? মেয়েটা কি—

সুজিত বললে না, না, সে-রকম কিছু নয়। কাজ কি বাবা পরের মেয়ের সঙ্গে... দুদিনের জন্যে এসেছিস্—

বুঝলাম। সেই ভাল।

সেদিন রাত্রে জানলাটা বন্ধ করেই আমি শুয়েছিলাম।

কিন্তু সেদিন আবার। আবার সেই কণ্ঠস্বর। আবার সেই ডাক ; শুনছেন? শুনছেন ?

জানলার কপাটটা ঠেলছে বলে মনে হল।

বাধ্য হয়ে জানলাটা খুলে ফেললাম।

কিন্তু এ-কী ? সেই সুন্দর মুখখানি জানলার শিকগুলোর ঠিক পেছনে। মেয়েটি মনে হল যেন জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ? জানলার পেছনে তো কিছুই নেই ! মেয়েটি তাহলে দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপর ?

এই কথা ভাবতেই টপ করে মাথাটা আমার ঘুরে গেল।

বললাম, আমি জানি না—কাল তো বলেছি আপনাকে!

আমার কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। আমি কাঁপছি ঠক্‌ঠক্ করে। জানলাটা বন্ধও করতে পারছি না, চিৎকার করে ডাকতেও পারছি না সুজিতকে।

আমার অবস্থা দেখেই বোধ হয় খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি! সুন্দর সাজান দাঁতের সারি। উজ্জ্বল দুটি টানা টানা চোখ।

মেয়েটি বললে, আমি তো কোন কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি! আমি জানি আপনি নতুন এসেছেন। ক'দিন থাকবেন ?

খুব খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে জানলাটা বন্ধ করার জন্যে হাত বাড়িয়ে ছিলাম বোধহয়। কিন্তু জানলাটা বন্ধ করবার অবসর আমি পেলাম না। তার আগেই মেয়েটি এসে দাঁড়াল একেবারে আমার সুমুখে—ঘরের ভিতর।

আবার তার সেই হাসি!

তারপর কি হয়েছে আমার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরে এল—দেখি, আমি শুয়ে আছি সুজিতের ঘরে। সুজিতের ছোট বোন দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাওয়া করছে। মাথার চুলগুলো ভিজে। মাথায় বোধকরি জল ঢালা হয়েছে।

সুজিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছিস যে ? কী হয়েছিল রে ?

সুজিত বললে, কিরকম ভীতু রে তুই। ও-রকম চেঁচিয়ে উঠেছিলি কেন ?

কেন তা আমি কেমন করে বলি! বললাম, তারপর ?

সুজিত বললে, তোর চিৎকার শুনে ছুটে গেলাম। ভাগ্যিস দোরে খিল বন্ধ করিসনি। নইলে কি যে হত কে জানে।

খুব হয়েছে আমার গ্রাম দেখা।

পরের দিনই বললাম, আমি কলকাতায় যাব।

সুজিতকেও আসতে হল আমার সঙ্গে।

গ্রামে থাকতে সুজিত আমাকে কোন কথাই বলেনি। কোন রহস্যই ভাঙেনি।

ট্রেনে আসতে আসতে সুজিত বললে, বেচারী সুবী! ওকে আমরা দেখেছি সবাই। কিন্তু আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমরা গ্রাহ্য করি নে।

মেয়েটা আসে। তার মার খবর জানতে চায়। বলে, তার মা কোথায় তোমরা বল।

আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। খুলে বল্ সব কথা।

সুজিত বলল, তাহলে শোন্!

সংসারে দুটি মাত্র মানুষ। মা আর মেয়ে।

মার বয়স হয়েছে। মেয়ের বয়স এই সবে আঠারো-উনিশ, কিন্তু দুজনেই বিধবা।

ঝগড়া-ঝাঁটি তাদের চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকে! মেয়েটাই দিবারাত্র খিটিমিটি করে ; মার সঙ্গে ঝগড়া করবার ছুতো খুঁজে বেড়ায়। আবার অবাক কাণ্ড—খুব খানিকটা ঝগড়া করে নিজেই শেষে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে।

মা বলে, তুই একটা কিছু না করে আর ছাড়বিনে দেখছি! মাথার একপিঠ চুল এলিয়ে এই ভর্তি দুপুরবেলা কাঁদতে বসলি যে ? আয়, চুলগুলো বেঁধে দিই।

এই বলে চুলগুলো বেঁধে দেবার জন্যেই মা হয়তো তার কাছে এগিয়ে যায়, কিন্তু মেয়ে তখন রেগে একেবারে টং। চুলে হাত দিতে সে কিছুতেই দেবে না। বলে, যাও, যাও, খুব হয়েছে। তোমাকে আ—

মার চোখ দুটি তখন জলে ভরে আসে।

আঁচলে চোখ মুছে বলে, থাক তবে, কাঁদ ওইখানে বসে! বলে ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গিয়ে এর বাড়ি খানিকক্ষণ বলে, ওর বাড়ি খানিকক্ষণ বসে, কথা কইবার মত কাউকে যদি কাছে পায় তো বলে, ওই বয়েস আর ওই রূপ নিয়ে বিধবা হল মা, মেয়েটার মুখের পানে আর তাকাতে

পারছিনে।

প্রতিবেশিনী হয়তো আশ্বাস দেয়। বলে, ভেব না মা, গা-সওয়া হয়ে যাবে।

মা কিন্তু তার নিজের কথাই বলতে থাকে। বলে—আমার কি মনে হয় জানিস বাছা, মনে হয়—এই নিয়ে সুবী হয়তো দিবারাত্র ভাবে। ভেবে আর যখন কূল-কিনারা পায় না, তখন হয়তো ও অমনি করে হয় কাঁদতে বসে, নয়তো ঝগড়া করবার জন্যে খুনসুড়ি করে বেড়ায়।

প্রতিবেশিনী মেয়েটি এবার নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে কথাটা সমর্থন করে। সুবীর মা তার মুখের পানে তাকিয়ে বলে, বুঝতে সবই পারি বাছা, কিন্তু মা হয়ে আমি যে আর—

বলতে বলতে ঠোঁট দুটি তার থরথর করে কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে আসে।

সে চোখের জল আর কিছুতেই থামতে চায় না। আঁচল দিয়ে মোছে আর তৎক্ষণাৎ কানায়-কানায় ভরে ওঠে।

মার সে কান্না বুঝি বিধাতারও সহ্য হল না। তাই সে কান্নার পালা হঠাৎ একদিন চুকে গেল। বিধাতা চুকিয়ে দিলেন, কি সুবী নিজেই চোকালে কে জানে!

সেদিন দুপুরে মা ও মেয়ে দুজনেই খেতে বসেছে। ভাত চিবোতে গিয়ে কটাং করে সুবী তার দাঁতে একটা কাঁকর চিবিয়ে ফেললে। হাতের গ্রাসটা তৎক্ষণাৎ সে থালার ওপর ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে উঠল—না, আর পারি নে বাবা! কেন, চালগুলো বেছে নিতে পারোনি?

মা বললে, চাল আর কত বাছব বাছা! ভাতে কাঁকর পাথর দু-একটা অমন থাকে। তাই বলে তোর মতন এমন বিটকেল কেউ করে না— খা।

মেয়ে আর না খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইল দেখে মার মনে মনে সত্যিই এবার একটুখানি রাগ হল। বললে, এমন তিরিক্ষে মেজাজ তোর কেন হল সুবী? কই, আগে তো এমন ছিল না!

সুবীর মুখখানা ভারী হয়ে উঠল।

তাই না দেখে মা আবার বললে, এতই যদি নবাবের মেয়ে হয়ে থাকিস তো চালগুলো কাল থেকে তুই নিজের হাতে বেছে দিস।

তাই দেব। বলে থালাটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সুবী উঠে দাঁড়াল।

সর্বনাশ! বিধবা মেয়ে, একবারের বেশি খেতে নেই! মা চট করে বাঁ-হাত বাড়িয়ে আঁচলটা চেপে ধরে বলে উঠল, বোস্, চারটি খেয়ে নে! কেউ দেখেনি, তাতে দোষ নেই, নে বোস!

ঝাঁকুনি দিয়ে সুবী আঁচলটা ছাড়িয়ে নিলে। বললে, না, আর খাব না।

সারাদিন খেতে যে আর পাবি নে হতভাগী, উপোস দিয়ে মরবি?

মরণ হলে তো বাঁচি! মরণ যে হয় না ছাই!

তাই মর তুই! আমারও হাড়টা জুড়ায় তাহলে।

বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে সুবী আঁচাতে চলে গেল।

মা-ই বা আর কেমন করে খায়! থালাটা সরিয়ে দিয়ে মা-ও উঠে দাঁড়াল।

খিড়কির পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে সুবী দেখলে, এঁটো থালা তেমনি পড়ে আছে, আর ঘটির জলে উঠোনে হাত ধুয়ে মা তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

মা তার সেদিন যেখানে সেখানে কেঁদে কেঁদে সারা হল। না মা, রইল ওই দস্যি মেয়ে আমার বাড়িতে, আমায় দেখছি অন্য কোন দেশে গিয়ে পালাতে হল।

প্রতিবেশিনী মেয়েরা কেউ বা সান্ত্বনা দেয়, আবার কেউ বা বলে, কি জানি মা, তোমাদের ঝগড়ার কিছু বুঝি নে আমরা!

মায়ের চোখ দিয়ে জল আসে। বলে, বুঝতে কি ছাই আমিই পারি বাছা! ও যে কেন অমন করছে মা, তা কে জানে!

মা আবার সে-বাড়ি থেকে উঠে আর এক বাড়িতে গিয়ে বসে। সেখানেও সেই কান্না আর ওই এক কথা।—আজ আর আমি বাড়ি ঢুকছি নে। দেখি ও আমায় খুঁজতে আসে কিনা!

এমনি করে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করতে করতে সূর্য ডুবল। রোজ ঠিক এমনি সময় পুকুর থেকে এক-কলসী করে খাবার জল তাকে আনতে হয়। পাড়ার মেয়েরা সব কলসী কাঁখে নিয়ে পুকুরে যাচ্ছিল, করালীর মা বললে, চল, না হয় আমার একটা কলসী নিয়েই চল আজকে।

সুবীর মা বললে, না বাছা, থাক, আজ আর যাব না। মজাটা একবার বুঝুক।

মজা বোঝাবার জন্যে সে রইল বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে চারদিক আঁধার করে এল, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলল, তবু সুবী তাকে ডাকতে এল না।

মার মন ঘর ছেড়ে এমন করে কতক্ষণই বা বাইরে থাকে। তুলসীতলায় এখনও হয়তো সন্ধে পড়ল না—এতক্ষণ হয়তো সে তার নিজের লণ্ঠনটি জ্বেলে নিয়ে রামায়ণ পড়তে বসে গেছে—মা তার মরল না বাঁচল বয়ে গেছে তার দেখতে!

সরু একটা গলির অপর প্রান্তে একেবারে একটেরে তাদের সেই ছোট মাটির ঘরখানি—চারিদিকে মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সদর দরজা পেরিয়েই বাঁ-হাতে উঠোনের এক পাশে বহুদিনের প্রাচীন একটা আমের গাছ—অজস্র ডালপালা বিস্তার করে জায়গাটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। তাহলেও ঘরে যদি আলো জ্বলে তো বাইরে থেকেই টের পাওয়া যায়। কিন্তু আলো জ্বলা দূরে থাক, সুবীর মা সদর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ।

হেঁকে বললে, সুবী দরজা খোল্!—কাজ দ্যাখ দেখি মেয়ের! ঘরে ঢুকতে না দেবার মতলব!

ভেতর থেকে সুবী সাড়া আর কিছুতেই দেয় না, দরজাও খোলে না।

কাছেই তারাপদদের বাড়ি। তারাপদ তখন সবেমাত্র গোয়ালে গাই-

গরুগুলিকে খেতে দিয়ে ঘরে এসে বসেছে, এমন সময় সুবীর মা এসে বললে, আয় তো বাবা, সুবীকে একবার আচ্ছা করে ধমক দিবি! সদর দরজায় খিল দিয়ে বসে আছে, আমায় ঢুকতে দেবে না।

তারাপদ হেসে বললে, ঝগড়া হয়েছে বুঝি ? বলেই লণ্ঠনটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজায় বারকতক জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললে, খোল বলছি সুবী, নইলে কিছু বাকি রাখব না।

দরজা তবু খুলল না।

লণ্ঠনটা হাত থেকে নামিয়ে তারাপদ বললে, তুমি দাঁড়াও মাসি, পাঁচিল টপকে দরজাটা খুলে দিই।

খাটো মাটির প্রাচীর। উঠতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

কিন্তু ঝুপ করে ওপাশে নেমেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কি যেন দেখে সে আমগাছের তলা থেকে সহসা বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, মাসি! মাসি!

বাইরে থেকে সুবীর মা বললে, কি বাবা ?

কিন্তু জবাব দেবার অবসর তখন আর নেই। দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলেই তারাপদ কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে আমগাছের তলায় গিয়ে দেখে—সর্বনাশ!

সুবীর মা তো অস্ফুট কণ্ঠে বিকট একটা চিৎকার করে সেখানেই আছাড় খেয়ে পড়ল—

আর স্তম্ভিত নির্বাক তারাপদ কম্পিত হস্তে লণ্ঠনের আলোটা তুলে ধরে দেখল—আমগাছের একটা ডালের গায় মোটা একটা দড়ির ফাঁসে লটকে সুবী আত্মহত্যা করেছে! পায়ের নিচে দড়ির ভাঙা খাটিয়াটা উলটে পড়ে আছে। টকটকে ফরসা রঙ যেন দুধে আলতায় গোলা, পিঠের ওপর ঢেউ খেলানো কালো একপিঠ চুল, কিন্তু মুখের চেহারা দেখলে আর সে-সুবী বলে চেনবার উপায় নেই। দাঁতের ফাঁকে খানিকটা জিভ বেরিয়ে গেছে, চোখ দুটো বড় বড়, গায়ের কাপড়-চোপড় বেসামাল অবস্থায় মাটিতে লুটোচ্ছে! হতভাগী মরবার আগে বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করেছিল কিনা তাই-বা কে জানে।

ব্যস্! সমস্ত গ্রাম একেবারে ঠাণ্ডা!

গ্রামদেশে আত্মহত্যা এমন কিছু নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা নয়, দু'দশ বছর পরে কদাচিৎ কোনও গ্রামে দৈবাৎ যদি বা এক-আধটা এমন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যায় তো কিছু বলবার থাকে না।

এখন এ মৃতদেহ নিয়ে কি করা যায়—এই হল গ্রামের লোকের ভাবনা। আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও তাদের আছে কিনা কে জানে। সুবীর মা তো সেই যে মাটিতে উপুড় হয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে, সেই থেকে আর ওঠেনি।

শিব মন্দিরের পাশে গ্রামের একটা রাস্তার ধারে সেই রাত্রেই মজলিস বসল। অনেক কথা-কাটাকাটির পর শেষে এই ঠিক হল যে, কী জানি বাবা, আত্মহত্যার

মড়া শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসবার পর কেউ যদি পুলিশে খবর দিয়ে দেয় যে সে আত্মহত্যা করেনি, কেউ তাকে মেরে ফেলে দিয়ে গাছে অমনি টাঙিয়ে রেখেছিল—তখন ?.. তার চেয়ে আগে থেকেই পুলিশে খবর দেওয়া হোক।

গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরে থানা। কিন্তু সুবীর দুর্ভাগ্য, চৌকিদার ফিরে এসে খবর দিলে—দারোগা সাহেব ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন, জমাদার সাহেব আসবেন কাল সকালে। বলেছেন, দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি মজা, গলায় দড়ি দিয়ে মরা আমি বের করছি।

গ্রামের লোক তো ভয়ে অস্থির!

দুগু ভট্‌চায্‌ বললে, কেন, তখনই তো বলেছিলাম দাদা, পুলিশে খবর দিয়ে কাজ নেই ; দিই জ্বালিয়ে।

লোকনাথ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল। ব্যাটা বলে কি হে! তারপর ? তারপর ঠেলাটি কে সামলাতো ?

দুগু বললে, ঠেলা আবার কিসের ?

হরিপদ তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, কেউ যদি বলত যে, না, ও গলায় দড়ি দিয়ে মরেনি, দুগু ভট্‌চাযের সঙ্গে দিনের বেলা ঝগড়াঝাঁটি না কি সব যেন হয়েছিল—

দুগু ভট্‌চায্‌ কালা মানুষ, কানে ভাল শুনতে পায় না। এদের আগেকার মন্তব্য সে কিছুই শোনেনি। হরিপদর মুখে তার নাম শুনে সে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, খবরদার বলছি হরিপদ, মিছে কথা বলিস নে। আমার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়নি।

সবাই তখন মুচকি মুচকি হাসছে।

হরিপদর সঙ্গে হাতাহাতি হবার যোগাড়। অনেক কষ্টে ভট্‌চায্‌কে থামান গেল। কিন্তু পরদিন সকালেও থানা থেকে জমাদার সাহেব এলেন না।

গ্রামে মানুষ মরছে, বাসি-মড়া তো হলই, তার ওপর আত্মহত্যার মড়া। ঠাকুর দেবতার শিলা-বিগ্রহের নিত্য সেবা যাদের বাড়িতে আছে তারা তো ভেবেই অস্থির। বাড়ি থেকে মৃতদেহটাকে বের না করা পর্যন্ত ঠাকুর দেবতার পুজো হবে না এবং পুজো যারা করবে, পুজো না হলে তাদের জলগ্রহণ করার উপায় নেই।

লোকনাথের বাড়ি প্রত্যহ শালগ্রাম শিলার ভোগ হয়। সকালে উঠেই ভিন্ন-গ্রামে সে একটা প্রায়শ্চিত্ত করাতে গিয়েছিল, প্রায় বারোটার সময় তেতেপুড়ে এসেই শুনলে পুলিশও আসেনি এবং মড়া তখনও উঠোনেই পড়ে আছে। মড়া দেখতে যারা গিয়েছিল, সকাল থেকে সুবীর মা নাকি তাদের প্রত্যেককেই কেঁদে কেটে হাতে পায়ে ধরে মড়াটাকে একটুখানি বের করে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কেউ তা শোনেনি।

লোকনাথের তখন পিপাসায় কণ্ঠরোধ হয়ে এসেছে। ভেবেছিল, বাড়ি গিয়ে শালগ্রামের পুজোটা করে দিয়ে জল খাবে। কিন্তু তাও যখন হল না, তখন সে

নিজেই হনহন করে বেরিয়ে গেল।

আপাদমস্তক ঢাকা-দেওয়া সুবীর মৃতদেহ আগলে—দেখা গেল মা তার আমগাছের তলায় একাকিনী চুপ করে বসে আছে। চোখে জল নেই, মুখখানি শুকনো—কেঁদে কেঁদে সে যেন হয়রান হয়ে গেছে।

দরজার বাইরে থেকে লোকনাথ চেঁচিয়ে উঠল, বলি ও ঠাকরুণ, মেয়ে তো না হয় সাত কুল উজ্জ্বল করে দিয়ে মলো, তাই বলে কি ও হারামজাদীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও মরতে হবে নাকি ? মড়া বের না করলে যে ঠাকুরের ভোগ হয় না।

মুখ তুলে একবার চাইতেই সুবীর মার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে এল। কথা সে কিছুই বলতে পারলে না, গলা তখন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লোকনাথ ভাবলে—বুঝি মাগী এইবার হয়তো তাকেই অনুরোধ করে বসবে, রাগের মাথায় অতটা সে এখানে আসবার আগে ভাবেনি, তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘোঁতঘোঁত করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

জমাদার সাহেব এলেন সন্ধ্যার সময়। পিলপিল করে লোকজন তাঁর পিছু পিছু ঢুকল সুবীদের বাড়ি।

কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখে, আমগাছের তলায় সেই ভাঙা খাটিয়াটি মাত্র পড়ে আছে, সুবীর মৃতদেহও নেই, সুবীর মাও নেই।

কোথায় গেল তারা ? বাগদীদের একটি ছোঁড়া আঙুল বাড়িয়ে দূরের একটা পুকুর দেখিয়ে বললে, উ-ইখানে বসে রয়েছে দেখলাম।

কিন্তু কখন যে সেখানে গেছে কেউ তা জানে না। লোকনাথ চলে যাবার পর সুবীর মা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে নিজেই একবার মৃতদেহটা তার কাঁধে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারী সে মৃতদেহ কাঁধে তোলা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তখন সে সুবীর মাথার দিকটা দুহাত ধরে টেনে টেনে তাকে বাড়ির বার করে এবং অমনি করেই একটু একটু করে দূরের ওই পুকুরটার ধারে নিয়ে গিয়ে ফেলে। আরও দূরে নিয়ে হয়তো সে যেত, কিন্তু পুকরের চারিপাড়ে শুধু শত শত কাঁকর আর পাথরের কুচি, একেই সুবীর রাঙা টুকটুকে পা দুখানি পথের ধুলোয় ম্লান হয়ে গেছে, তার ওপর মা হয়ে ওই শক্ত কাঁকর-পাথরের ওপর দিয়ে মেয়েকে তার হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যায়ই বা কেমন করে ? তাই সে ওখানেই চুপটি করে বসে আছে।

জমাদার সাহেব ভেবেছিলেন যা, এসে দেখলেন ঠিক তার উলটো। ভেবেছিলেন অবস্থাপন্ন লোকের বিধবা মেয়ে, আত্মহত্যা করেছে, 'মর্গে' চালানি দেবার নামে বেশ একটু ধমকা-ধমকি করলেই কিছু বেরিয়ে আসবে। জমাদার সাহেবের স্ত্রী নাকি অন্তঃসত্ত্বা, বাড়িতে এ মাসে মোটা রকমের টাকা পাঠান তাঁর একান্ত প্রয়োজন। সারা-রাস্তা তিনি তাই ভাবতে ভাবতে এসেছেন—আত্মহত্যা

করে মানুষ মরেছে, তার দরুন টাকা ঘুষ নিয়ে তিনি বাড়িতে পাঠাবেন, আর সেই টাকা খরচ হবে তার সন্তানের জন্মোৎসবে!— তা হোক, পুলিশে কাজ করে অতসব ভাবতে গেলে চলে না!

কিন্তু সাহেবের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, কিছু না নিয়েই তাঁকে ফিরতে হল। মৃতদেহ সৎকার করবার হুকুম দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

শীতকালের রাত। মৃতদেহ সৎকারের পর স্নান করতে হবে। তার ওপরে রাত্রে আর বাড়ি ফিরতে নেই। শ্মশানেই রাত কাটাতে হয়। সুতরাং কেউ আর বাড়ি থেকে সহজে বেরোতে চায় না!

গামছা কাঁধে লোকনাথ এসে দাঁড়াল।

দুগু ভট্চায্ লাফিয়ে উঠল—ব্যস্, কাউকে চাইনে। একজন সঙ্গী পেলে আমি একাই পুড়িয়ে ফেলতে পারি !

লোকনাথ ঘাড় নেড়ে বললে, উঁহু ভেবে দেখলাম, পোড়ান চলবে না।

সকলেই তার মুখের পানে তাকিয়ে আর কি বলে শোনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইল।—বাঁচালে বাবা! শীতকালের রাত—

লোকনাথ বললে, একে গলায় দড়ি, তায় বাসি মড়া, অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত না করলে ওর মুখাগ্নি চলবে না, আর মুখাগ্নি না করে অগ্নি-ক্রিয়া করতে দোষ আছে। তা ছাড়া যারা ওকে নিয়ে যাবে তাদেরও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!

কে যেন বলে উঠল—তাহলে দরকার নেই বাপু!

ভুবন তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মহা উৎসাহে গামছা কাঁধে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, লোকনাথের কথা শুনে মা তার দরজা থেকে ডাকলে, ওরে ও ভুবন! তাহলে চলে আয় বাবা! শুনছিস তো!

লোকনাথ বললে, শাস্ত্রে বলছে—গলরজ্জু বৃক্ষশাখায়াং ত্রিসন্ধ্যাং কালেং যদি মৃত্তিকায়াং প্রোথিতঞ্চ অগ্নিক্রিয়া নৈবচ নৈবচ।—এর পরেও যদি কেউ যেতে চায় তো যাক—আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার বিবেচনায় গ্রামের দুজন বাউরী-বাগদী নিয়ে ওকে পুঁতে ফেলাই উচিত।

এমন সময় বিকট একটা চিৎকারের শব্দে সবাই যেন চমকে উঠল। গ্রামের বাইরে থেকে চিৎকার! মনে হল যেন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর!

হঠাৎ খেয়াল হল সুবীকে আগলে সুবীর মা সেই পুকুরের ধারে একাকী এই অন্ধকারে এখনও চুপ করে বসে আছে। সেই তারই গলার আওয়াজ।

ব্যাপারটা দুগু ভট্চায্ ভাল বুঝতে পারেনি, হাঁ করে এর ওর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, কী ?

কে একজন জোরে জোরে তাকে বুঝিয়ে বললে, সুবীর মা চেঁচাচ্ছে।

এই কালা খ্যাপা মানুষটির কোথায় গিয়ে যে বাজল কে জানে, সর্বাগ্রে সে উঠে দাঁড়াল এবং আর কাউকে কোনও কথা না জিজ্ঞেস করে একাই সে সেইদিক পানে চলে গেল।

খানিক পরে, তার দেখাদেখি জন দশ-বারো গ্রামের ছোকরা— প্রত্যেকেই হাতে একটা করে লণ্ঠন নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে, পুকুরের পাড় থেকে খানিক দূরে একটা মাঠের ওপর দুগু ভট্‌চায্‌ দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর তার পায়ের কাছে সুবীর মৃতদেহ অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে।

ব্যাপার কি?

দুগু ভট্‌চায্‌ বললে, এক পাল শেয়াল এসেছিল আর দুটো বড় বড় গো-বাঘ! বাপ রে বাপ! ব্যাটারা ছাড়তে কি চায়! ওই দেখ না, পায়ের কাছটা কেমন কুরে খুবলে নিয়েছে।

দেখা গেল, সুবীর বাঁ পায়ের আঙুলগুলো এক রকম নেই বললেই হয়। তাছাড়া সর্বাঙ্গে তীক্ষ্ণ দাঁতের চিহ্ন।

মা তার তখনও একটু দূরে দাঁড়িয়ে নিজের পরিধেয় বস্ত্রটা সামলাচ্ছে। কারণ ওরই সঙ্গে প্রথমে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। এবং জন্তু জানোয়ারের মুখ থেকে কন্যার মৃতদেহটাকে বাঁচাতে গিয়ে পরনের কাপড়খানা তার একেবারে শতছিন্ন হয়ে গেছে।

লোকনাথও সেইখানে দাঁড়িয়ে। বললে, তাহলে ওই ব্যবস্থাই হোক। দুগু যখন মড়াটা ছুঁয়েছে তখন ও-ই যাক শ্মশানে, সঙ্গে আরও জন কতক বাউরী-বাগদী নিক, নিয়ে বেশ ভাল করে পুঁতে দিয়ে আসুক। অগ্নিক্রিয়া যখন হবেই না, তখন পোঁতা ছাড়া আর উপায় কী! কিন্তু শোন ভট্‌চায্‌, যেন শেয়াল কুকুরে টেনে না বের করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত তাই হল।

মা তার একটি প্রতিবাদও করলে না।

দু একদিন পরেই দেখা গেল গ্রামের খেঁকী কুকুরের দল কিসের যেন একটা মহোৎসবে লেগে গেছে। খাওয়া-খাওয়ি মারামারি করে তারা ক্রমাগত গ্রামের চতুর্দিকে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

নিবারণ বললে, মেষের পুকুরের পাশে সুবীর আস্ত একখানা হাত নিয়ে কয়েকটা কুকুরকে কামড়া-কামড়ি ছেঁড়া-ছেঁড়ি করতে সে দেখে এল। তোমাদের বিশ্বাস না হয় তো তোমরাও স্বচক্ষে দেখে আসতে পার।

তারপর শুধু হাত নয়, সেই দিনই গ্রামের ছেলে ছোকরার দল আবিষ্কার করলে যে, সুবীর মৃতদেহ শেয়ালে গো-বাঘায় মাটি থেকে টেনে তো তুলেইছে, সেই সঙ্গে হাত-পা আর পাঁজরগুলো শ্মশান থেকে মুখে করে সমস্ত গ্রামময় ছড়িয়ে চলেছে।

কুকুর দেখলেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলো বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যায় সুবীর হাড় দেখবার জন্যে। কিন্তু ফিরে তারা আর বাড়ি ঢুকতে পায় না।

মায়েরা সব হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে—খবরদার বলছি, ঘরে ঢুকিস নে। মরা মানুষের হাড় না কী ছুঁয়ে এলি—যা পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আয় গে।

কাউকে বা ডুব দিতে হয়, কেউ বা মাথায় জল ঢালে, আবার কাউকে বা মাথায় একটুখানি গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে আর কখনও সে সুবীর হাড় দেখতে যাবে না।

গ্রামের মধ্যে বয়স্ক যারা তাদের মজলিসে এই নিয়ে কথা ওঠে। বলে, সর্বনাশ হল দেখছি। এবার ঘরে ভূত নাচবে!

নিবারণ বললে, ওই শালা দুগু ভট্চায্কে যে এত করে বলে দেওয়া হল—ভাল করে পুঁতিস যাতে শেয়াল-কুকুরে না তুলতে পারে, তা শালা দিয়ে এসেছে হয়তো এমনি নাম-নাম পুঁতে, তা না হলে এমন হয় কখনও!

দুগু ভট্চায্ বললে, মাইরি বলছি, আমি একবুক গর্ত খুঁড়ে তবে পুঁতে ছিলাম। বিশ্বাস না হয় তো বল—আমি ঠাকুর ঘরে হাত দিয়ে বলতে পারি।

কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না। বলে, গ্রামের মধ্যে ভূতের ভয় যদি হয় তো শালা বুঝতেই পারবি, তোকে সুদ্ধ খণ্ড খণ্ড করে কেটে আমরা সুবীর সঙ্গী করে দেব।

ভট্চায্ কালা মানুষ, শুনতে পায় না তাই রক্ষে, নইলে তৎক্ষণাৎ একটা ফৌজদারি বেঁধে যেত।

সেদিন থেকে এমন হল যে সন্ধে হলে আর কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারে না। অপমৃত্যুতে মরা মানুষের হাড় পাঁজরা যখন গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তার প্রেতাত্মাই বা গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে না কেন ?

নবীন বললে, মাইরি বলছি, আমি কাল স্বচক্ষে দেখেছি—সুবীদের বাড়ির পাশ দিয়ে সন্ধেবেলায় বেরিয়ে যাচ্ছিলাম—আমগাছটা ঝরঝর করে নড়ে উঠল। গা-টা শিউরে উঠতেই 'রাম রাম' বলতে বলতে এগিয়ে গেলাম। রাম নাম করেছিলাম বলে ছুঁতে আমায় পারলে না, কিন্তু পেছনের পুকুরটার জলে মনে হল কে যেন ঝপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এই না শুনে গ্রামের গিরিশ চৌকিদার তো রাত্রিবেলা এ পাড়ায় হাঁক দেওয়া একদম ছেড়েই দিলে। আবালবৃদ্ধবণিতা ভূতের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। অন্ধকারে কুকুর বেড়াল দেখলেও লোকে আচমকা চেঁচিয়ে উঠতে লাগল।

সুবীর মা তো সেইদিন থেকে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, যে আমগাছে দড়ি বেঁধে মেয়ে তার মরেছিল, গভীর রাত্রে সেই আমগাছটির তলায় চুপটি করে বসে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলে, কোথায় মা, তার চিহ্নও কোনদিন দেখতে পাই নে ; বলেই সে কাঁদতে থাকে।

লোকে তা বিশ্বাস করে না। ভাবে, মাগী বুঝি মিথ্যা কথা বলছে।

লোকনাথ তাই সেদিন দুপুরে তাকে ডেকে বললে, ওগো শোন! তুমি দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছ, এদিকে তোমার মেয়ের দায়ে আমাদের গ্রামে টেঁকা ভার হয়ে উঠল দেখছি। তার চেয়ে শোন বাপু, ভাল চাও তো গয়ায় গিয়ে মেয়ের নামে একটা পিণ্ডি দিয়ে এস।

গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে সুবীর মার ছিল না, তবু তাকে জোর করে সবাই মিলে বলে কয়ে গয়ায় পাঠিয়ে দিল। বেচারা একাকিনী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল গয়ায়। মেয়ের নামে দুর্নাম রটবে তাই-বা সে সহ্য করবে কেমন করে। অথচ সে নিজে যদি তাকে একটিবার দেখতে পেত! মায়ের মন—যে মেয়ে রাগ করে চলে গেছে তাকেই সে একটিবার শুধু চোখে দেখতে চায়। শ্মশানের যে জায়গাটায় সুবীকে পোঁতা হয়েছিল, সুবীর মা সেইখানে বসে কাঁদতে লাগল। ভাবলে—না, সে গয়ায় যাবে না। ভূত হয়েও যদি মেয়েটা একবার দেখা দেয়। গয়ায় পিণ্ডি দিলে সে আশাও হয়তো আর থাকবে না! রাত্রিটা আজ সে এই শ্মশানেই কাটিয়ে দেবে। ভূত হয়েও যদি সে আসে তো একবার জিজ্ঞেস করবে, হতভাগী রাগ করে তুই কেন গেলি!

সারারাত সুবীর মা সেই অন্ধকারে শ্মশানের মাঝে বসে রইল। এদিকে গ্রামের লোক জানে সে গয়ায় গেছে।

দিন দুই পরেই গ্রামের মধ্যে আবার এক হুলস্থুল ব্যাপার!

থানা থেকে পুলিশ এসেছে। গ্রামের জনকতক ভারিক্কী মাতব্বর লোককে তারা থানায় নিয়ে যাবে। কি জন্যে নিয়ে যাবে জিজ্ঞেস করলে বলে না। বলে শুধ সেখানে গিয়ে একটা বস্তু সনাক্ত করতে হবে!

জ্বালাতন!

এই গ্রামের ওপরেই যত অত্যাচার রে বাবা!

লোকনাথ বললে, সুবীর মা ফিরে আসুক, এলেই দেখবি সব হাঙ্গামা চুকে যাবে।

কিন্তু গ্রামের লোক থানায় গিয়ে দেখে, কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা কি একটা জিনিস। ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, দেখুন দেখি চিনতে পারেন কিনা ? বলে যেই ঢাকা খুলেছে, আর চক্ষু স্থির!

সবাই দেখলে রেলের লাইনে কাটা তাল-গোল-পাকানো একটা মৃতদেহ, মুখখানা কিন্তু তখনো পর্যন্ত দেখলে চেনা যায়—সুবীর মা ছাড়া আর কেউ নয়। মানুষ বাস করা দূরে থাক, সন্ধের অন্ধকারে ও পথ দিয়ে কেউ আর সহজে যেতে চায় না, যেতে হলে এখনও গা ছম্‌ছম্‌ করে। প্রথম বৎসর ঘরের চাল গেল উড়ে, দ্বিতীয় বৎসর কাঠামোটাও গেল ভেঙে—আজকাল খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু ওর চারপাই মাটির দেওয়াল। যে আমগাছে সুবী মরেছিল, গাছটা এখনও ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর ঠিক সময়ে তার শুকনো পাতা ঝরে, কচি পাতা গজায়, মুকুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত হয়ে ওঠে, শেষে থলো থলো আম ধরে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এত যে ডানপিটে ছেলে—তা কেউ আর সাহস করে ও আমগাছটার তলা দিয়ে পেরোয় না—ও আমও কেউ খায় না—গাছের আম গাছেই পাকে।

আবার সময় হলে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যায়!

দিন দুপুরে ভূত

বুদ্ধদেব বসু

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্রাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড়ুচড়ু করে ফুটছে আলপিনের মতো। ঐ এতক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আস্তে আস্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্রামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হয়ে ছোট একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'আপনি কি ডাক্তার?'

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলাম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?'

খুব অবাক হলাম, একটু যেন খুশিও—'কী করে বুঝলে ?'

ঐ যে আপনার পকেটে বুক দেখার যন্ত্র। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন ?'

মেয়েটি এমনভাবে কথাটা বললো যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কি অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দারুণ রোদ্দুরে আবার হয়তো পনের মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা গলায় কাতরভাবে বললো, 'চলুন না যাবেন ?'

ও-সব কথায় কান না দিয়ে ট্রামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হতো সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলুম না, ট্রামটা মোড় ঘুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটরঘটর করতে করতে বেরিয়ে গেলো!

'যাবেন তো ?'

'কোথায় তোমার বাড়ি ?'

'চেতলায়—এই কাছেই!'

'কী হয়েছে তোমার মা-র ?'

'কী হয়েছে, জানি না তো। বড়ো অসুখ।'

'কদ্দিন অসুখ ?'

'অনেকদিন। ডাক্তারবাবু আপনি যাবেন তো ?'

মেয়েটির ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হলো। ভাবলুম যাই না, দেখে আসি ব্যাপারটা।

বললুম, 'চলো।'

'ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমি তো টাকা দিতে পারবো না—'মেয়েটি আরো

কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেলো।

'আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্য ভেবো না।' আমি তাড়াতাড়ি বললুম। নতুন পাশ করে বেরিয়েছি, আত্মীয়-বন্ধু মহলে ডাক-খোঁজ পড়ে মাঝে-মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশ টাকা যে-মাসে পাই, সে মাসেই খুব খুশি। এই তো এক বন্ধুর ছেলের নিরানব্বই বুঝি জ্বর হয়েছে, ট্রামের পয়সা খরচ করে এসে তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে এতোক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরলুম। তবু এই মেয়েটিই যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনলো।

হেঁটে রওনা হলাম মেয়েটির সঙ্গে কালিঘাট পুলের দিকে। জিজ্ঞেস করলুম, তোমার মাকে আর কোনো ডাক্তার দেখেননি?'

'ডাক্তার? না। বলেন, ডাক্তার দিয়ে কী হবে, এমনিই আমি ভালো হবো। টাকা পাবো কোথায়—'

'তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে? আর কেউ নেই তোমার বাড়িতে?'

'নাঃ, কে আর থাকবে !এক দাদা ছিলো আমার, সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেলেই কাটা পড়লো! সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা-এর মধ্যে কেন অসুখ করলো মা-র? ডাক্তারবাবু, মা কদ্দিনে ভালো হবেন?'

আমি ডাক্তারি ধরনে হেসে বললুম, 'সে এখন কী করে বলি?'

'ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হয়ে আছেন—একবারও চোখ মেলে তাকান না। দেখুন, বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এতোদূরে এসেছি, যদি কোনো ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার ওপর কোনো ডাক্তার দয়া করেন। ঐ তো সব ওষুধের দোকান, ভেতরে পাৎলুন-পরা ডাক্তার বসে—আমার তো সাহস হয় না ভেতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক ওদিক কেবলই ঘুরছি এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হলো আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ি—কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা—ছি, ছি, এটা কী বললুম ! আপনারা কেন গরিবের বাড়িতে খেতে আসবেন—ডাক্তারবাবু, আপনার দয়া আমি কোনোদিন ভুলবো না।

'ডাক্তারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'কিছু না। চলো।'

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালীঘাট পুল পর্যন্ত আসতে আসতেই মনে হতে লাগলো এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কত গরিব-দুঃখী আছে, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে না খেয়ে, তাদের সবার উপকার করতে গেলে নিজেরই—

পুল থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলুম, 'আর কতোদূর?'

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মেয়েটি বললো, 'এই তো—আর একটুখানি। আমার পয়সা নেই, তাহলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ি করে নিতুম। ওঃ, কতো কষ্ট হলো আপনার!'

'বাঃ, এইটুকু হাঁটতে পারবো না!'

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনোদিন আর আসিনি—সত্য বলতে জায়গাটা ঠিক কলকাতা নয়! একেবারে পাড়াগাঁ, পুকুর, বনজঙ্গল, কিছু পাকা বাড়ি, কিছু বা খড়ের ঘর। একটা অতিজীর্ণ শ্যাওলা-ধরা খসে-পড়া একতলা পাকা বাড়ির সামনে মেয়েটি এসে বললো, 'এই।'

ভিতরে ঢুকে দেখি, মেঝের উপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাড় হয়ে শুয়ে। চোখ তার আধো-বোজা, খানিক পর-পর নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলে, 'মা, মা।'

কোনো জবাব এলো না।

'মা মা, তোমার জন্যে ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে দেখো। মা, এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভালো করবেন!'

চোখ দুটো একবার পলকের জন্য খুলেই আবার বুজে এলো। একখানা হাত বুঝি একটু ওঠাবার চেষ্টা করলো, অস্ফুট একটা আওয়াজ হয়তো বেরুলো গলা দিয়ে।

মেয়েটি বললো, 'ডাক্তারবাবু, ভালো করে দেখুন, মাকে আজই ভালো করে দিন।'

কিন্তু কিছু দেখবার ছিলো না। আর একটু পরেই নাভিশ্বাস শুরু হবে। তবু আমরা সব সময় একবার শেষ চেষ্টা করে থাকি।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি একটু বসো, আমি আসছি।

মেয়েটি বললো, 'ডাক্তারবাবু, আপনি আবার আসবেন তো ? আমার মা ভালো হবেন তো ?'

'এক্ষুনি আসছি ওষুধ নিয়ে' বলে আমি বেরিয়ে গেলুম।

ফেরার সময় রাস্তাটা বোধহয় কিছু গোলমাল হয়েছিলো। একটু ঘুরপথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। রোদ্দুরে ছোটাছুটি করে তখন আমি কানে পিঁ-পি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাক্তারের নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার তখন সময় নয়। ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিলো না, কে জানে গিয়ে কী দেখবো। দরজাটা খোলা দেখে ঢুকলুম কিন্তু ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম!

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম ? না, ঐ তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, ঐ দুটো সুপরিগাছ। দেড় ঘণ্টা আগে এই ঘরটাতেই তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু মেয়েটি কোথায় ? তার মুমূর্ষু মা-ই বা কোথায় গেলো ? ঘরের জিনিসপত্র কমই ছিলো, কিন্তু সে-কটাও দেখছিই না।

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই মারা গেলো, আর ওর মাকে নিয়ে চলে গেলো কেওড়াতলাতে ? এতো অল্প সময়ের মধ্যে কী করে তা হতে পারে? ঘরে কিছ জিনিসপত্র ছিলো, একটা লণ্ঠন, দু-একটা থালা-বাটি, সেগুলো ?

আস্তে-আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল...মনের ভুল ? এই রোদ্দুরে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেলো ? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে, আমার ইন্‌জেকশন, সব ঠিক আছে। নাকি আমি পথ ভুল করে ভুল বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি ?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি, মাথার উপরে যে আগুন ঝরছে সে খেয়ালও নেই। চারিদিক ছবির মতো চুপচাপ। হঠাৎ দেখি টাকপড়া একটি আধ-বয়সী লোক আমার পাশে এসে তখন দাঁড়িয়েছে। কোনোখানে কেউ ছিল না, লোকটা যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো। তার দিকে তাকাতেই সে বললো, 'কী মশাই, বাড়িখানা কিনবেন নাকি ?'

—'আপনার বাড়ি বুঝি?'

লোকটা ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আইনত আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে ? কোথাকার এক বিধবা পিসী, জন্মে দুবার চোখেও দেখিনি মশাই—সংসারে কেউ কোনোখানে নেই—আইনের প্যাঁচে ঘুরতে-ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়লো আমারই ঘাড়ে। আর বলেন কেন—এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ ! পিসে টেঁসলেন তিরিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেলে কাটা পড়লো, পিসী তখন স্বগগে গেলেন, ভাবলুম ভালোই হলো। একটা মেয়ে ছিলো—'হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম সুরে লোকটা বললো, 'ও-সব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।'

আমি কথা বলার জন্য হাঁ করলুম কিন্তু আমার গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোবার আগেই লোকটা বলে চললো, 'ঐ তো একফোঁটা বারো বছরের মেয়ে, তা মা-টা যেদিন অক্কা পেলো, পরের দিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়লো ! একখানাই শাড়ি ছিলো পরনে সেটা দিয়ে কর্ম সারলো। কী ডেঁপো মেয়ে মশাই—থাকলে আমরা একটা বিয়ে-টিয়ে দিতুম, বাড়িখানা ছিলো তিনপুরুষের, একরকম চলে যেতো। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা মশাই, হ্যাঁ। ভূত না হাতি! আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনি বলুন, ও-সব কথায় কি কান দিতে আছে! নিতে চান তো খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা—আচ্ছা হরেদরে চারশোই দেবেন, যান। জলের দরে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইলো, আপনি ইচ্ছেমতো বাড়ি তৈরী করে নেবেন।

অতি ক্ষীণস্বরে আমি জিগ্যেস করলুম, 'কদ্দিনের কথা এটা ?'

'কোনটা ? এই পিসীর—তা দু'বছর হবে। পিসীর জন্য কোনো ভাবনা ছিলো না মশাই, মেয়েটার জন্য বাড়িটার এমন বদনাম হয়েছে যে পাঁচ টাকাতেও কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো গুণতে হচ্ছে আমাকেই! কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারিনে, উগরোতেও পারিনে। আমি গরিব মানুষ, আমার ওপরে এ জুলুম কেন ? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়, রোজ এসে যে তদ্বির করবো তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে—আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন—বলুন না।'

মণ্টির মা

নরেন্দ্র দেব

মণ্টির বয়স যখন সবে চার পাঁচ বছর সেই সময় মণ্টির মা মারা গেলেন। মাকে হারিয়ে মণ্টি বড়ই কাতর হ'য়ে পড়্‌ল। তাকে সবাই বোঝাতে লাগ্‌ল যে, তার মা মামার বাড়ী বেড়াতে গেছে—শীগ্‌গীরই ফিরে আস্‌বে। মণ্টি কিন্তু কারুর কথাই শোনে না কেবলই মার জন্য কাঁদে ; কেবলই বলে, মার কাছে যাবো ; মা কোথা গেল ? আমার মাকে এনে দাও ?

মণ্টির বাবা মণ্টিকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়্‌লেন। সমস্ত দিন তাঁর আর কোনও কাজকর্ম নেই, কেবল ছেলেকে নিয়ে থাকতে হয়। রোজ বিকেলে তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হয়। কোনও দিন বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন বা মিউজিয়াম ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। এমনি ক'রে দিনগুলো একে একে কাট্‌তে লাগ্‌ল বটে, কিন্তু রাত্রি আর কাট্‌তে চায় না।

রাত্রে বাপের কোলের কাছটিতে ঘেঁসে শুয়ে বাপের গলা জড়িয়ে ধরে মণ্টি যতক্ষণ না ঘুমোবে ততক্ষণ কেবলই তার মায়ের কথা কয়। হ্যাঁ বাবা, মা কবে মামা বাড়ী থেকে আস্‌বে ? চলনা বাবা, তুমি আমি দু'জনে মামার বাড়ীতে গিয়ে মাকে নিয়ে আসি। মার জন্যে যে আমার বড় মন কেমন ক'রছে! এমনি ক'রে প্রতিদিন মণ্টি যখন তার মার কথা তুলে তার বাবাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুল্‌তো, মণ্টির মার জন্যে মন্টির বাবারও প্রাণটা কেঁদে উঠতো। চুপি চুপি পাশ ফিরে কোঁচার কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলে মণ্টির বাবা বলতেন "তুমি এখন ঘুমোও, কাল তোমাতে আমাতে গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে আস্‌বো।"

এমনি ক'রে আর ক'দিন চলে! মণ্টি ক্রমেই মার জন্যে হেদিয়ে উঠ্‌তে লাগল, কিছু খেতে চায় না ; কোথাও যেতে চায় না, খেলাধুলো করাও ছেড়ে দিলে। দিনরাত মুখ শুকিয়ে বেড়ায়। আর তেমন ক'রে হাসে না, দিনদিন সে রোগা হ'য়ে যেতে লাগল।

মণ্টির অবস্থা দেখে তার বাবার বড় ভাবনা হ'লো— তাইতো ছেলেটার জন্যে কি করা যায়। শেষে তিনি একদিন চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে দিয়ে মণ্টির এক মাসীমাকে নিয়ে এলেন। মণ্টির মাসীমা এসে আদরযত্নে মণ্টিকে অনেকটা

ঠাণ্ডা ক'রে ফেললেন। মাসীমাকে পেয়ে মণ্টি আস্তে আস্তে তার মার কথা ভুলে যেতে লাগল, ক্রমে মাসীমাই মণ্টির কাছে সর্বস্ব হ'য়ে উঠ্‌ল।

যে সব স্নেহের দাবী দাওয়া অত্যাচার সে তার মার উপর ক'রতো, তার সেই সব আব্দার এখন মাসীমাকেই শুনতে হয়। মণ্টির বাবা যখন দেখলেন যে, ছেলে তার মাসীকে পেয়ে মায়ের অভাব তো ভুলেছেই, এমন কি বাপকে সুদ্ধ আর চায় না, তখন তিনি আবার নিজের কাজকর্মে মন দিলেন। এমনি করে আরও তিন চার মাস কেটে গেল।

কিন্তু মাসী তো তাঁর বাড়ী ছেড়ে চিরকাল মণ্টিদের ওখানে থাকতে পারবেন না—তাঁকে এইবার চলে যেতে হবে। তিনি মণ্টির বাবাকে ডেকে ব'ললেন, "দেখ, আমার ত আর থাকবার সময় নেই ; অনেকদিন হলো এসেছি, এইবার আমায় ফিরতেই হবে, কিন্তু মণ্টির সম্বন্ধে কি করা যায় বলো তো ? ও তো আমায় একদণ্ডও ছাড়তে চায় না, তা আমি কি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো ? মণ্টির বাবা ব'ললেন, "তা হলে আমি আর এ বাড়ীতে একদণ্ডও থাক্‌তে পারবো না। মণ্টি চলে গেলে আমি বাঁচবো না।"

মণ্টির মাসী হেসে ব'ললেন, "তা হ'লে ছেলেকে একটি তার মনের মতন 'মা' এনে দাও, তা হ'লেই সে বেশ থাক্‌বে।"

মণ্টির বাবা ব'ললেন, "সে এখন আমি কোথায় পাবো ? তার চেয়ে মণ্টির দিদিমাকে দেশ থেকে আন্‌তে পাঠাই না কেন ? তিনি তো একলাটি সেই পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পড়ে আছেন। তাঁকে নিয়ে আসি, এখানে থাক্‌বেন আর তাঁর নাতীকে দেখবেন শুন্‌বেন।"

মণ্টির মাসী ঘাড় নেড়ে বললেন, "তিনি আর এ বাড়ীতে ঢুকবেন না। যে বাড়ীতে তাঁর মেয়ে মারা গেছে, সে বাড়ী তিনি আর মাড়াবেন না, তা ছাড়া দেশের বাড়ীতে তাঁর আর কেউ নেই যে সন্ধ্যের সময় তুলসী তলায় একটা প্রদীপ জ্বেলে দেবে। তিনি সে ভিটে ছেড়ে আর কোথাও ন'ড়বেন না।"

মণ্টির বাবা ব'ললেন, "তবেই ত মুস্কিল! তা হ'লে এখন উপায় কি ?"

মণ্টির মাসী ব'ললেন, "একমাত্র এর সহজ উপায় হ'চ্ছে যে, তুমি আবার একটি বিয়ে ক'রে নতুন বউ নিয়ে এসো, সে এসে, মণ্টির মা হবে!"

মণ্টির বাবা ব'ললেন, "তুমি আর কিছুদিন থাকো, আমি ভেবে দেখি।"

মণ্টির বাবা যেদিন আবার একটি বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এলেন, মণ্টির মাসী তার কাছে মণ্টিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বউ, এই তোমার ছেলে, একে মানুষ করবার ভার এখন তোমাকেই নিতে হবে!" মণ্টিকে ব'ললেন, "মণ্টি এই তোমার নতুন মা, খুব লক্ষ্মীছেলের মতন এঁর কাছে থাক্‌বে। ইনি তোমায় খুব আদরযত্ন. করবেন, খুব ভালোবাসবেন।"

মণ্টি তার নতুন মার মুখের দিকে অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। নতুন মা হেসে হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকলেন। মণ্টির এই নতুন মা'টিকে বেশ পছন্দ হলো, সে ছুটে গিয়ে একেবারে তার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি আমার মা?" নতুন মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বল্‌লেন, "হ্যাঁ!" মণ্টির মাসী এদের দু'জনের এই সদ্ভাব দেখে বেশ খুশী হ'য়ে নিজের বাড়ী ফিরে গেলেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই, মণ্টির নতুন মা মণ্টিকে বড় অযত্ন ক'রতে আরম্ভ করলেন! মণ্টি একটু কিছু দুষ্টুমি ক'রলেই তিনি মণ্টিকে ধরে খুব মারধোর ক'রতেন। মণ্টির বাবা কাজকর্ম থেকে ফিরে এলেই মণ্টি তাঁর কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ব'লে দিত। মণ্টির বাবা প্রথম প্রথম মণ্টির দিকে হ'য়ে তার নতুন মাকে খুব ব'ক্‌তেন এবং মারধোর ক'র্‌তে বারণ করতেন। এতে কিন্ত আরও উল্টো ফল হতো। মণ্টির বাবা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই, মণ্টির নতুন মা তাকে আরও বেশী ক'রে শাসন ক'রতেন। পেট ভরে তাকে খেতে দিতেন না, কথায় কথায় উঠ্‌তে বস্‌তে দাঁত খিঁচুতেন। খুব মেরে ধরে ঘরের ভিতর সমস্ত দিন চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিতেন। মণ্টি বেচারী কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়তো।

একদিন সে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখ্‌লে যে, তার পুরোনো মা এসে যেন তাকে ব'লছেন, "মণ্টি. আয় আমার সঙ্গে তোর মামার বাড়ী গিয়ে থাক্‌বি। এখানে আর থাকিস নি।" মণ্টি ঘুম ভেঙে উঠে তাড়াতাড়ি 'মা মা' বলে ডেকে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে দে'খলে, ঘরের দোর বাইরে থেকে বন্ধ করা রয়েছে। সে তখন ভয়ানক চেঁচামেচি ক'রতে লাগল, দরজায় লাথী মারতে লাগল! তার নতুন মা তার এই কাণ্ড দেখে ভয়ানক রেগে এসে দরজা খুলে তাকে টেনে বার ক'রে মারতে মারতে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মণ্টি বাড়ীর সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল দে'খে তিনি সদর দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে উপরে চলে গেলেন। মণ্টি দোরের ধারে চৌকাঠের উপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌ল, "ও মা! দোর খুলে দাও! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি দুষ্টমি ক'রবো না!"

কিন্তু কেউ তাকে দরজা খুলে দিলে না। তখন ঠিক দুপুরবেলা, রাস্তায় লোকজনও কেউ চল্‌ছিল না। বেচারী একলাটি সেইখানে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে রাস্তার ধারেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মণ্টির যখন ঘুম ভেঙে গেল, সে জেগে উঠে দেখলে যে, তার সেই পুরোনো মায়ের কোলে সে শুয়ে রয়েছে। আহ্লাদে গদগদ হ'য়ে সে তার মার গলা জড়িয়ে ধরে ব'ললে, "মা তুমি এসেছো! এতদিন কোথায় ছিলে? তুমি আমার লক্ষ্মী-মা। নতুন মা বড় দুষ্টু। আমি তোমার কাছে থাক্‌বো।"

মণ্টির মা বললেন, "সেইজন্যেই তো তোমাকে আজ নিতে এসেছি। চল—

তুমি আমার সঙ্গে চল।" মণ্টি আনন্দে নাচ্‌তে নাচ্‌তে তার মার হাত ধরে এগিয়ে চল্‌ল।

মার সঙ্গে গিয়ে মণ্টি ট্রামে উঠ্‌ল। ট্রাম হ্যারিসন রোড দিয়ে বরাবর হাওড়ার দিকে চলল। হাওড়ার পোলের সাম্‌নে ট্রাম থেকে নেমে সে মার হাত ধ'রে হাওড়ার পোল পার হয়ে গেল। মণ্টি এর আগে আর কখনো হাওড়ার পোল দেখে নি। পায়ের নীচেয় গঙ্গার অগাধ জল। তার উপর এই প্রকাণ্ড পোল ভাসছে। পোলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে মণ্টির খুব আহ্লাদ হচ্ছিল, আবার ভয়ও হ'তে লাগল, যদি সে পা ফস্কে জলে পড়ে যায়, তা হলে নিশ্চয় ডুবে যাবে! সে মার খুব কাছে ঘেঁসে তাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে চলল। পোল পার হয়ে তারা হাওড়ার ষ্টেশনে এসে রেলগাড়ী চড়লে। রেলগাড়ী চ'ড়ে মণ্টির কি ফুর্তি! রেলে চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেল! মণ্টির মা মণ্টিকে কত কি খাবার দাবার কিনে খাওয়ালেন। খেয়ে দেয়ে সে মার কোলাটিতে মাথা রেখে শুয়ে গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোররাত্রে যখন মণ্টির ঘুম ভাঙ্‌ল তখন মা'য়ে পোয়ে তারা গরুর গাড়ী ক'রে শুকপুর গ্রামের পথ দিয়ে চলেছে। মণ্টি জিজ্ঞাসা করলে, "মা, এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?" তার মা ব'ললে, "তোমার মামার বাড়ীতে, এ জায়গাটার নাম শুকপুর। তোমাকে আমি তোমার দিদিমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" মণ্টির একথা শুনে ভারি আনন্দ হ'ল। অনেকদিন সে দিদিমাকে দেখে নি। দিদিমা তাকে কত আদরযত্ন করবেন, কত ভালোবাসবেন। শুকপুরে সে নিশ্চয় সুখে থাক্‌বে। সকালবেলা সূর্য ওঠবার আগেই তাদের গরুর গাড়ী একখানি সুন্দর পরিষ্কার কুটীরের সামনে এসে দাঁড়াল। মণ্টির মা মণ্টির হাত ধ'রে তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে তাকে বিদেয় ক'রে দিলেন। তারপর মণ্টিকে সেই কুটীরের বন্ধদ্বারের কাছে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তোর দিদিমাকে ডাক, দরজা খুলে দেবেন। আমি ততক্ষণ ঐ পুকুর ঘাটে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে আসি।"

খোকার ডাকে তার দিদিমা এসে দরজা খুলে দিয়ে খোকাকে দেখে অবাক্! বললেন, "একি! মণ্টি! তুই এমন সময় একলাটি এখানে কার সঙ্গে এলি?" মণ্টি বললে, "কেন, আমি তো মার সঙ্গে এলুম!"

মণ্টির কথা শুনে দিদিমা চম্‌কে উঠলেন—সে কি? খোকা এ কি বলছে? তার মা যে আজ একবৎসর হ'তে চলল মারা গেছে। তবে ও কার সঙ্গে এলো? বোধ হয় ওর বাবা আবার যে বিয়ে ক'রেছে সেই বউয়ের সঙ্গে এসেছে। তিনি মণ্টিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন, "ওঃ তুই বুঝি তোর নতুন মার সঙ্গে এসেছিস? কই সে মেয়ে কোথা গেল? মণ্টি সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে, "না গো না—নতুন মা নয় দিদিমা, আমার মা! আমার নতুন মা বড় দুষ্টু, সে আমাকে

আস্‌তে দিতো না। আমার পুরোনো মা আমাকে নিয়ে এসেছে। মা আমাকে দরজা ঠেলে তোমাকে ডাক্‌তে ব'লে ওই সামনের পুকুরে হাতমুখ ধুতে গেছেন।" মণ্টির দিদিমা কথাটা শুনে আশ্চর্য হ'য়ে ব'ললেন, "কই কোন্ পুকুরে গেল চল তো দেখি।" মণ্টি মহা উৎসাহে তার দিদিমাকে নিয়ে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না। তখন তার দিদিমা মনে করলেন, ছেলেমানুষ! মাকে হয় তো ঠিক চিন্‌তে পারে নি, গ্রামের অন্য কোনও বউ-ঝিয়ের সঙ্গে এসেছে হয় তো! তাই বল্‌ছে, মার সঙ্গে এসেছি। তিনি বললেন, "আচ্ছা, চল্ ঘরে চল্, সে এখুনি আসবে বোধ হয়।"

দিদিমার শোবার ঘরে ঢুকে মণ্টি দেখলে দেওয়ালে তার মার একখানি বাঁধানো ফটোগ্রাফ ঝুলছে। মণ্টি বললে, "ঐ যে আমার মার ছবি রয়েছে, ওই মাই তো আমায় নিয়ে এল।" মণ্টির দিদিমা তার কথা শুনে অবাক! শেষে সমস্ত শুনে তিনি ব'ললেন, "আহা! মেয়েটা মরেও ছেলের মায়া ভুলতে পারে নি! ছেলেটার সেখানে বড়ই কষ্ট হচ্ছে দেখে নিজে সঙ্গে করে এনে আমার কাছে দিয়ে গেল।"

এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে একটা খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। কেউ কেউ ব'ললে, "ওটা আগাগোড়াই মিছে কথা। মণ্টির মা আজ প্রায় পনেরো মাস হলো মারা গেছেন, তিনি ওকে নিয়ে আসবেন কি ক'রে?" কিন্তু মণ্টির দিদিমা ব্যাপারটা ঠিক অবিশ্বাস করতে না পেরে, মণ্টির বাবাকে খবর দেওয়া উচিত ভেবে তাকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তার জবাব এলো যে, সত্যিই সেদিন মণ্টিকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। সে বাড়ীর দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেট পর তাকে আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি। তারপর আজ তিনদিন হ'ল তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনার চিঠি পেয়ে খোকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু মণ্টির মার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সেটা কি ঠিক? দিদিমা লিখ্‌লেন তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়, সত্যিই মণ্টির মার প্রেতাত্মা তোমাদের কাছে ছেলের কষ্ট দেখতে না পেরে নিজে আবার পূর্বরূপ ধারণ করে তাকে ওখান থেকে এখানে এনে দিয়ে গেছে!

মণ্টির বাবা এ চিঠি পেয়ে মণ্টির নতুন মাকে বললে, "এ সব বাজে কথা" মানুষ মরে গেলে আর ফিরে আসে না। এ সব ঐ বুড়ির চালাকি!"

আয়না

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

মাস তিনেক আগে সন্ধ্যার পর বউবাজার স্ট্রীটের একজন বন্ধুর ফার্নিচারের দোকানে বসে গল্প করছিলাম। উত্তর দক্ষিণে লম্বা দোকানটির বেশির ভাগ জায়গা সরোজ গুদামের কাজে লাগিয়েছে। নানা প্যাটার্নের খাট, চেয়ার, আলমারিতে সেই গুদাম ভরতি। দোরের সামনে যে অল্প একটু জায়গা রয়েছে, সেখানে ছোট একটি টেবিল। সরোজের কাউন্টার। আমরা সেই টেবিলের ধারে দু'খানা চেয়ারে পাশাপাশি বসে সুখ দুঃখের কথা বলছিলাম।

বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। ফোঁটা কখনো ছোট, কখনো বড়। বৃষ্টিটা একটু জোরে শুরু হতেই সরোজ দোর বন্ধ করে দিল। বলল, 'কাণ্ড দেখ! এক ঝাপটায় সব ভিজিয়ে ফেলল। কার্তিকের শেষে এমন বদরসিক বৃষ্টি আর দেখেছ!

বন্ধুর সেই বিরক্তিটুকু আমি উপভোগ করলাম। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এবার যাই।'

কিন্তু সরোজ জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বসাল, একটু ধমকের সুরে বলল, 'এসেই তো যাই যাই করছ! ন'মাসে ছ'মাসে একবার দেখা হয়, যদি দু-দণ্ড বসতেই না পার, তবে আস কেন?' তারপর হেসে নরম গলায় বলল, 'বসো আর একটু। মন-মেজাজ খুব খারাপ। যা ওয়েদার চলছে, তাতে কবে যে ফের খদ্দেরের মুখ দেখব, কে জানে!'

বললাম, 'তোমার গলায় সত্যিই বিরহের সুর ফুটছে।'

আমার কথা শেষ না হতেই দরজায় টোকা পড়ল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'দেখ, তোমার খদ্দের বোধ হয় এবার একজন এলেন।'

সরোজ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আসুন দোর খোলাই আছে।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দরজা ঠেলে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। আমি একট চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালাম। ভদ্রলোকের বয়স বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। বেশ সুপুরুষ। গৌরবর্ণ চেহারা। নাক-চোখ টানা-টানা। শুধু সুপুরুষই নয়, ভদ্রলোক বেশ সৌখিন। গায়ে গরদের পাঞ্জাবি। পরনে মিহি কোঁচানো ধুতি। এইটুকু পথ আসতেই বেশ একটু ভিজে গেছেন।

এমন একজন সুদর্শন পুরুষকে দেখেও আমার বন্ধু সরোজ খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। বরং তাকে যেন একটু অপ্রসন্নই দেখাল।

সরোজ গম্ভীর স্বরে বলল, 'বসো নিরঞ্জন। এই বৃষ্টি-বাদলের দিনেও বেরিয়েছ?'

এতক্ষণ ভদ্রলোককে বেশ স্বাভাবিক সপ্রতিভ অবস্থায় দেখেছিলাম। কিন্ত সরোজের ওই সাধারণ একটি প্রশ্নে তিনি যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। যেন কি একটা গোপন অপরাধ তাঁর ধরা পড়ে গেছে। চোখে মুখে ঠিক তেমনি এক ধরনের

নার্ভাস ভাব ফুটে উঠল।

তিনি যেন একটা অভিযোগের প্রতিবাদ করছেন তেমনি ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ, বেরিয়েছি। কি এমন ঝড়-ঝাপটা হচ্ছে যে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না! আমার এদিকে কাজ ছিল, তাই বেরিয়েছি।'

সরোজ একটু হাসতে চেষ্টা করে বললে, 'বেশ করেছ। দরকার থাকলে বেরোবে বৈকি! আমরা কি বেরোই না! বসো, ভাল হয়ে বসো।'

কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের মধ্যে যেন কিসের একটা চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়েছে। তিনি তাকে জোর করে চাপতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতে পেরে উঠছেন না। মনে হল, তিনি যেন একবার উঠে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না পেরে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। যেন জোর করে তাঁকে কেউ উঠতে দিচ্ছে না, তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখছে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে কেমন যেন একটা অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হল।

তারপর হঠাৎ তিনি বললেন, 'সেই আয়নাখানা কোথায়? বিক্রি হয়ে গেছে?'

সরোজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি জানতুম, তুমি এ কথাটি ঠিক জিজ্ঞেস করবে। তুমি এর জন্যেই এসেছ।'

ভদ্রলোক ফের প্রতিবাদের সুরে বললেন, 'এর জন্যেই এসেছি? আশ্চয তোমাদের ধারণা। আমার একটা জিনিস তোমাকে বিক্রি করতে দিয়েছি, সেটা তুমি বিক্রি করলে কি করলে না জিজ্ঞেস করলেই তা দোষের হয়ে গেল?'

সরোজ শান্তভাবে বলতে চেষ্টা করল, 'আমি কি বলছি দোষের! তুমি এত চটছ কেন? সত্যিই তো, তোমার জিনিসের কথা তুমি একবার কেন, হাজার বার জিজ্ঞেস করতে পার, তাতে কিছুই দোষের নেই। ওই তো তোমাদের সেই ড্রেসিং টেবিলটা রয়েছে। এখনো বিক্রি করতে পারিনি। ভেবো না, দরদাম হচ্ছে, একদিন বিক্রি হয়ে যাবে।'

'আমার ভাববার কি আছে।'

বলে ভদ্রলোক চেয়ারে চেপে বসে রইলেন। তারপর যেন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়লেন। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালেন ড্রেসিং টেবিলটার সামনে। এতগুলি ফার্নিচারের মধ্যে আমি সেই টেবিলটাকে এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। তিনি গিয়ে দাঁড়াতে এবার ড্রেসিং টেবিলটা আমার চোখে পড়ল। দেখলাম, টেবিল-আয়নাখানা সত্যিই বেশ সুন্দর। আগেকার আমলের বার্মাটিকে তৈরি। কালো পালিশ। আয়নাখানা বেশ পুরু আর স্বচ্ছ। আমি ফার্নিচার ডিলার নই। এসব জিনিস তেমন ব্যবহারও করিনে। তবু বুঝতে পারলাম, জিনিসটা বেশ দামী। আজকাল এ জিনিস খুব সুলভ নয়।

কিন্তু আয়নার মধ্যে ভদ্রলোকের মুখের যে ছায়া পড়েছে, তার দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। বলতে লজ্জা নেই, আঁৎকে উঠলাম। এমন বিবর্ণ ভীত মুখ আমি আর দেখিনি। ভদ্রলোক আয়নার মধ্যে কি দেখছিলেন জানিনে, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার মনে হল যেন তিনি আর আমাদের জগতের কেউ নন, কোন এক অলৌকিক লোকের অধিবাসী। ভয় জিনিসটা বোধ হয়

সংক্রামক। নইলে তাঁর ভয় আমাকে এমন ভয়ার্ত করে তুলবে কেন?

আমি সরোজকে ওঁর কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, দেখি সে ততক্ষণে উঠে গিয়ে ভদ্রলোকের একটা কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরেছে। আমি তার গলা শুনতে পেলাম, 'নিরঞ্জন, নিরঞ্জন!'

ভদ্রলোক ফিরে এবার তাকালেন, অস্ফুট স্বরে বললেন, 'কি বলছ?'

সরোজ ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'বলছি কি, তুমি এবার বাড়ি যাও। তোমাকে আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বেশ রাত হয়ে গেছে। মাসিমা তোমার জন্যে ভাবছেন, বরানগর তো এখানে নয়। যেতেও তো সময় লাগবে। যাও এবার।'

ভদ্রলোক শান্ত বাধ্য ছোট ছেলের মত বললেন, 'হ্যাঁ, যাই, যাই। সত্যি, রাত হয়ে গেছে। আমি খেয়াল করিনি।'

তিনি এবার দরজার দিকে এগোতে লাগলেন। কিন্তু দু'পা যেতে না যেতে আবার ফিরে এসে আমার বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, 'সরোজ!'

সরোজ কোমল স্বরে বলল, 'বল।'

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তুমি বরং আয়নাটা আমাকে ফেরৎই দাও। আমি ওটাকে বাড়ি নিয়েই রাখি। সেই আসতে তো আমাকে হবেই—'

তিনি একটু হাসলেন। সে হাসি যেমন করুণ, তেমনি বিষণ্ন।

সরোজ বলল, 'কি যা তা বলছ? এবার বাড়ি যাও তো তুমি! মাসিমা তোমার জন্য ভাবছেন। শিগগির যাও।'

বলতে বলতে সরোজ তাঁকে একরকম জোর করেই ঘর থেকে বের করে দিল।

আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'ব্যাপারটা কি সরোজ?'

জন দুই পালিশওয়ালা ভিতরের দিকে বসে কি কাজ করছিল, সরোজ আমার কথার জবাব না দিয়ে তাদের ধমকে উঠল, 'আচ্ছা, ফটিক, মুকুন্দ, তোমাদের কতদিন বলিনি, টেবিলটা সামনে না রেখে, ভিতরের দিকে কোথাও লুকিয়ে রেখ? আমার কথা গ্রাহ্য হয় না, না?'

পালিশওয়ালাদের একজন বলল, 'আজ্ঞে ছোটকর্তা, ভেতরেই তো ছিল। একজন খদ্দের নেবেন বলে গেলেন, তাই বাইরে এনে পালিশটালিশ করে রেখেছি। কই, তিনি তো আর এলেন না!'

দ্বিতীয় পালিশওয়ালাটি বলল, 'খোঁজ নিয়ে দেখুন তাঁর আসবার অবস্থা আছে কিনা! নাকি বেনেপুকুরের মধুবাবুর মত তাঁরও এতক্ষণে হয়ে গেছে।'

সরোজ ফের ধমক দিয়ে উঠল, 'কি যা তা বাজে কথা সব বলছ! নিজেদের কাজ করো তো!'

প্রথমজন বলল, 'আমাদের ধমকান আর যাই করেন ছোটকর্তা, আয়নাটাকে আপনি ঘর থেকে বিদায় করুন। কাউকে বিনি পয়সায় বিলিয়েও যদি দিতে হয়, তাও দিন আপনি। নইলে কবে যে আবার কি ঘটবে—'

সরোজ বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ, ফের ওইসব কথা! তোমাদের মত

Superstitions লোক নিয়ে কাজকর্ম করাই মুশকিল।'

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'সরোজ, ব্যাপারটা কি?'

সরোজ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের। নিরঞ্জনের যে এমন পরিণতি হবে, তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, ওর মত sane আর sober ছেলে আমাদের দলের মধ্যে আর দুটি ছিল না।

বললাম, 'হঠাৎ কেন এমন হল?'

সরোজ বলল, 'ঠিক হঠাৎ একদিনে হয়নি। আর একটা কারণেই যে অমন হয়েছে তাও আমার মনে হয় না। তবু শেষের ঘটনা যে সবচেয়ে গুরুতর, তা মানতেই হয়। কিন্তু তোমাকে গোড়া থেকে না বললে কিছু বুঝতে পারবে না।'

বললাম, 'হ্যাঁ, গোড়া থেকেই বল।'

সরোজ তখন কাহিনীটা বলল : 'নিরঞ্জন হালদার সম্পর্কে আমার মাসতুতো ভাই। কিন্তু আত্মীয়তার চেয়ে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কটাই আমার বড় ছিল। আমরা এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি। কলেজেও এক সঙ্গে ঢুকেছিলাম। আমি বছর দুই যেতে না যেতেই বেরিয়ে আসি। আর নিরঞ্জন ডিস্টিংশনে বি. এ. পাশ করে। মেসোমশাই ছিলেন নাম করা অ্যাটর্নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল নিরঞ্জন ল' পড়ে। কলেজে ভর্তিও হয়েছিল। কিন্তু মাস ছয়েক বাদেই ছেড়ে দিল। বলল, 'দূর, ভাল লাগল না!' এই নিয়ে মেসোমশাইয়ের সঙ্গে ওর সামান্য ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল। কিন্তু সে এমন বেশি কথা নয়, তিনি ছেলেকে খুবই ভালবাসতেন। একটা কড়া কথা বলে তিনি তিনবার গিয়ে পিঠে হাত বুলোতেন। কিন্তু এত আদরযত্ন সত্ত্বেও নিরঞ্জন বিগড়ে গেল। বিরাজ গাঙ্গুলী বলে নিরুর এক পিসেমশাই ছিলেন। ও তাঁর খপ্পরে পড়ল। নিরুর পিসিমা অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। বিরাজবাবু আর বিয়ে করেননি। কিন্তু আর সবই করেছেন। জীবনটাকে উড়িয়ে-পুড়িয়ে না দেখলে তার রসটা পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায় না, এই ছিল তাঁর বাণী। নিরু তাঁর মন্ত্রশিষ্য হল। তাঁর সঙ্গে শেয়ার মার্কেটে যায়, রেসের মাঠে যায়, ফিরে এসে বসে পড়ে। খরচটা পিসেমশাই জোগান। কিছুদিন মেসোমশাই রাগ করে, অভিমান করে রইলেন। তারপর আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে জোর করে নিরঞ্জনের বিয়ে দিলেন। জোরটা অবশ্য ধমকের জোর নয়, চোখের জলের জোর। তাছাড়া যে মেয়েকে তিনি পছন্দ করেছিলেন, সে অসাধারণ সুন্দরী। তাকে দেখে নিরঞ্জনেরও মন টলল। বিয়ের পর নিরঞ্জনের বাইরের উদ্দামতা কমে এল। আমরা বললুম, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' এদিকে নিরঞ্জনের সেই মন্ত্রগুরু পিসেমশাই মারা গেলেন। খবরটায় আমার মেসোমশাই খুব নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু তাঁর শান্তি বেশি দিন টিকল না। নিরঞ্জন আবার বাড়াবাড়ি শুরু করল। এবারকার বাড়াবাড়ির জন্যে শুনলুম মীরা বউদিই দায়ী। কোন এক পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় নিরঞ্জন নাকি সে রাত্রে মাত্র দুটি পেগ খেয়ে ফিরেছিল। তার জন্যে মীরা বৌদি স্বামীকে যা নয় তাই বলে গাল দিয়েছেন। রাগ করে অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। নিরঞ্জন অনেক সাধাসাধি করেও বৌয়ের মান ভাঙাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ক্ষেপে গেছে। মাসিমা মেসোমশাই দুজনই এ নিয়ে মীরা বৌদিকে সেদিন বকাবকি করেছিলেন।

বছর পাঁচেক বাদে মেসোমশাইও চোখ বুজলেন। কিন্তু নিরঞ্জনের তখনও ফেরবার নাম নেই। ওই সেই পিসে বিরাজ গাঙ্গুলী যেন ওর মধ্যে নতুন জন্ম নিয়েছে।

এই সময় একদিন ছেলের অন্নপ্রাশনে ওদের নিমন্ত্রণ করেছিলাম। নিরঞ্জন আসেনি। মাসিমা আর মীরা বৌদি এসেছিলেন। শাশুড়ির অসাক্ষাতে মীরা বৌদি সেদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন, সরোজবাবু, বাবা আমাকে শুধু বাড়ি-ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন, কার হাতে দিলেন দেখেননি।

আমার স্ত্রী মল্লিকা বলেছিল, ওকথা কেন বলছেন মীরাদি। রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি কোনটাতেই তো তিনি খাটো নন। তাঁর তো সবই আছে।

মীরা বৌদি বলেছিলেন, মানুষ তো কেবল বাইরেটাই দেখে, ভিতরে যে থাকে সেই বোঝে সব থাকবার কি জ্বালা।

তাঁর সেই কথাগুলি আজও যেন আমার কানে লেগে রয়েছে।

আরো বছর তিনেকের মধ্যে নিরঞ্জন পৈতৃক বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব খোয়াল। দামী দামী সব ফার্নিচার ভারি সস্তায় বিক্রি করে দিল। আমাকে একবার জানালও না। আমি জানতে পারলে ওকে অমন করে ঠকাতাম না। মীরা বৌদি রাগ করে গিয়ে বাপের বাড়ি ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, বিয়ের সময় বাবার কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া তাঁর খাট আলমারি পর্যন্ত নিরঞ্জন বিক্রি করে দিয়েছে। বাকি আছে ড্রেসিং টেবিলটা। তারও দরদাম হচ্ছে। মীরা বৌদি সেই আয়নার সামনে টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে রইলেন। বললেন, আমাকে না বেচে তুমি আমার বাবার দেওয়া এই টেবিল বিক্রি করতে পারবে না। তাঁর দেওয়া একটা জিনিসও আমি রাখতে পারব না ?

তারপর ওরা জোড়াবাগান ছেড়ে বরানগরের একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে উঠে যায়। সেখানেও জোর দাম্পত্য-কলহ চলে। তারপর হঠাৎ নিরঞ্জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ও সেবার মাস ছয়েক ভুগেছিল। মাঝে মাঝে আমি যেতাম। আর দেখতাম, মীরা বৌদির সেবা-শুশ্রূষা। তখন তাঁর গয়না বিক্রি করে চিকিৎসা চলত, সংসার চলত। এই গয়নার বাক্স স্বামীর হাতে পড়বে বলে নিজের দাদার কাছে তিনি লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন। বিপদের দিনে সেই বাক্স আবার তিনি ফেরৎ নিয়ে এলেন। নিরঞ্জন একদিন স্ত্রীকে বলেছিল, আয়নাটা বিক্রি করতে দিলে না, অথচ গয়নাগুলি দিব্যি বিক্রি করছ। আয়নাটা কি গয়নাগুলির চেয়ে দামী ?

মীরা একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, তা নয়। একটা আয়না বিক্রি করলে, কতই বা হত!

কিন্তু নিরঞ্জন আর মাসিমার কাছে শুনেছি, আয়নার ওপর মীরা বৌদির একটু বেশিরকম দুর্বলতা ছিল। গয়নাগাঁটি তিনি বেশি পরতেন না। কিন্তু সময় পেলেই যখন-তখন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। এক দৃষ্টিতে নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে থাকতেন। কি দেখতেন, কি ভাবতেন তিনিই জানেন। যে রূপে স্বামীকে মুগ্ধ করতে পারেননি, সেই রূপকে তিনি কি চোখে দেখতেন তা জানিনে। নাকি নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বলতেন, আরো শক্ত হও, ধৈর্য ধর, কিছুতেই ভেঙে

পড়ো না।

নিরঞ্জন সুস্থ হয়ে উঠল। ডাক্তার শাসন করে বলেছিলেন, ফের মদ ধরলে আর বাঁচবেন না। অনেক কষ্টে লিভারটিকে রক্ষা করেছি। আর অত্যাচার করলে সইবে না।

তবু মদের জন্য নিরঞ্জনের মন চঞ্চল হয়ে উঠত। কিন্তু উঠলে হবে কি, আর সেই অর্থও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। মৃদু মোলায়েম নেশা হিসাবে মীরা বৌদি নাকি তাকে এসময় ভাঙের সরবৎ করে দিতেন। নেশার সময়টাকে পার করে দেওয়ার জন্যে সেজেগুজে স্বামীর কাছে গল্প করতে বসতেন।

সুস্থ হওয়ার পর নিরঞ্জনের হঠাৎ সুমতি হল। এতকাল বাদে চাকরির খোঁজে বেরোল নিরঞ্জন। একটা ইনসিওরেন্স অফিসে ভাল চাকরিই পেল। চেহারা আছে ডিগ্রী আছে, বলতে কইতে পারে, পাবে না কেন! খবর শুনে মীরা বৌদিকে কনগ্রাচুলেট করে এলাম। বললাম, আপনার ক্ষমতা আছে। আপনি ছাড়া ওকে আর কেউ ফেরাতে পারত না।

মীরা বৌদি স্মিত মুখে চুপ করে রইলেন।

বছর খানেক ভালই কাটল। কিন্তু তারপর তাঁর সে সুখ বেশি দিন সইল না।

নিরঞ্জনকে নতুন নেশায় ধরল। মদ নয়, মদের চেয়েও মারাত্মক। রেখা চ্যাটার্জি নামে বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে নিরঞ্জনদের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে। তাঁকে নিরঞ্জনের চোখে পড়ল। আমি সে মেয়েটিকে দেখেছি।। দেখতে কালো, রোগা, ঢ্যাঙা চেহারা। তার মধ্যে নিরঞ্জন কি যে দেখেছে সেই জানে। আমরা, টাইপিস্ট আর তার নাম জড়িয়ে নানা কথা শুনতে লাগলাম। ছুটির পর নিরঞ্জন সরাসরি বাড়ি আসে না। রেখাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, সিনেমায় যায়, থিয়েটারে যায়। নানারকম সৌখিন জিনিস কিনে প্রেজেন্ট করে। মাইনের বেশির ভাগ টাকাই নাকি তার এইভাবে ব্যয় হয়ে যায়। আর এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিন-রাত ঝগড়া চলে। সত্যি বলতে কি, মেয়ের দিকে নিরঞ্জনের আগে ঝোঁক ছিল না। সে মদেই খুশি থাকত। মীরা বৌদি তখন নাকি বলতেন, তুমি বরং অন্য মেয়েকে ভালবাস তা আমার সইবে, কিন্তু মদের গন্ধ আমি সইতে পারব না।—কিন্তু এখন তিনি টের পেলেন, মদের গন্ধের চেয়েও অন্য মেয়ের গন্ধ আরো কটু। এই নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি খুব চলতে লাগল। তারপর কথার মুখে নিরঞ্জন একদিন বলে বসল, আমার যা খুশি তাই করব। আমি বিয়ে করব রেখাকে। আমি ছেলেমেয়ে চাই। তোমার দ্বারা তো আর তা হবে না।

প্রথম যৌবনে একটি ছেলে হওয়ার সময় হাসপাতালে মীরা বৌদির অপারেশন হয়েছিল। সেই থেকেই তাঁর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।

স্বামীর মুখে ফের সেই পুরোন কথা শুনে মীরা বৌদি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর তিনি কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি।

নিরঞ্জন অফিস থেকে সেদিনও খুব রাত করেই ফিরে এসেছিল। এসে দেখে, শোবার ঘরের দরজা বন্ধ। অনেক অনুনয় বিনয় রাগারাগির পরও দরজার পাট না

খুলতে পেরে, রাত্রের জন্যে নিরঞ্জনকে মার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। পরদিন ভোরে মিস্ত্রি ডেকে ভেঙে ফেলে দরজা। দেখা যায় কড়িকাঠে ফাঁস লাগিয়ে মীরা বৌদি ঝুলছেন। তাঁর পায়ের ছায়া পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। এ দৃশ্য দেখে নিরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে যায়, মাসিমা চিৎকার করে উঠলেন। বাপ-মা মরা সুলতা নামে চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি ভাইঝি থাকত তাঁর কাছে, সে মূর্ছা যায়। তারপর যা যা ঘটতে লাগল সবই গতানুগতিক। আমার স্ত্রী একদিন মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনে এল, সুলতা নাকি ও বাড়িতে আর থাকতে চাইছে না। নিরঞ্জন অফিসে বেরিয়ে গেলে ঘরখানা সাধারণত বন্ধই থাকে। সেদিন বিকেল বেলায় সুলতা ঘর ঝাড় দেওয়ার জন্যে যেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেছে, কে যেন তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে থেকে সরে গেল। আর একদিন সন্ধ্যার একটু আগে মাসিমা ওই ঘরের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় চিরুণীতে চুল আঁচড়াবার শব্দ শুনতে পেলেন।

এমন কিছু নতুন নয়। যে বাড়ির বউ আত্মহত্যা করে মরে, সে বাড়ির মেয়েরা কিছুদিন এ ধরনের অনৈসর্গিক ব্যাপার দেখতে-শুনতে পায়। আমি আমার স্ত্রীর কথা হেসেই উড়িয়ে দিলাম। বললাম, কবে দোকান থেকে ফিরে এসে দেখব, মীরা বৌদি তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন।

আমার স্ত্রী রাগ করে বলল, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলাম। সত্যি, মীরা বৌদিকে নিয়ে ঠাট্টা করা চলে না। কিন্তু এত যাঁর বুদ্ধি, এত যাঁর ধৈর্য, তিনি ঝোঁকের মাথায় ও কাজ করতে গেলেন কেন ? নিরঞ্জনকে বাধা দেওয়ার আর কি কোন উপায় ছিল না ?

দিনকয়েক বাদে নিরঞ্জন এল এই দোকানে। একথা-সেকথার পর হঠাৎ বলল, মীরা বৌদির ড্রেসিং টেবিলটা সে বিক্রি করে দিতে চায়। তার কথা শুনে আমি তো অবাক। এমন কাজ কেন করতে যাবে নিরঞ্জন। মীরা বৌদির একটা স্মৃতিচিহ্ন থাক না ওদের বাড়িতে। আয়নাটা কত ভালোবাসতেন বৌদি।

নিরঞ্জন সেদিন আর কিছু না বলে উঠে গেল। দিনকয়েক বাদে মাসিমা আমাকে খবর পাঠালেন। তাঁর কাছে শুনলাম, নিরঞ্জন নাকি রাত্রে আলো জ্বেলে ঘুমোয়। অথচ এর আগে ঘরে একটু আলো থাকলে তার ঘুম হত না। এর পর তিনিও আমাকে টেবিলটা নিয়ে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বললেন, এখন তোর টাকা দিতে হবে না, বিক্রি হয়ে গেলে যদি কিছু দিতে হয় দিস, না দিলেও কিছু আমার লোকসান হবে না।

মাসিমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেবিলটা নিয়ে আসার জন্যে আমাকে এমন বার বার করে বলতে লাগলেন যে পরদিনই আমি দোকানের একটা কুলিকে পাঠিয়ে দিলাম। নিরঞ্জন মুখে একটু আপত্তি করল, কেন আবার তুমি এত কষ্ট করতে গেলে। আয়নাটা যেখানে ছিল, সেখানেই না হয় থাকত।

কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি দেখে আমার মনে হল, আয়নাটা ওর বাড়ি থেকে নিয়ে আসায় নিরঞ্জন নিশ্চিন্ত হয়েছে, খুশি হয়েছে।

ড্রেসিং টেবিলটার যা ন্যায্য দাম, আমি তাই ওকে দিতে গেলাম। কিন্তু

নিরঞ্জন কিছুতেই নিল না। বলল, ঘর থেকে কেন দেবে, বিক্রি হয়ে গেলে তারপর দিও।

দাম নিল না বটে, কিন্তু নিরঞ্জন রোজ একবার করে আয়নাটার খোঁজ নিতে আসতে লাগল। জিনিসটা বিক্রি হয়েছে কিনা, কেউ এসে দর করে গেছে কিনা, রোজ এক প্রশ্ন।

মাসিমা আর একদিন খবর দিলেন, বললেন, নিরুর এবার একটা বিয়েটিয়ে দে।

কথাটায় আমি একটু আঘাত পেলাম। এই সেদিন মীরা বৌদি মারা গেলেন, তাও সাধারণ মৃত্যু নয়, আর এরই মধ্যে মাসিমা ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করছেন?

মাসিমা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, একা এক ঘরে থাকতে বোধ হয় ভয় হয়। সারা রাত ঘুমোয় না। আমি বলি, আমি এসে তোর কাছে থাকি, কিন্তু তাতে ও রাজী হয় না। বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি গতি আছে বল? ও নাকি তাকে ভালবাসে। তুই তাকেই একটু বুঝিয়ে বল।

এরপর সত্যিই আমি সেই রেখা চ্যাটার্জির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। খুব বেশি ভূমিকা না করে বললাম, আপনি বোধ হয় দুর্ঘটনার কথা সব শুনেছেন?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

আমি বললাম, মাসিমার ইচ্ছা আপনারা তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন।

রেখা বলল, তা হয় না।

কেন? আপনিও কি ভূতের ভয় করেন নাকি?

রেখা এবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল, বলল, না, ভূত নয়, ভূতে পাওয়া মানুষকে আমার ভয় সবচেয়ে বেশি।'

আমার বন্ধু তার কাহিনী শেষ করল।

আমি চুপ করে রইলাম। রেখা চ্যাটার্জির কথা যে কত সত্যি, তা আমি একটু আগেই টের পেয়েছি।

বৃষ্টির জোরটা একটু কমে এলে আমি বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আশ্চর্য, তারপর থেকে রোজই আমার ইচ্ছা করতে লাগল, আয়নাটার একবার খোঁজ নিয়ে আসি। কিন্তু ও-পথ আমি কিছুতেই আর মাড়ালাম না। শেষে আমিও কি নিরঞ্জনের মত হব? তবু বার বার আমার কৌতূহল হতে লাগল, কি হল সেই আয়নাটার, কি হল নিরঞ্জনের।

আজকের সকালের কাগজ আমার সেই কৌতূহল মিটিয়েছে। খবর বেরিয়েছে দমদম স্টেশনে কাল সন্ধ্যায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে একজন লোক। নিরঞ্জন হালদার বলে তাকে সনাক্ত করা হয়েছে। রেল পুলিশ যথারীতি তদন্ত করেছে। কেসটি আত্মহত্যা বলেই তাদের সন্দেহ।

ন্যাপা

লীলা মজুমদার

অস্বাভাবিক মানুষ ও অস্বাভাবিক ঘটনা যে হরদম চোখে পড়ে এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই-ই, এমনকি এমন বহু ঘটনার কথাও শোনা যায় যাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কে না জানে যে সেসব ঘটনাও হামেশাই ঘটে থাকে।

হামেশাই ঘটে থাকে বলছি বটে, তবে সব সময় নিজেদের জীবনে ঘটে না, তাই চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে পারে এমন সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না, এ-রকম বহু লোকের নিজেদের জীবনে না হোক, তাদের নিকট আত্মীয়স্বজনদের কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জীবনে সেসব ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকতে শোনা যায়।

যেমন ধরুন আমার মার সই মিস গাঙ্গুলীর কথা। বিয়ে-থা করেননি, নামকরা খ্রীশ্চান বাড়ির মেয়ে, নামটা অবিশ্যি পালটে দিয়েছি, নইলে সবাই চিনে ফেলবেন শেষটা—ভবানীপুরের দিকে একটা মেয়েদের হোস্টেল চালান। আমার মামাবাড়ির পুরোন চাকর বনমালীও সেখানে বহু বছর কাজ করছে। সব জানাশোনা লোকের ব্যাপার, বুঝতেই পারছেন, এঁরা কেউই সেরকম একটা বানিয়ে মিথ্যে কথা বলবার মানুষও নন, অথচ ঘটনাটা শুনে কী বলবেন তা ভেবে পাবেন না।

সারাদিন বনমালী ন্যাপাকে আগলিয়েছে, এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, আর ভাল লাগছে না। মানুষের ভাইবোন কেন হয়? ন্যাপাটা পাজির একশেষ, আর কেউ হলে বনমালী তার সঙ্গে কথাটি বলত না, অথচ মায়ের পেটের ভাই বলে যেই না জেল থেকে ছাড়া পেল, অমনি বনমালীও তাকে নিয়ে গিয়ে রান্না ঘরে ঢোকাতে বাধ্য হল।

'ওর জুড়ি রাঁধুনে সারাটা পৃথিবী ঘুরে আর একটা খুঁজে পাবেন না দিদি, নিদেন একটা ট্রায়েল দিন তো।'

কথাটা মিথ্যেও নয়। একবেলা ন্যাপার রান্না খেয়েই দিদিমণিদের মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না। আর ন্যাপাকে পায় কে!

তবু কাজটা ভাল হয়নি। ন্যাপার মনে কী আছে কে জানে! দুষ্টবুদ্ধি জাগতেই বা কতক্ষণ? বাড়ির ভিতরে তো বনমালী আর বাইরের ফটকে দারোয়ান ছাড়া আর একটা ব্যটাছেলে নেই। সারাদিন দিদিরা ইস্কুলে পড়ায়, বাড়ি-ঘর খাঁ-খাঁ করে, জিনিসপত্র এধারে-ওধারে ছড়ানো পড়ে থাকে। ন্যাপার যা স্বভাব, বনমালীর মনে শান্তি নেই। অথচ মায়ের পেটের ভাইটাকে সে-ই যদি আশ্রয় না দেয় তো

আর কে দেবে ?

যাক, তবু যতক্ষণ রান্নাঘরে কাজে মেতে থাকে ততক্ষণ রক্ষা। বাস্তবিক রাঁধে খাসা। ছেলেবেলা থেকে ওর হাতে জাদু আছে, বেশ ভাল মাইনেতে সাহেব-বাড়িতে করে খেতে পারত, অথচ তবু যে কেন দুর্বুদ্ধি জাগে কে জানে! যাকগে, এখন রাতের খাবার জন্য টেবিলটা লাগাতে হবে, এসব ভেবে তো কোন লাভ নেই।

দরজার কোণা থেকে বনমালী লক্ষ্য করে দেখল, মোড়ের বাড়ির বুড়ি মাসিমা এসেছেন। সবাই মিলে টেবিল ঘিরে বসেছেন। কথাও কানে আসছে। মাসিমা একবার কথা বলতে শুরু করলে আর রক্ষা নেই, কিন্তু শুনতে বেশ মজাও লাগে।

'হ্যাঁ, একদম চেঁছেপুঁছে সব নিয়ে এলাম ব্যাঙ্ক থেকে। আমাকে সন্দেহ করে এত বড় আস্পর্ধা! বুঝলি উমাশশী, প্রত্যেকটি জিনিস আমার বাবা আমার মার জন্য গড়িয়ে দিয়েছিলেন। মা মরবার সময় সমান দুই ভাগ করে আমার হাতে দিলেন। একটা ভাগ আমার, একটা ভাগ ভাদুর বউয়ের জন্যে। সে একেবারে চুলচেরা ভাগ ভাই। জোড়া ভেঙে ভেঙে একটা বালা আমাকে একটা ওকে ; একটা ইয়ারিং আমাকে, একটা ওকে। যেমন দুটি রুমালে বেঁধে দিয়েছিলেন, তেমনি ব্যাঙ্কে তুলে দিয়েছিলাম, এই দশ বছরে একবারও খুলিনি। ওরাও মফস্বলে ঘুরেছে, সাহস করে কিছু নেয়নি। এখন এখানে এসে বসেছে, অমনি বউ কিনা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। আজ ভারি রেগে গেছি, এই পুঁটলিসুদ্ধ ওর মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেব।'

উমাদিদি কিছু বলবার আগেই কম বয়সের মণিদিদি বলে উঠলেন, 'কই মাসিমা, দেখি, দেখি কি রকম গয়না!'

মাসিমাও তাই চান, দুই পুঁটলি খুলে টেবিলের উপর ঢেলে দিলেন। কালোপানা কাঠের উপর ছোট ছোট দুটি সোনার ঢিবির মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। বনমালীর চোখ ঝলসে গেল। এত গয়না যে ওই থানকাপড়-পরা বুড়ি মাসিমার থাকতে পারে, এটা বনমালীর ধারণা ছিল না। ইস, লাল নীল সাদা সবুজ পাথর বসানো একেবারে তাল-তাল সোনা গো। ওর দাম কত হাজার টাকা হবে কে জানে ? এর ছোটপানা একটা বেচলেই বনমালীর মার ইন্‌জেকশনগুলোর দাম উঠে যাবে। বুড়ি মাসিমা তো আচ্ছা, এই রাজার ধনরত্ন তুলে রেখে দিয়ে মিলের থানকাপড় আর রবারের চটি পরে বেড়ায়, বুড়ো বয়স অবধি ইস্কুলে সেলাই শেখায়। একটা ভাল জিনিস কোনদিন কেনে না, খায় না।

দিদিমণিরা জিনিসগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে, এক-একটার উপর আলো পড়ে আর অমনি ঝিলমিলিয়ে ওঠে। বনমালীর চোখ জ্বালা করে। ভয়ে-ভয়ে একবার পিছন ফিরে দেখে, ভাগ্যিস্, ন্যাপা রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে। বনমালীর বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। আঃ বাঁচা গেল, মাসিমা আবার ওগুলোকে পুঁটুলি বেঁধে ফেলছেন।

মণিদিদির হাতে তখনও লাল পাথর বসানো মালাটা রয়েছে।

'আপনার কী সাহস মাসিমা! এত সব দেখে আমাদেরই চুরি করে নিতে ইচ্ছে

করবে, আর আপনি ওই ব্যাগ নিয়ে সন্ধেবেলা এতটা পথ একা হেঁটে বাড়ি গিয়ে তবে লোহার সিন্দুকে তুলবেন! ভয়ডর নেই আপনার প্রাণে?'

মাসিমাও অমনি পুঁটুলি বাঁধা বন্ধ করে একগাল হেসে বললেন, 'আরে, আমার বাবার জ্বালায় কি আমাদের ভয়টয় পাবার জো ছিল! জানিস তো বাবা মস্ত বড় উকিল ছিলেন, রাশি রাশি টাকা রোজগারও করতেন, দুই হাতে খরচও করতেন। সোনাদানায় রুপোর বাসনে আর তার চেয়েও দামী কাট-কাঁচের ফুলদানি আর ঝাড়লণ্ঠনে বাড়ি বোঝাই ছিল। এক-একটা বিলিতি ছবিরই কত দাম ছিল। তার কিছুই নেই অবশ্যি এখন, রিটায়ার করে বাবা বিদেশ ঘুরে বেরিয়ে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছিলেন, শুধু মার গায়ের গয়নাগুলো ছাড়া। তা, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম, ভয় পাব কী, এই দৈত্যের মতো দুটো কুকুর ছিল যে আমাদের। সারাদিন বাঁধা থাকত, সারা রাত ছাড়া থাকত। একটার রঙ ছিল হলদে, আর কালো পোড়া হাঁড়ির মত এই প্রকাণ্ড মুখ, তার নাম ছিল রোলো। হাঁউমাঁউ করে তেড়ে এলে তাই দেখে ভয়ে প্রাণ উড়ে যেত। কিন্তু আসলে কিছু বলত না। শুধু ধারালো ছুঁচলো দাঁত দিয়ে কুটকুট করে জামার সব বোতাম কেটে ফেলে দিত। সে এক মজার ব্যাপার ! অন্যটার নাম ছিল কিম্। কী সুন্দর সে দেখতে ছিল, সে আর কী বলল। এই লম্বা চকচকে লাল লোম সারা গায়ে, মখমলের মত চোখ, ঝালরের মত ল্যাজ। মুখে কিচ্ছু বলত না। নিঃশব্দে ছুটে এসে এক লাফে টুঁটি কামড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করত। বাড়ির লোকদের কিছু বলত না। পাঁচ-সাতশো টাকার জন্য এখানে কত চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবির কথা শোনা যেত, আর আমাদের বাড়িতে হাত বাড়ালেই হাজার টাকার আসবাবে হাত ঠেকে যেত, অথচ ওই দুই কুকুরের জন্য কুটোটা কখনও চুরি যেত না। আরে তোরা কী বলিস, গোছা-গোছা জড়োয়া চুড়ি হাতে দিয়ে মার সঙ্গে তোদের এই বাড়িতেই চায়ের নেমন্তন্ন খেয়ে কত রাত করে বাড়ি ফিরেছি। সঙ্গে ওই দুটো কুকুর থাকতে শুধ আমাদের কাছাকাছি কেন, এই ফুটপাথ দিয়ে লোক চলেনি। এখানে তখন স্যার গিরীন্দ্র থাকতেন। কত নাম করা লোকের যাওয়া-আসা ছিল এ-বাড়িতে, কী সুন্দর সাজানো-গোছানো ছিল। কী ভালই যে বাসতাম আমরা ওই কুকুর দুটোকে—'

কানের কাছে একটা ফোঁস শব্দ শুনে বনমালী চমকিয়ে উঠল। ন্যাপার চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম জ্বলজ্বল করছে। 'যা ভাগ, তোর কাজকম্ম নেই নাকি?'

ন্যাপা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কারও অত সোনাদানা থাকা উচিত না, কারও না।'

'ন্যাপা তোর পায়ে পড়ি। আবার কিছু পাকিয়ে বসিস না। এই সবেমাত্র ছাড়া পেয়েছিস, বুড়ো মাকে আর জ্বালাসনি বলছি, ও ন্যাপা শোন্ বলছি।'

কিন্তু ন্যাপা ততক্ষণে হাওয়া।

মাসিমা পুঁটুলি দুটোকে ততক্ষণে বেঁধে-ছেঁদে, হাতে ঝোলানো কালো কাপড়ের থলির মধ্যে পুরে, ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে পড়েছেন। থলিটাকে তুলে ধরে বললেন, 'তোরাই বল্, কার বাবার সাধ্যি বুঝবে এই থলির মধ্যে আবার সাত রাজার ধন থাকতে পারে! আর ভয়ের কথা মনেও আনিস না, চল্লিশ বছর আগে

কুকুর দুটো মরে গেছে, কিন্তু ভয়টা আমাদের তখন থেকেই ঘুচে গেছে। তবে শরীরটা আজকাল বড় সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এই যা। কুকুর দুটোর জন্য মাঝে মাঝে বড় মন-কেমন করে।'

মাসিমা চটি পায়ে দিয়ে বিদায় নেন, দিদিমণিরাও নিজেদের মধ্যে গয়নার বিষয় বলাবলি করতে করতে উঠে পড়েন।

এতক্ষণ পরে বনমালী টেবিল লাগায়। তার মন ভাল নেই। ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবার যোগাড়। রান্নাঘরে ন্যাপা নেই। খাবারদাবারগুলো উনুনের পাশে গাদাগাদি করে গরমে রাখা।

কোনমতে সে সব টেবিলে পৌঁছে দিয়ে, বনমালী উমাদিদিকে বলল, 'আর আমি পারছি না দিদি, বড্ড শরীর খারাপ লাগছে।' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে খিড়কিদোরের দিকে ছুটল।

বেশি দূরে যেতে হল না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাপা এসে গায়ের উপর আছড়িয়ে পড়ল। সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে, মুখে গলায় রক্তের ছোপ, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। ধড়াস করে খিড়কি–দোর বন্ধ করে বনমালী বলল, 'ন্যাপা, আবার কী সর্বনাশ করে এলি রে, বল্ শিগগির?'

দেয়ালে ভর দিয়ে বিবর্ণ মুখে ন্যাপা বলল, 'মাইরি বলছি, কারও অনিষ্ট করিনি। আমার পিছন পিছন কাউকে আসতে দেখলে দাদা?'

'কই, না তো, কে আবার আসবে?'

রান্নাঘরের রকের উপর বসে পড়ে ন্যাপা বলল, 'কী জানি! মনে ভাবলাম ওর গোটা দুত্তিন হাতিয়ে নিলেই আমাদের এ-জন্মের ভাবনা-চিন্তা ঘুচে যাবে। মোড়ের মাথায় গিয়ে ওই অন্ধকার জায়গাটায় লুকিয়ে থাকি, উনি পার হয়ে গেলে পর, পিছন থেকে মাথায় এক বাড়ি দিয়ে—অমন করে তাকাচ্ছ কেন, কাউকে কোনদিন প্রাণে মেরেছি বলতে পার? মারিনি, কিছু করিনি। উনিও পার হয়ে গেছেন, আমিও যেই লাঠি তুলেছি, অমনি কোথা থেকে সে যে কী বিকট দুটো কুকুর এসে আমাকে আক্রমণ করল সে আর কী বলব দাদা। এই প্রকাণ্ড কালো পোড়া হাঁড়ির মত মুখ, বুকের উপর বাঘের মত থাবা তুলে লাফিয়ে উঠে পট-পট করে জামার সব কটা বোতাম দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিল গো! অন্যটা দেখতে কী সুন্দর লাল লাল লম্বা লম্বা লোম, আগুনের ভাঁটার মত চোখ করে আমার গলাটা ছিঁড়ে নিতে চেষ্টা করছিল। ওইখানেই লাঠি ফেলে দিয়ে কোনরকমে পালিয়ে বেঁচেছি। উঃ। কোত্থেকে যে এল বুঝলাম না। তারপর দৌড়তে দৌড়তে একবার ফিরে দেখি ওনার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠল। আশ্চর্যের বিষয়, এত কাণ্ড ঘটে গেল, বুড়ি একবার ফিরেও দেখল না।

বনমালীর হাত-পা কাঁপছিল, মুখে কথা সরল না। কোন মতে ন্যাপাকে ধরে তুলল, 'ন্যাপা, প্রতিজ্ঞা কর্, অমন কাজ আর করবি নে। কী বাঁচা বেঁচেছিস রে ন্যাপা! জানিস, আমি নিজের কানে শুনলাম মাসিমা বলছেন, ওই কুকুর দুটো ওনাদের বড় আদরের ছিল, চল্লিশ বছর হল মরে গেছে। ও কি, ও ন্যাপা, আবার বসে পড়লি যে!'

ভূতো

সত্যজিৎ রায়

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অক্রুরবাবুর মন ভেজানো গেল না। উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেয়েছিল অক্রুর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম। খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর লাইব্রেরিতে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি-আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-এস-এম। ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম। অক্রুর চৌধুরী মঞ্চে একা মানুষ কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আরেকজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেন হলের সিলিং-এর কাছাকাছি কোথাও শূন্যে অবস্থান করছে। অক্রুরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তর আসে উপর থেকে।

'হরনাথ, কেমন আছ ?'

'আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।'

'শুনলাম তুমি নাকি আজকাল সংগীতচর্চা করছ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।

'রাগ সংগীত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাগ সংগীত।'

'গান করো ?'

'আজ্ঞে না।'

'যন্ত্র সংগীত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী যন্ত্র ? সেতার ?'

'আজ্ঞে না।'

'সরোদ ?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে কী বাজাও?'

'আজ্ঞে গ্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখর হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গীতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অক্রুরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা বোঝার কোন উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বনে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বৃথা। অক্রুর চৌধুরী কি ছাত্র নেবেন না ? নবীনের পড়াশুনায় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয়নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইউডের কারখানা আছে ; তাঁর ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই, রুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক—এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছে। কিন্ত অক্রুর চৌধুরী ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

ফাংশনের উদ্যোক্তাদের কাছেই নবীন জানল যে অক্রুরবাবু থাকেন কলকাতায় অ্যামহার্স্ট লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সোজা চলে গেল যাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। গুরু কিন্তু বাদ সাধলেন।

'কী করা হয় এখন ?' প্রথম প্রশ্ন করলেন ভেন্‌ট্রিলোকুইস্ট। কাছ থেকে ভদ্রলোককে দেখে হৃৎকম্পন শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়, চাড়া দেওয়া ঘন কালো গোঁফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যিখানে টেরি, তার দু'দিক দিয়ে ঢেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো ঢুলুঢুলু, যদিও স্টেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে ঝিলিক মারে।

নবীন বলল সে কী করে।

'এইসব শখ হয়েছে কেন ?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল।—'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শখ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অক্রুরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখায়নি। যদি পার তো নিজে চেষ্টা করে দেখ।'

নবীন সেদিনের মত উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার অ্যামহার্স্ট লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের স্বপ্ন দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অক্রুরবাবুর হাতে পায়ে ধরবে।

কিন্তু এবার আরো বিপর্যয়। এবার অক্রুরবাবু তাকে একরকম বাড়ি থেকে বারই করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাব না সেটা প্রথমবারেই তোমার বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝনি মানে তোমার ঘটে বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি না থাকলে কোনরকম ম্যাজিক চলে না—এ ম্যাজিক তো নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুষড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয় যাক অক্রুর চৌধুরী। সে যদি না শেখায় তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেহি।

নবীনের মধ্যে যে এতটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্ট্রীটে একটা বইয়ের দোকান থেকে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম সম্বন্ধে একটা

বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধনা।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। প বর্গের অর্থাৎ প ফ ব ভ ম, কেবল এই ক'টা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকে, ফলে ঠোঁট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই ক'টা অক্ষর না থাকলে যে কোন কথাই ঠোঁট ফাঁক করে অথচ না নাড়িয়ে বলা যায়। কোনো কথায় প বর্গের অক্ষর থাকলে সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ' কথটা যদি 'তুঙি কেঙন আছ' করে বলা যায়, তাহলে আর ঠোঁট নাড়াবার কোনো দরকারই হয় না, কেবল জিভ নাড়ালেই চলে। প ফ ব ভ ম-য়ের জায়গায় ক খ গ ঘ ঙ—এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছ?' 'ভালো আছি', 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা পড়েছে, দিব্যি ঠাণ্ডা।'—তাহলে সেটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ ?' 'ঘালো আছি' 'আজ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না ?' 'তা কড়েছে, দিগ্যি ঠাণ্ডা'।

আরো আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার ব্যাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে শুনিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রপ্ত হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার যুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্‌ট্রিলোকুইস্টের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোঁট নাড়ায় যাদুকর। মনে হয় যাদুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোচ্ছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তার আশ্চর্য প্রোগ্রেসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খরচ দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন হবে এই নিয়ে দিন পনের ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ এক সময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান।

পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্রুর চৌধুরীর মত। অর্থাৎ অক্রুর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যান্ডবিলে অক্রুর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সযত্নে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে আদিনাথ কারিগরকে দেখাল।– 'এইরকম গোঁফ, এই টেরি, এইরকম ঢুলুঢুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে! আশা করি তার শো দেখতে আসবেন অক্রুর চৌধুরী!

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোশাকটাও অক্রুর চৌধুরীর মত ; কালো গলাবন্ধ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গোঁজা ধুতি।

নেতাজী ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গে নবীনের আলাপ ছিল ; তাদের একটা

ফাংশনে শশধরকে ধরে তার ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌মের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হয়েছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোর সঙ্গে নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্‌বিতণ্ডা এতই জমেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইস্টগেংগল আর ঙোহনবাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষই করেনি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাংশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে লাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোনো চিন্তা নেই, রুজি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশেষে একদিন অক্রুর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল নবীনের।

মাস তিনেক হল নবীন উত্তরপাড়া ছেড়ে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাংশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহবা পেয়েছে। ফাংশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও সাফল্যের ছাপ পড়েছে, তার চেহারা ও কথাবার্তায় একটা নতুন জৌলুস লক্ষ করা যায়।

হয়তো মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্রুরবাবু উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন—

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জান তো ভূতো?'

'কই, না তো।'

'সে কি, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জান না?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল?'

'তাই তো শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কি?'

আজ নবীন তার ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোড শেডিংকে কেন্দ করে। লোড শেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাসট্রামে ভিড় ইত্যাদি যে সব জিনিস নিয়ে শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আলোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটাও বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খানিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্রুরবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

নবীন ভদ্রলোককে ঘরে এনে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

অক্রুরবাবু তৎক্ষণাৎ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড় ভাবে বসে আছে নবীনের টেবিলের এক কোণে।

অক্রুরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে তুলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াস্তি বোধ করছে না সেটা বললে ভুল হবে, তবে অক্রুরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলেনি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে ?'

অক্রুরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'হঠাৎ এ মতি হল কেন ?'

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধ হয় বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবটুকু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি—আপনার এই প্রতিমূর্তিই কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অক্রুরবাবু এখনো ভূতোর দিক থেকে চোখ সরাননি। বললেন, 'তুমি জান কি না জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। স্টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে কর ? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে ? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেনে নেব ?'

সময়টা সন্ধ্যা। লোড শেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি জ্বলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অক্রুরবাবুর চোখ দুটো স্টেজে যেমন জ্বলজ্বল করে সেই ভাবে জ্বলছে। ছোট্ট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর ঢুলুঢুলু চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক।

'তুমি জান কি না জানি না', বললেন অক্রুরবাবু, 'ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌মেই কিন্তু আমার যাদুর দৌড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটত্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা অথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুকরের শিষ্যত্ব করেছি। কলকাতা শহরে নয় ; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।'

'সে যাদু আপনি মঞ্চে দেখিয়েছেন কখনো ?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে সব স্টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের পন্থা হিসেবে আমি সে যাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম

আমার গুরুকে। সে কথা আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিই হয়েছি। ভেন্ট্রিলোকুইজ্‌ম যেমন তোমাকে আমি শেখাইনি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায়নি। পেশাদারী যাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনদিনই শেখায়নি। ম্যাজিকের রাস্তা যাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকুই বলতে এসেছি তোমাকে।'

অক্রুরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গোঁফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ।... যাক, আমি তাহলে আসি।'

অক্রুরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঁড়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাতের মাথায় এবং গোঁফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ্য করেনি। সেটাও আশ্চর্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সব সময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে। সাদা চুলগুলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক্, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখ চোখের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভালো করে দেখেনি।

কিন্তু তাও মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির হল চিৎপুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে কেস থেকে ভূতোকে বার করে মেঝেতে রেখে নবীন বললে, 'দেখুন তো, এই পুতুলের মাথায় আর গোঁফে যে সাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া?'

আদিনাথ পাল ভারি অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন স্যার। পাকা চুলের কথা তো আপনি বলেননি। বললে, কাঁচা পাকা মিশিয়ে দিতে তো কোনো অসুবিধে ছিল না। দু'রকম চুলই তো আছে স্টকে; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা সাদা চুল মিশে যেতে পারে না কি?

'ভুল তো মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি? আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, অন্য কেউ এসে এ চুল লাগিয়ে দিয়েছে; আপনি টের পাননি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই। নবীনের অজান্তেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাংশনে একটা মজার ব্যাপার হল।

ভূতোর জনপ্রিয়তার এইটেই প্রমাণ যে ফাংশনের উদ্যোক্তারা তার আইটেমটি রেখেছিলেন সবার শেষে। লোড শেডিং নিয়ে রসাল কথোপকথন চলেছে ভূতো আর নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোর উত্তরে সে যে সব সময় তৈরি কথা ব্যবহার করছে তা নয়। তার কথায় অনেক সময় এমন সব ইংরিজি শব্দ ঢুকে পড়ছে যেগুলো নবীন কখনো ব্যবহার করে না—বড় জোর তার মানেটা জানে। নবীনের পক্ষে এ একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার জন্য শো-এর কোন ক্ষতি হয়নি, কারণ কথাগুলো খুব লাগসই ভাবেই ব্যবহার হচ্ছিল, আর লোকেও তারিফ করছিল খুবই। ভাগ্যে তারা জানে না যে নবীনের বিদ্যে হাইয়ার সেকেন্ডারী পর্যন্ত।

কিন্তু এই ইংরিজি কথার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারটা নবীনের খুব ভালো লাগেনি। তার সব সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য কেউ যেন অলক্ষ্যে তার উপর কর্তৃত্ব করছে। শো-এর পর বাড়ি ফিরে এসে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে নবীন টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ভূতোকে রাখল বাতির সামনে।

কপালের তিলটা কি ছিল আগে? না। এখন রয়েছে। সেদিন তার ঘরে বসেই নবীন প্রথম লক্ষ্য করেছে অক্রুরবাবুর কপালের তিলটা। খুবই ছোট্ট তিল, প্রায় চোখে পড়ার মত নয়। ভূতোর কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আর সেই সঙ্গে আরো কিছু।

আরো খান দশেক পাকা চুল।

আর চোখের তলায় কালি।

এই কালি আগে ছিল না।

নবীন চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করে দিল। তার ভারি অস্থির লাগছে। ম্যাজিকের পূজারী সে কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বস্তিকর। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস করে তার সবটাই মানুষের কারসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনের কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অন্য কিছু। সেটা অশুভ। ভূতোর এই পরিবর্তনের মধ্যে সেই অশুভের ইঙ্গিত রয়েছে।

অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। চোখে সেই ঢুলুঢুলু চাহনি, ঠোঁটের কোণে অল্প হাসি, আর খেলার সময় তার নিজের হাতের কারসাজি ছাড়া যে কোন পুতুলের মতই অসাড়, নির্জীব।

অথচ তার চেহারায় অল্প অল্প পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

আর নবীন কেন জানি বিশ্বাস করে এই পরিবর্তনগুলো অক্রুর চৌধুরীর মধ্যেও ঘটছে। তারও চুলে পাক ধরেছে, তারও চোখের তলায় কালি পড়ছে।

ভূতোর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে নেওয়ার অভ্যাস নবীনের প্রথম থেকেই। যেমন—

'আজ দিনটা বেজায় গুমোট করছে, না রে ভূতো?'

'হুঁ, গেজায় গুঙোট।'

'তবে তোর সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।'

'কুতুলের আগার ঘাঙ- হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!'

আজও প্রায় আপনা থেকেই নবীনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে পড়ল।—

'এসব কী ঘটছে বল তো ভূতো?'

উত্তরটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—

'কর্ঙখল কঙখল!'

কর্মফল।

নবীনের ঠোঁট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে যেমন হয় স্টেজে কিন্তু উত্তরটা তার জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সম্বন্ধে নবীনের একটা ধারণা আছে।

সে রাত্রে চাকর শিবুর অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও নবীন কিচ্ছু খেল না। এমনিতে রাত্রে ওর ঘুম ভালোই হয়, কিন্তু সাবধানের মার নেই, তাই আজ একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিল। একটা নাগাদ বুঝতে পারল বড়িতে কাজ দেবে। হাত থেকে পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখের পাতা বুজে এল।

ঘুমটা ভেঙে গেল মাঝরাত্তিরে।

ঘরে কে কাশল?

সে নিজে কি? কিন্তু তার তো কাশি হয়নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন খুক্ খুক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

ল্যাম্পটা জ্বালালো নবীন।

ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তার দেহটা যেন একটু সামনের দিকে ঝোঁকা, আর ডান হাতটা ভাঁজ হয়ে বুকের কাছে চলে এসেছে।

নবীন ঘড়িতে দেখল সাড়ে তিনটে। বাইরে পাহারাওয়ালার লাঠির ঠক্ ঠক্। দূরে কুকুর ডাকছে। একটা প্যাঁচা কর্কশস্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল তার বাড়ির উপর দিয়ে। পাশের বাড়ির কারুর কাশি হয়েছে নিশ্চয়ই। আর জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোর শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহরের জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রীটে তার এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসদৃশ।

নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল এবং আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ফিন্‌লে রিক্রিয়েশন ক্লাবের বাৎসরিক ফাংশনে নবীন প্রথম ব্যর্থতার আস্বাদ পেল।

প্রকাণ্ড হলে প্রকাণ্ড অনুষ্ঠান। যথারীতি তার আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসংগীত, কথক নাচ ও তারপর নবীন মুনসীর ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নিজের গলার যত্ন নেবার জন্য যা করার সবই করেছে নবীন। গলাটাকে পরিষ্কার রাখা খুবই

দরকার, কারণ সুক্ষ্মতম কন্ট্রোল না থাকলে ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম হয় না। স্টেজে ঢোকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে তার গলা ঠিক আছে। এমন কি ভূতোকে প্রথম প্রশ্ন করার সময়ও সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার স্বর বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বনাশ হল ভূতোর উত্তরে।

এ উত্তর দর্শকের কানে পৌঁছাবে না কারণ সর্দি-কাশিতে বসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার প্লীজ' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র তাই তাঁরা আওয়াজ দিলেন না, কিন্তু নবীন জানে যে তাঁরা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে পারছেন না।

আরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাপ চেয়ে স্টেজ থেকে বিদায় নিতে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা নেওয়া যায় না। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অল্পদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভাদ্র মাস। গরম প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে, যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তারই দোষ।

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে, কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতিটা জ্বেলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবীন তার পুতুলের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিস্ময়, কত বিভীষিকা তার কপালে আছে সেটা দেখবার জন্য যেন তার জেদ চেপে গেছে।

দু'পা-র বেশি এগোন সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ায় তার চলা আপনিই বন্ধ হয়ে গেছে।

ভূতোর গলাবন্ধ কোটের বুকের কাছটায় একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিচ্ছে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি?

হ্যাঁ, যাচ্ছে বৈ কি। ট্রাফিক-বিহীন নিস্তব্ধ রাত্রে নবীনের ঘরে এখন একটির

বদলে দুটি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়তো চরম আতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিস্ময় থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে পড়ল—

'ভূতো!'

আর সেই সঙ্গে এক অশরীরী চিৎকার নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার তক্তপোশের দিকে—

'ভূতো নয়! আমি অক্রুর চৌধুরী!'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেনি। কণ্ঠস্বর ওই পুতুলের। অক্রুর চৌধুরী কোনো এক আশ্চর্য যাদুবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্রুর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায়নি। এই জ্যান্ত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভূতো আর নিশ্বাস নিচ্ছে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের তলায় আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভূতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, ঠোঁট আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা?

চাপ বাড়াতে গিয়ে মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

* * *

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুদ্দির সঙ্গে। ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়,' বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শখ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাগজে। অক্রুর চৌধুরী।'

'তাই বুঝি?'—নবীন এখনো কাগজ দেখেনি।—'কিসে গেলেন?'

'হৃদরোগ', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্তর জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোঁজ নিলে নির্ঘাৎ জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গতকাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।

ঘাটবাবু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাত কটা বাজে তার ঠিক নেই। অনেকক্ষণ ধরেই বৃষ্টি পড়ছে। ঝমঝমে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে নেশা লেগে যায়।

বাসু হালদারের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বার বার। একটা অস্বস্তি হচ্ছে কিরকম। দরজার বাইরে দুটো কুকুর এসে গুটি-শুটি হয়ে শুয়ে কুঁই কুঁই শব্দ করছে। বাস হালদার চেঁচিয়ে উঠলে, এই যাঃ যাঃ।

যদিও সে ভাল করে জানে, কুকুর দুটো এই সামান্য ধমক শুনে মোটেই যাবে না। এই বৃষ্টির মধ্যে যাবেই বা কোথায়!

বাসু হালদার জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল একবার। বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণ নেই। আজ আর কেউ আসবে না মনে হয় ! বাসু হালদার আজ সন্ধের মুখেই বাড়ি চলে যাবে ভেবেছিল। সেই সময়ই মুখিয়া ডোমটা এক ছিলিম গাঁজা সেজে এনে বলেছিল, একটু পেসাদ করে দেবেন নাকি, বড়বাবু!

মুখিয়ার মুখে বড়বাবু ডাকটা বড় মধুর লাগে। এই দুনিয়ায় বাসু হালদারকে খাতির করে না কেউ, শুধু মুখিয়াই তাকে ওই নামে ডাকে। মুখিয়াটাও যেন কোথায় চলে গেছে। এই সময় আর এক ছিলিম গাঁজা পেলে মন্দ হত না।

বাসু হালদার এই মফস্বল শহরের ঘাটবাবু। তার কাজ হচ্ছে, কেউ মড়া নিয়ে এলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট আছে কিনা দেখে নেওয়া আর মিউনিসিপ্যালিটির দুটি টাকা ফি আদায় করা।

একটা পা ল্যাংড়া, জীবনে আর কোন চাকরি জুটত না। অনেক বছর আগে রসরাজ গুহ যখন এখানকার চেয়ারম্যান ছিলেন, তখন তিনি দয়া করে বাসুকে এই কাজটা জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বাসু হালদারকে সারা দিন রাত শ্মশান-ঘরের ছোট্ট অফিস ঘরটাতেই পড়ে থাকতে হয়। একটা পেট চলে যায়।

এরকম বৃষ্টি বাদলার দিনে বাসু হালদার বাড়ি চলে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না। কেউ এলেও তাকে বাড়ি থেকে ডেকে আনত নিজের গরজে। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান পঞ্চানন দাস সরকারের মায়ের এখন-তখন অবস্থা। যে-কোন সময় টেঁসে যেতে পারে। ওরা বাড়ির মড়াকে বাসি করে না, যদি এই মাঝ রাত্তিরেও এসে হাজির হয়, আর তখন যদি বাসু হালদারকে না পায়—

বাসু হালদার একটা বিড়ি ধরাল। চেয়ার-টেবিলে বসে ঘুমোলে দোষ নেই। কিন্তু ঘুম যে আসছে না। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। ইস, যদি মুখিয়াটাও থাকত এ সময়ে।

হঠাৎ অস্পষ্টভাবে মানুষ জনের আওয়াজ শোনা গেল। বল হরি, হরি বোল-ই হাঁক দিচ্ছে। তা হলে চেয়ারম্যান সাহেবের মা গত হয়েছেন। আহা, কি মাতৃভক্তি চেয়ারম্যান সাহেবের, এই বৃষ্টির মধ্যেও পোড়াতে আনতে ভোলেনি। চিতা জ্বলবে কি করে, সে খেয়াল নেই। যাই হোক, ওরা বড়লোক, বেশ খরচ-খরচা করবে মনে হয়। বাসু হালদারের কি আর কিছু জুটবে!

বাসু হালদার ঘর থেকে বেরুবার আগেই কয়েকজন লোক একটা মড়ার খাটিয়া ঘাড়ে করে তার ঘর ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল চুল্লীর দিকে।

বাসু হালদার বুঝল, এ তো চেয়ারম্যান সাহেবের মা নয়! তাহলে সঙ্গে অনেক লোক থাকত। অনেক চ্যাঁচামেচি, অনেক ধুমধাম। তাহলে আর ব্যস্ততা দেখিয়ে কি হবে।

সে নিজের টেবিলে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে। আসুক না, ওরাই আসুক! ঘাটবাবুর অফিসে আর কোন কর্মচারী না থাকলেও, সেই তো বড়বাবু।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল, ওরা কেউ এল না। আর কোন সাড়া-শব্দও পাওয়া গেল না! কৌতূহলে বাসু হালদার বেরিয়ে এল।

বৃষ্টি অকস্মাৎ ধরে এসেছে। আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি করে পড়ছে, তবে আর বেশিক্ষণ চলবে না বোঝা যায়। কয়েকজন লোক মড়ার খাটটা এক পাশে নামিয়ে রেখে নিজেরাই কাঠ সাজাতে শুরু করেছে।

বাসু হালদার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, কি ব্যাপার ?

লোকগুলো একটু চমকে উঠল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, ডোম-টোম কাউকে দেখছি না, তাই আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।

বাসু হালদার ভুরু কুঁচকে বলল, ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন মানে ? মড়া রেজিস্ট্রি করতে হবে না ?

—মড়া রেজিস্ট্রি ? সে আবার কি ?

—বাঃ, যে-কোন মড়া এনেই আপনারা পুড়িয়ে ফেলবেন! একি বেওয়ারিস কারবার নাকি ?

লোকটি এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে, রেজিস্ট্রি করে নিন। ক'টাকা লাগবে। লোকটি জামার পকেট থেকে ফস করে দু'খানা দশ টাকার নোট বার করে দিল। অন্য লোকগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

বাসু হালদার সবার দিকে একবার চোখ বুলোল। কেউই তার চেনা নয়। এরকম ছোট শহরে এতগুলো অচেনা লোক!

বাসু হালদার মুখ ঘুরিয়ে মড়ার খাটের দিকে তাকাল। একটি যুবতী মেয়ের মুখখানা শুধু দেখা যাচ্ছে। শরীরটা একটা মোটা কম্বল দিয়ে ঢাকা।

শ্মশানের ঘাটবাবুর দয়া মায়া থাকতে নেই। মড়া দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে। বাসু হালদার জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল ?

—কলেরা। হঠাৎ, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।—আহা!

লোকটি খুব দুঃখের ভাব দেখিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল। তারপর দশ টাকার নোট

দু'খানা এগিয়ে দিয়ে বললে, নিন! বৃষ্টি ধরে এসেছে, চটপট কাজ শুরু করে ফেলি।

বাসু হালদার বলল, ডোম না এলে আপনারা কি করবেন ? চিতা সাজানো কি সহজ কথা ?

—ও আমরা ঠিক ব্যবস্থা করে ফেলব।

বাসু হালদার এবার গম্ভীরভাবে বলল, কই, দেখি ডাক্তারের সার্টিফিকেট!

যে লোকটি এগিয়ে এসে কথা বলছিল, সে একটু যেন চমকে গেল। তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে ডাক্তারের সার্টিফিটেকখানা কার কাছে রাখলি ?

একজন বলল, সেটা বোধ হয় ফেলে এসেছি!

বাসু হালদার কড়া হয়ে বলল, ফেলে এসেছেন ? জানেন না শ্মশানে মড়া নিয়ে এলে সার্টিফিকেট আনতে হয় ? যান, এক্ষুনি নিয়ে আসুন!

—এই বৃষ্টির মধ্যে আবার যেতে হবে ?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি এই কুড়িটা টাকা রাখুন না!

—টাকার কথা পরে। আগে সার্টিফিকেট দেখি!

আর একজন পকেটে হাত দিয়ে বলল, ও, এই তো, সার্টিফিকেট আমার কাছেই রয়ে গেছে।

লোকটি পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে দিল, তাতে কিছু একটা লেখা ছিল, এখন জলে ভিজে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে।

—এটা কি ? এটা তো কিছুই পড়া যাচ্ছে না!

—জলে ভিজে গছে, কি করব।

—তা বললে তো চলবে না। রুগী কিসে মরল, সেটা তো খাতায় লিখতে হবে।

–বললাম তো কলেরায়।

–আপনার মুখের কথায় তো হবে না। ডাক্তারের লেখা চাই।

লোকটি এবার এগিয়ে এসে বাসু হালদারের হাতে নোট দু'খানা গুঁজে দিয়ে বলল, কেন আর ঝামেলা করবেন ? খাতায় যা হোক একটা কিছু লিখে নিন না।

বাসু হালদার হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, ও সব চলবে না।

বাসু হালদারের মানে লেগেছে। সে এই ঘাটের বড়বাবু। তার একটা মাত্র পেট, সে টাকা পয়সার পরোয়া করে না। তাকে ঘুষ দিতে আসা!

বাসু হালদার নিচু হয়ে মড়ার গা থেকে কম্বলখানা একটানে তুলে ফেলল। তারপরই একটা আর্ত চিৎকার করে ফেলল সে।

মৃত যুবতীর বুক ও সারা শরীরে জমাট বাঁধা রক্ত। বুক ও পেট ফালা ফালা করে চেরা। কেউ যেন একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছে।

দৃশ্যটা দেখেই বাসু হালদার অদ্ভুত ধরনের ভয় পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তার মনে হল, এবার ওরা তাকেও কুপিয়ে কুপিয়ে কাটবে।

একটু অপেক্ষা করে বাসু হালদার দেখল, কেউ তাকে মারছে না। তখন সে মুখ থেকে আস্তে আস্তে হাত সরাল। তাকিয়ে দেখল, আর কেউ নেই কোথাও। লোকগুলো দৌড়ে পালিয়েছে।

খুনের মড়া নিয়ে এসেছিল লোকগুলো। বৃষ্টির রাতে গোপনে গোপনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টায় ছিল। যদি চেয়ারম্যান সাহেবের মায়ের অসুখ না করত, তাহলে বাসু হালদার কিছু জানতেই পারত না।

দশ টাকার নোট দু'খানা পাশেই পড়ে আছে। সে দুটো যেন কাঁকড়া বিছে, ছুঁতেও ভয় করল বাসু হালদারের। তাড়াতাড়ি সে মৃতদেহটির ওপরে কম্বলটা টেনে দিল আবার।

এর পরেই বাসু হালদারের ইচ্ছে হল দৌড়ে পালাতে।

এক ছুটে যদি সমস্ত চেনা লোকের জগৎ থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া যেত!

কিন্তু এই বৃষ্টি কাদার মধ্যে খোঁড়া পায়ে সে কত দূরেই বা দৌড়ে যাবে। পালাবেই বা কোথায় ?

তাছাড়া, পালাবে কেন, সে তো কোন দোষ করেনি; আর, মুখিয়াটাও যদি এই সময় থাকত!

এখন বাসু হালদারের কর্তব্য হচ্ছে পুলিশে খবর দেওয়া। খুনের মড়া কারা এসে ফেলে রেখে গেছে শ্মশানে, পুলিশই এখন এর দায়িত্ব নিক।

কিন্তু থানা এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। এই দুর্যোগের রাতে তিন মাইল রাস্তা সে যাবে কি করে ?

এখান থেকে আধ মাইল হেঁটে গেলে কেষ্টপুরের মোড় থেকে রিক্সা পাওয়া যায়। তবে, এত রাত্রে সেখানে কোন রিক্সাওয়ালা বসে থাকবে!

আঃ, কি যে করা যায় এখন ! ভয়-ভাবনায় বাসু হালদার ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

বাসু হালদারের ঘোর ভাঙল একটা কুকুরের কুঁই কুঁই শব্দে। কুকুরটি মৃতদেহটির কাছে এসে গন্ধ শুকঁছে।

বাসু হালদার আবার ধাতস্থ হয়ে কুকুরটাকে তাড়া দিল, হুস্ হুস্!

কুকুরটা যদি আবার মড়াটাকে টেনে নিয়ে যায়, তা হলেই কেলেঙ্কারি!

কুকুরটাকে একটা চ্যালা কাঠ তুলে ছুঁড়ে মারতে, তবে সেটা একটু দূরে গেল।

শ্মশানে বাসু হালদার বহু রাত্রে একা কাটিয়েছে। কিন্তু কোনদিন তার এমন ভয় হয়নি।

মৃতদেহটির দিকে আর একবার তাকাল। শুধু মুখখানা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। ফুটফুটে একটি যুবতীর মুখ। যেন একবার ডাকলেই জেগে উঠবে।

এখন তো এই মড়া ফেলে পুলিশ ডাকতে যাওয়ার আর প্রশ্নই ওঠে না। কুকুরে যদি মড়া টেনে নিয়ে যায় তাহলে আবার সে কোন্ ফ্যাসাদে পড়বে কে জানে। যে-লোকগুলো মৃতদেহটি এনেছিল, তারা সবাই অচেনা। বাসু হালদার পুলিশকে তাদের হদিশ কিছুই দিতে পারবে না। অন্য কোন জায়গা থেকে তারা এই খুনের

মড়া নিয়ে এসেছে।

বাসু হালদার আর দাঁড়াতে পারছে না। আস্তে আস্তে বসে পড়ল মড়াটার খাটিয়ার পাশে। আবার ঝুপ্ ঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ইস্, ভিজে যাচ্ছে মেয়েটা। ঠিক যেন একটা জ্যান্ত মেয়ে, ঘুমিয়ে পড়েছে, আর বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তার মুখ।

নিজের অজ্ঞাতেই বাসু হালদার হাতটা বাড়িয়ে মেয়েটির মুখ থেকে জল মুছে দিতে গেল।

ফর্সা, সরল মুখখানা। এরকম কোন সুন্দরী যুবতীর এত কাছাকাছি কখনো বসেনি বাসু হালদার। যদি জীবিত থাকত মেয়েটি, তাহলে তার গালে এরকম হাত দিলে সে রেগে চেঁচিয়ে উঠত না?

আহা, সত্যিই যদি তাই হয়! বাসু হালদারের ওপর রাগ করার জন্যই মেয়েটি যদি বেঁচে ওঠে! সে যত ইচ্ছে রাগ করুক, তবু বেঁচে উঠুক। একরম একটা সুন্দর মেয়েকে কোন্ পাষণ্ড খুন করল?

বাসু হালদার মেয়েটির গালে আবার হাত রাখল। কি নরম স্পর্শ! কতক্ষণ আগে মারা গেছে কে জানে, এত বৃষ্টিতে ভিজেছে, তবু তার গা-টা তো সে রকম ঠাণ্ডা নয়! যেন বেঁচে আছে!

বাসু হালদার মেয়েটির গালে একটা টোকা মেরে বলল, জেগে ওঠো, অনেকক্ষণ তো ঘুমোলে!

নিজেই হাসল বাসু হালদার। এ কখনো হয়! মেয়েটির শরীরে অন্তত পনের-কুড়িটা ছোরার আঘাত। শুধু একে খুন করেনি, কেউ যেন প্রতিহিংসা নেবার জন্যই এর সুন্দর শরীরটা ফালা ফালা করে কেটেছে।

কিছুক্ষণ খাটিয়ার পাশে বসে থেকে বাসু হালদার মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলল। তার নিঃসঙ্গ জীবনে এই যেন একমাত্র নারী, যার গালে হাত দিলেও কোন প্রতিবাদ করে না।

চুমু খেলে? একে একটা চুমু খেলে কি রাগ করবে?

এই চিন্তায় বাসু হালদার এমনই উতলা হয়ে উঠল যে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। সে মুখটা এগিয়ে এনে মেয়েটির ঠাণ্ডা রক্তহীন ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখল।

তখন মৃত মেয়েটি ফিসফিস করে বলে উঠল, আমার নাম অঞ্জলি সরকার। সোনাবাড়ি গ্রামের রতন নাগ আমাকে খুন করেছে। তুমি একটু দেখো—

ছিটকে খানিকটা দূরে পড়ে গিয়ে বাসু হালদার গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল। অজ্ঞান হয়ে গেল অবিলম্বেই।

পরের দিন বাসু হালদারের জ্ঞান ফিরেছিল দুপুরবেলা। সে অনবরত চিৎকার করছিল, রতন নাগ, সোনাবাড়ির রতন নাগ!

পুলিশ রতন নাগকে গ্রেপ্তার করে তাকে দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করবার পর বাসু হালদার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

পানিমুড়ার কবলে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মস্ত বড় পুকুরের ওপাশে একটু একটু জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবরস্থান। তার পর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল।

সে-বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আলিপুর দুয়ার। আমাদের বাড়ি পাওয়া গেল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হলো বলে এখানকার স্কুলে ভর্তি হতে পারলাম না। নতুন বছরে ভর্তি হতে হবে।

তাই দুপুরবেলা আমার কিছুই করার থাকে না। বাবা অফিসে চলে যান, মা খাওয়াদাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন। আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছে করে না দুপুরে। একটাও নতুন গল্পের বই নেই, আর পড়ার বই তো বেশিক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে। তাই আমি চুপিচুপি বাড়ির পেছনে পুকুরটার পাড়ে চলে যাই।

একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না। এখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে, কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই। আমার তীর-ধনুক আছে অবশ্য, তা দিয়ে বাঘ মারা যায় না। তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দু-একবার। কিন্তু ঐ কবরখানাটার পাশ দিয়ে যেতেই বেশি গা ছমছম করে। বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ বলেছিল, ঐ কবরখানায় নাকি ভূত আছে।

আমি এদিক-ওদিক তাকাই, কখনো ভূত দেখতে পাই না। কিন্তু কী রকম যেন একটা বোটকা গন্ধ পাই। আর থাকতে ইচ্ছে করে না, একছুটে ফিরে আসি। আমার যদি আর একটা বন্ধু থাকতো, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা দুজনে মিলে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখানে এসে এখনো যে আমার কোনো নতুন বন্ধু হয়নি ! একা একা ভূত দেখতে যেতে বড্ড খারাপ লাগে।

আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ছোট ছোট ইটের টুকরো বা পাথর ছুঁড়ে মারি জলের মধ্যে।

পুকুরটা বিরাট বড়, আর এখন বর্ষাকাল বলে কানায়-কানায় ভরা। দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গম্ভীর মনে হয়। কোথাও কোনো লোকজন নেই, আমি শুধু একা।

এক এক সময় আমার মনে হয়, আমাকে যেন কেউ দেখছে। যদিও কোথাও আর কেউ নেই, তবু যেন মনে হয়, আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লক্ষ করছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।

এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে, অমনি জলের ওপর গোল গোল ঢেউ ওঠে। কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখলাম, পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে। যেন ঠিক ঐখানটায় কোনো বিরাট কিছু প্রাণী দাপাদাপি করছে। এত বড় তো মাছ হতে পারে না ! কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

তার পর থেকে আমি সবসময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি। কিন্ত কিছু আর দেখা যায় না। আবার পুকুরটা শান্ত আর গম্ভীর।

পুকুরের ঘাটটা অনেক দিনের পুরোনো। পাথর দিয়ে তৈরি, কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা জায়গাগুলোয় গর্ত হয়ে সেখানে জল জমে থাকে, সেই জলেও ছোট ছোট মাছ দেখা যায়।

আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি। আমার তো বড়শি নেই, আর বড়শি দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি না। তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি। এক ধরনের মাছ, জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ওগুলোর নাম বেলেমাছ। সেই মাছগুলো আমাকে কাছাকাছি দেখেও ভয় পায় না। মাছগুলো অবশ্য দারুণ চালাক। আমি আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করি, ওদের একেবারে গায়ের কাছে হাত দেবার পর সুড়ুৎ করে পালিয়ে যায়। পাথরের তলার মধ্যেও অনেকখানি গর্ত আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়ে।

মাছ ধরার ঝোঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় কে যেন ডাকলো, এই বাবলু!

আমি চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো! তা হলে আমায় কে ডাকলো ? স্পষ্ট শুনলাম, অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা। মা তো ঘুমোচ্ছেন, তা হলে কে ডাকলো ! খুব কাছ থেকে। মা-ই কি আমাকে ডেকে চট্ করে কোথাও লুকিয়ে পড়লেন ?

জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম। কেউ নেই। কাছেই একটা মস্ত কদম ফুলের গাছ, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাও নেই।

অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগলো। কেউ কোথাও নেই, তা হলে আমায় ডাকলো কে ? আমি যে স্পষ্ট শুনেছি!

দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে। দোতালায় এসে দেখলাম, মা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি তবু মাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি কি এই পুকুরঘাটে গিয়েছিলে ?

মা তো খুব অবাক। বিছানার উপর উঠে বসে বললেন, কেন, পুকুরঘাটে যাবো কেন ? তুই বুঝি গিয়েছিলি ?

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি সেখানে খেলা করছিলাম, মনে হলো পেছন থেকে কে আমাকে ডাকলো। ঠিক তোমার মতন গলা।

মা বললেন, তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস!

—না মা! আমি স্পষ্ট শুনলাম।

মা রেগে গিয়ে বললেন, তুই কেন পুকুরঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা? দুপুরবেলা কেউ একলা যায়?

—কেন, কী হয় তাতে?

—না, কক্ষনো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই। আর কোনোদিন যাবি না। পড়াশুনো নেই?

—পড়াশুনো তো হয়ে গেছে!

—তা হলেও যাবি না! খবরদার!

মা আমাকে টেনে নিয়ে তাঁর পাশে শুইয়ে দিলেন। পুকুরধারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে, মা একথা বিশ্বাসই করলেন না।

বাবার অফিসের পিওন মুনাব্বর খাঁ প্রায়ই সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে আসে। কীসব অফিসের কাজ নিয়ে। মুনাব্বর খাঁ খুব দারুণ দারুণ গল্প বলতে পারে। সে-ই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল।

সেদিন সন্ধেবেলা আমি মুনাব্বর খাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পুকুরটার মধ্যে কত বড় মাছ আছে বলো তো? তুমি জানো?

মুনাব্বর খাঁ জিজ্ঞেস করলো, কেন বলো তো খোকাবাবু?

আমি বললাম, একদিন দুপুরবেলা আমি দেখেছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জিনিস জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। সেটা যদি মাছ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে।

মুনাব্বর খাঁ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বললো, খোকাবাবু, দুপুরবেলা পুকুরধারে কক্ষনো একলা যেও না। যেতে নেই।

—কেন, গেলে কী হয়?

—অনেক রকম বিপদ হয়। তুমি জানো না, এইসব পুরোনো পুকুরে পানিমুড়া থাকে?

—পানিমুড়ো কী?

—পানিমুড়া জানো না? পানিমুড়া হচ্ছে জলের ভূত!

—ধ্যাৎ! জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি?

—ওমা, তুমি পানিমুড়ার কথা শোনোনি, এ তো সবাই জানে! পানিমুড়া বড়দের কিছু বলে না, কিন্তু ছোটদের জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়।

—মোনাব্বর খাঁ, তুমি পানিমুড়া দেখেছ?

—হ্যাঁ, তিনবার দেখেছি। তাদের মাথাটা হয় কুমিরের মতন, আর গা-টা মানুষের মতন। এইসব পুকুর জানো তো, খুব পুরোনো, আগেকার দিনের রাজাদের আমলের। এইসব পুকুরের মাঝখানে গাদ্দি থাকে।

—গাদ্দি কী?

—গাদ্দি মানে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত। যারা পানিতে ডুবে মরে, পানিমুড়া ভূত হয়ে যায়, ঐ সুড়ঙ্গের মধ্যে

থাকে। মাঝে মাঝে ওপরে উঠে আসে। পানিমুড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতদের খুব ঝগড়া। পানিমুড়ারা ওপরে উঠে এলেই কবরখানার ভূতরা তাড়া করে যায়। আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানিমুড়া আর একটা কবরখানার ভূত খুব ঝটাপটি করে লড়াই করছে।

এই সময় মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গল্প হচ্ছে ?

আমি বললাম, মা, তুমি পানিমুড়া ভূত দেখেছো কখনো ? মুনাব্বর খাঁ দেখেছে!

মা বললেন, বসে বসে বুঝি ভূতের গল্প হচ্ছে এই সন্ধেবেলা! মুনাব্বর, তুমি বাবলুকে বানিয়ে বানিয়ে ওসব গল্প বোলো না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি ? ভূত হচ্ছে মানুষের কল্পনা।

মুনাব্বর বললো, না মেমসাব, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি !

মা হেসে বললেন, ছাই দেখেছো!

আমার মায়ের খুব সাহস। মা একদিন রাত্তিরবেলা একা একা কবরখানায় গিয়েছিলেন ভূত দেখার জন্য। কিছু দেখতে পাননি। মাকে দেখে ভূতেরা ভয় পেয়েছিল। বাবা বলেছিলেন, তোমার হাতে টর্চ ছিল তো, সেই আলো দেখে ভূতেরা পালিয়ে গেছে। তুমি অন্ধকারে একবার গিয়ে দেখো তো!

মা বলেছিলেন, ওখানে অনেক সাপখোপ আছে। অন্ধকারে গেলে যদি সাপে কামড়ায়? আমি ভূতের ভয় পাই না, কিন্তু সাপকে ভয় করি।

দু'তিন দিন আমি আর পুকুরধারে যাইনি। কিন্তু আমার মন ছটফট করে, দুপুরবেলা কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে কারুর ! মা ঘুমিয়ে পড়েন, আমার যে ঘুম আসে না! পড়া গল্পের বইগুলিই আরও কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম।

তারপর আবার একদিন, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম আবার। আজ আমার সঙ্গে একটা ছোট লাঠি। যদি ভূত-টুত আসে তা হলে লাঠি দিয়ে মারবো।

পুকুরের কাছে এসে দেখি; ঘাটের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের ডোরাকাটা গেঞ্জি আর মাথায় এমন টাক যে একটাও চুল নেই। লোকটা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে। সারা গা ভেজা। লোকটা এলো কোথা থেকে ? আমাদের এই পুকুরে তো বাইরের কোনো লোক স্নান করতে আসে না!

আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখলো। দেখেই যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফ মেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। তারপর ডুবে গেল।

আমিও খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখে ওরকম ভয় পেল কেন? আমার হাতের লাঠিটা দেখে ?

চোর-টোর নয় তো ? যদি চোর হয়, লোকটা তা হলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জঙ্গল দিয়ে পালাবে।

আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে, আর উঠছে না। এতক্ষণ কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে ! আমি মনে মনে এক দুই তিন করে পাঁচশো পর্যন্ত গুনে ফেললাম, তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না। এই রে, লোকটা মরে গেল না তো? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না।

তা হলে কি এক্ষুনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত ? কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে ? আরও একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তখন আমার মনে হলো, ওটা ভূত নয় তো ? ও-ই কি পানিমুড়া ? কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে। মুনাব্বর খাঁ যে বলেছিল, পানিমুড়ার মুখটা কুমিরের মতন! এ যে একদম মানুষের মতন ! শুধু টাক মাথা। শুধু তাই নয়, লোকটা যখন আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল তখন দেখেছি, ওর চোখের ওপর ভুরুও নেই। সারা গায়ে কোনো লোমও নেই। মুনাব্বর নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছিল। সে পানিমুড়া কোনোদিন দেখেনি।

তক্ষুনি ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেবো ভাবছি, এক সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠলো। শুধু একটা হাত। আমি ভাবলাম, লোকটা এবার উঠে আসবে। তা হলে পানিমুড়া নয়। কোনো চোরই নিশ্চয়ই।

শুধু হাতটাই উঁচু হয়ে রইলো, আর কিছু না। লোকটার মাথাও দেখা গেল না। তারপর মনে হলো, সেই হাতটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতে লম্বা লম্বা আঙুল, তাতে বিচ্ছিরি নোখ। হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগলো। ঠিক যেন আমায় ডাকছে।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে ?

তখন দেখলাম, জলের মধ্যে দুটো চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে। চোখ দুটো মাছের মতন, পলক পড়ে না। কিন্তু মাছের নয়, চোখ দুটো সেই লোকটার। আমার একবার ইচ্ছে হলো, পালিয়ে যাই।

আবার ভাবলাম, দেখি না শেষ পর্যন্ত কী হয়। আমার তো হাতে লাঠি আছে।

এবারে সেই হাতটা খুব কাছে চলে এলো। মনে হলো যেন আমার পা চেপে ধরবে। এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু! বাবলু!

কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার ওপর। ঠিক লাগলো কি না বুঝতে পারলাম না, হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

আবার কেউ আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু!

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সামনে জলের ওপর সেই হাতটা

আবার উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম, অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল, আমি ঝপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম।

জলে পড়েই মনে হলো, আমি আর বাঁচবো না। আমি যে সাঁতার জানি না! পানিমুড়া আমার পা ধরে সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, ওমা—! মা!

জলের মধ্যে আমি হাবুডুব খেতে লাগলাম। দম আটকে আসছে। পানিমুড়া এখনো আমার পা ধরেনি। আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে পাচ্ছে না বোধ হয়।

এরই মধ্যে একবার কোনো রকমে জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম, মাঠ দিয়ে ছুটে আসছেন আমার মা। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, মা—কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম। মা পাড় থেকেই এক লাফ দিয়ে জলে পড়লেন।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে শুয়ে আছি। মা আর আমাদের রাঁধুনি আমার গায়ে গরম জলের সেঁক দিচ্ছে। আমি চোখ মেলতেই মা বললেন, আমি বলেছিলাম না, ওর পেটে বেশি জল ঢোকেনি ! এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে!

মা ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কী যে হতো, ভাবতেও আমার আজও গা কাঁপে। মা ওখানে গেছেন কী করে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। পরে শুনেছি সেকথা। মা ঘুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানের কাছে কে যেন ডাকলো মা, মা! ঠিক আমার গলা। মা চোখ মেলে দেখলেন, কেউ নেই। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তখন বাইরে থেকে আমার সেই মা ডাক শোনা গেল। তারপর পুকুরঘাট থেকে।

আমি জলে পড়ার সময় মা মা বলে ডেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এত দূর থেকে মায়ের তো সেটা শুনতে পাওয়ার কথা নয় ! তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন।

মা আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাবলু, তোকে আমি একা একা পুকুর ঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম, তবু গেলি কেন ? কেন জলে নেমেছিলি ?

আমি বললাম, মা, আমাকে পানিমুড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মা বললেন, বাজে কথা।

আমি বললাম, না সত্যি।

মা বললেন, মোটেই না! তুই পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলি!

মা কিছুতেই পানিমুড়ার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমাদের রাঁধুনি বললো, হ্যাঁ গো দিদি, এসব পুরোনো পুকুরে অনেক ভয়ের জিনিস থাকে।

মা বললেন, সাঁতার না জানলে লোকে জল দেখে ওরকম অনেক ভয়ের জিনিস বানায়। আমি কাল থেকেই বাবলুকে সাঁতার শেখাবো।

এরপর সাতদিনের মধ্যে আমি সাঁতার শিখে গেলাম। পানিমুড়াকে আর কখনো দেখিনি। তবে আমি সাঁতার কাটতে যেতাম নদীতে, ঐ পুকুরে আর নয়।

ভয়

হুমায়ূন আহমেদ

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কীভাবে পরিচয় হল আগে বলে নিই। কেমিস্টি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়াগাঁ ধরনের এক শহরে গিয়েছি (শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না। মূল গল্পের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু অসুবিধা আছে)। এই অঞ্চলে আমি কখনো আসিনি। পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িকে কলেজ বানানো হয়েছে। গাছগাছড়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিশাল কম্পাউন্ড। কিন্তু লোকজন নেই, পরীক্ষার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। খাঁখাঁ করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম।

একটা সময় ছিল যখন এগজামিনারদের আলাদা খাতিরযত্ন ছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানান ধরনের খাবার। জাল ফেলে পাকা রুই ধরা হত। যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাত্তাই দেয় না। বিরক্ত চোখে তাকায়।

আমার জায়গা হল কেমিস্ট্রি ল্যাবোরেটরির পাশের একটা খালি কামরায়। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, আপনাকে হোস্টেলেই রাখতে পারতাম। কিন্তু বুঝতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বস্তি বোধ করতেন। ছাত্ররা তো আর আগের মতো নেই। মদটদ খায়। একবার বাজে মেয়ে নিয়ে এসে নানান কীতি করেছে। বিশ্রী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়াদাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।

থাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোররুম ছিল। একটা মাত্র জানালা। রেলের টিকিট দেয়ার জানালার মতো ছোট। ঘরভরতি মাকড়সার ঝুল। দুটি বিশাল এবং কুৎসিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অসম্ভব ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। ঝাড়ুদারকে পাঁচটা টাকা দিলাম মাকড়সা এবং মাকড়সাব ঝুল পরিষ্কার করার জন্যে। সে কী করল কে জানে ঘর যেমন ছিল তেমনি রইল। দুটির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের রঙ কালো। চোখ জ্বলজ্বল করছে।

সন্ধ্যাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অথচ দিনের বেলায় ইলেকট্রিসিটি আছে দেখেছি। হারিস বলল, রাত

দশটার পর কারেন্ট আসে। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কী?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্ট্রির ডেমনেসট্রেটর সিরাজউদ্দিন। এঁর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেমন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মুখভরতি আর্নেস্ট হেমিংওয়ের মতো চাপদাড়ি। মাথায় টুপি। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। বেঁটেখাটো একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মতো হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিয়া রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালই আছি।'

'আপনার খুব তকলিফ হল স্যার।'

'না, তকলিফ আর কী?'

'আগে এগজামিনার সাহেবরা এলে প্রিন্সিপাল সারের বাসায় থাকতেন। কিন্ত ওঁর এক ছেলের মাথার দোষ আছে। প্রিন্সিপাল স্যার এখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।'

আমি বললাম, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—স্যার, ভেতরে এসে একটু বসব?

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন গল্প করি।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, এখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা ডাকবাংলো আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে রেভিনিউর সি.ও. তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। কোয়ার্টারের খুব অভাব।

'বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধু ঘুমানো। বইপত্র নিয়ে এসেছি, সময় কাটানো কোনো সমস্যা না।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন—রাতে ঘর থেকে বেরুতে হলে একটু শব্দটব্দ করে তারপর বেরুবেন। খুব সাপের উপদ্রব।

'তাই নাকি?'

'জি স্যার। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া খায়।'

আমার গা হিম হয়ে গেল। এ তো মহাযন্ত্রণা! প্রায় দুশ গজ দূরে ঝোঁপ - ঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েকবার বাথরুমে যেতে হয়।

'তবে স্যার ঘরের মধ্যে কোনো ভয় নেই। চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে দিয়েছি। সাপ আসবে না।'

'না এলেই ভাল।'

'যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি।'

'বসুন বসুন। যেভাবে আপনার আরাম হয় সেভাবেই বসুন।'

ভদ্রলোক পা উঠিয়ে বসলেন এবং একের পর এক সাপের গল্প শুরু করলেন। সেইসব গল্পও অতি বিচিত্র। রাতে ঘুম ভেঙেছে, হঠাৎ তাঁর মনে হল নাভির উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ্য করলেন একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর নাভির উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আসল সাপ। শঙ্খচূড়।

একসময় আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, সাপের গল্প আর শুনতে ইচ্ছা করছে না। দয়া করে অন্য গল্প বলুন।

ভদ্রলোক সম্ভবত সাপের গল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্প জানেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গমদৃশ্যের বর্ণনা। চৈত্রমাসের এক জ্যোৎস্নায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, সাপ যে-জাগায় এইসব করে তার মাটি কবচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে।

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কী অদ্ভুত কথা! আমি ঠাট্টা করে বললাম, আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন ?

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সরল ভঙ্গিতে বললেন, জি না স্যার।

লোকটি নির্বোধ। মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠছে না। সাপসম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দেবে বলে বোধহয় তৈরি হয়েই এসেছে। মুক্তি পাবার জন্যে একসময় বলেই ফেললাম, সারা দিনের জার্নিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন বাতিটাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ব।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কী বলছেন স্যার ? ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন ? ভাত তো এখনও আসেনি। দেরি হবে। আমি প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তারপর আপনার কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে। গোশ্‌ত রান্না হচ্ছে।

'তাই নাকি ?'

'জি। আপনি গরু খান তো ?'

'জি খাই।'

'এখানে কসাইখানা নাই। মাঝে মাঝে গরু কাটা হয়। আজ হাটবার। তাই গরু কাটা হয়েছে। প্রিন্সিপাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন।'

'ও আচ্ছা।'

'পঁচিশ টাকা করে ভাগ।'

'তাই বুঝি ?'

'প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্না খুব ভাল।'

'তাই নাকি ?'

'জি। তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বৌ। যে-ছেলেটা পাগল—তার বৌ।'

'ও আচ্ছা।'

'বিরাট অশান্তি চলছে প্রিন্সিপাল স্যারের বাড়িতে। ছেলে বটি নিয়ে তার মাকে কোপ দিতে গেছে। বৌ গিয়ে মাঝখানে পড়ল। এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এইজন্যেই রান্নার দেরি হচ্ছে।'

'কোনো হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেই হত। এদের দুঃসময়ে....'

'কী যে বলেন স্যার! আপনি আমাদের মেহমান না ? তা ছাড়া ভদ্রলোকের খাওয়ার মতো হোটেল এই জায়গায় নাই। নিতান্তই গণ্ডগ্রাম, হঠাৎ সাবডিভিশন হয়ে গেল। ভাল একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নাই।'

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এল। দু'টো প্লেট, সিরাজউদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে খেতে বসলেন। হাত ধুতে ধুতে বললেন, প্রিন্সিপাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে খেতে বলেছেন। আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান। আপনি একা একা খাবেন, তা কী হয়!

প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বৌ অনেককিছু রান্না করেছে। অসাধারণ রান্না। সামান্য সব জিনিসও রান্নার গুণে অপূর্ব হয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। বেচারি হয়তো চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেঁধেছে। আজ রাতে সে হয়ত কিছু খাবেও না।

'সিরাজউদ্দিন সাহেব !'

'জি স্যার !'

'প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের বৌকে বলবেন, আমি এত ভাল রান্না খুব কম খেয়েছি। দ্রৌপদী এরচে ভাল রাঁধত বলে আমার মনে হয় না।'

'জি স্যার, বলব। তবে প্রিন্সিপাল স্যারের স্ত্রীর রান্নার কাছে এ কিছুই না। আছেন তো কিছুদিন, নিজেই বুঝবেন।'

প্রিন্সিপাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ বলে মনে হল। তিনি একটা টর্চ-লাইট পাঠিয়েছেন। ফ্লাস্কভরতি চা পাঠিয়েছেন। পান সুপারি জর্দাও আছে কৌটায়।

খাওয়াদাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চা খেলেন, পান খেলেন, দীর্ঘ একটা সাপের গল্প বললেন। বিদায় নিলেন রাত এগারোটার পর। যে লোকটি ক্রমাগতই সাপের কথা বলেছে তার দেখলাম তেমন ভয়টয় নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্যি হনহন করে চলেছে।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে হালকা ধরনের কিছু বই পড়া যায়। হারিকেনের এই আলোয় সেটা সম্ভব হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে সুটকেস খুললাম বই বের করব। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হল। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অথচ ভয়ের কোনোই কারণ ঘটেনি। তবু আমার হাত-পা কাঁপতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ওপাশেই

অশরীরী কিছু দাঁড়িয়ে আছে। যেন এক্ষুনি সেই অশরীরী অতিথি ভয়ংকর কিছু করবে। নিজের অজান্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—কে, কে ? আর তখন শুনলাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট্ট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল। আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদের আলোয় চারদিক থৈথৈ করছে। কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন ? এখনও গা ঘামে ভেজা। হৃৎপিণ্ড লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। হালকা বাতাস দিচ্ছে, বেশ লাগছে দাঁড়িয়ে থাকতে। লুঙ্গি পরা খালি-গায়ের একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, আদাব স্যার।

'আদাব। তুমি কে ?'

'আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।'

'তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে ?'

'জি স্যার। লাইব্রেরি ঘরের সামনে বসে-ছিলাম।'

'কাউকে যেতে দেখেছ ?'

'আজ্ঞে না। কেন স্যার ? কি হইছে ?'

'না, এমনি।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল। আমি নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে শুতে গেলাম। স্টিফান কিংয়ের লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রগরগে ব্যাপার। একবার পড়তে শুরু করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয়ভয় লাগে আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি ঘুমুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম ? রহস্যটা কী ?

আমি খুব একটা সাহসী মানুষ এরকম দাবি করি না। কিন্তু অকারণে এত ভয় পাবার মতো মানুষও আমি নই। একা একা বহু রাত কাটিয়েছি।

সে-রাতে আমার ভাল ঘুম হল না।

দিনের বেলাটা খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল। একুশজন ছেলে পরীক্ষা দেবে। জোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই। ল্যাবরেটরির অবস্থা শোচনীয়। একটামাত্র 'ব্যালেন্স' তাও ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রয়োজনীয় কেমিক্যালসও নেই। সে নিয়ে কারও মাথাব্যথাও নেই। কেমিস্ট্রির দুজন টিচার। ওঁরা নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, কলেজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাসট্লাসও তেমন হয়নি। একটু দেখেশুনে নিবেন স্যার। পাশমার্কটা দিয়ে দিবেন।

আমি হেসে বললাম, কী করে দেব বলুন। দেবার তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করেনি।

কী করে করবে বলেন। স্ট্রাইক-ফ্রাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।'

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম ব্যবস্থা করার জন্য ছুটাছুটি করছেন। চেষ্টা করছেন কীভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়। একুশজন ছাত্রছাত্রীর কেউ তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি মেয়ে সল্ট অ্যানালিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বভাব- মতো কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধমক দিলেন, খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় খাবি। গোড়া থেকে কর। ড্রাই টেস্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।

এগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সবসময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না-দেখার ভান করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের জন্যে আমার খানিকটা মমতাও লাগছে। যন্ত্রপাতি নেই, কেমিক্যালস নেই, স্যারদের কোনো আগ্রহ নেই, ছেলেরা করবে কী?

দুপুরবেলা প্রিন্সিপাল স্যার দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। ভদ্রলোককে মনে হল বিপর্যস্ত। কিছুক্ষণ মুখ কুঁচকে রেখে বললেন, দেন, সবকটিকে ফেল করিয়ে দেন। ঝামেলা চুকে যাক।

কোনো প্রিন্সিপালকে এরকম কথা বলতে শুনিনি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, রাতে অসুবিধা হয়নি তো?

'জি না, হয়নি।'

'সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোঁজখবর রাখতে বলেছি। কোনোকিছুর দরকার হলেই তাকে বলবেন। সংকোচ করবেন না।'

'না, করব না।'

'সাপের গল্প বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাত্তা দেবেন না। এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই।'

'তাই নাকি?'

'আপনাকে ভয় খাইয়ে দিয়েছে বোধহয়? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি, এমন অবস্থা, ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম। হা হা হা।'

প্রিন্সিপাল সাহেব বেশিক্ষণ দাঁড়ালেন না। আগামীকাল সন্ধ্যায় চা খাবার দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চলে গেলেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হল রাত নটায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধ্বস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয়নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালই দিয়েছেন।

আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন। খাওয়াদাওয়া করে নিজের জায়গায়

ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যেই বোধহয় আর সাপের গল্প শুরু হল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন।

'স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েন। রাতবিরাতে বেরুবার সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজন।'

'খুব খেয়াল রাখব।'

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মতো হল। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। নিশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজার কড়ায় টন করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়েও কড়া নাড়ল না। ঠিক তখন ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক। জগ থেকে ঢেলে এক গ্লাস পানি খেলাম। গলা উঁচিয়ে ডাকলাম—কালিপদ, কালিপদ ! কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আকাশে অল্প মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চাঁদ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলোআঁধারি। ঢাকা শহরে বসে এই দৃশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। ঝিঁ ঝি ডাকছে। কিন্তু সেই ঝিঁঝির ডাকও ম্যাজিকের মতো হঠাৎ করে থেমে যাচ্ছে। সেই সময়টা বেশ অদ্ভুত মনে হয়। সবাই যেন বিরাট কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বইপত্র পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল শিয়াল বোধহয় প্রহরে প্রহরে ডাকে। এই ধারণাও দেখলাম সত্যি না। সারাক্ষণই শিয়াল ডাকছে। সেই ডাকের মধ্যে একটা করুণ ব্যাপার আছে। শুনতে ভাল লাগে।

ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসনকোসন। সম্ভবত পুকুরে ধোবে।

'এই কালিপদ !'

'আদাব স্যার।'

'একটু শুনে যাও তো !'

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙ্গিটি বেশ সুন্দর।

'রাতদুপুরে ধুতে যাচ্ছ নাকি ?'

'হুঁ স্যার।'

'আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেন ?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'কতদূর।'

'দুই মাইলের উপরে হইব।'

'কালিপদ, তুমি একটা কাজ করতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারব স্যার, বলেন।'

'তুমি কি আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে ?'

কালিপদ অবাক হয়ে বলল, এখন ?

'হ্যাঁ, এখন। তুমি তোমার কাজ সেরে আসো, তারপর যাব।'

'আমি উনারে ডাইকা নিয়া আসি ?'

'না, ডেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোনো অসুবিধা আছে?'

'আজ্ঞে না, অসুবিধা নাই। আমি আসতাছি।'

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি ঝোঁকের মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হঠাৎ ভয় পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা বের করতে না পারলে আজ রাতেও আমার ঘুম হবে না। আদিভৌতিক কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক ছাড়া এ পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুকেই নিউটনের গতিসূত্র মানতে হয়।

ডালভাঙা ক্রোশ বলে একটা কথা বইপত্রে পড়েছি। আজ রাতে সেটা বাস্তবে জানা গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদূর ? সে তার উত্তরে ফোঁৎ-জাতীয় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কম বলে। কথাবার্তা হ্যাঁ না-র মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে গ্রামট্রামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কম বলার নিয়ম। তার উপর লক্ষ্য করলাম লোকটি একটু ভীতু টাইপের, কোনো শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এদিকওদিক তাকাচ্ছে। আমি যখন বলছি—কী হল কালিপদ ? তখন আবার হাঁটা শুরু করছে। আমি আগেও দেখেছি দারোয়ানরা সবসময় ভীতু ধরনের হয়।

একসময় আমরা ছোটখাটো একটা নদীর ধারে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর চেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে, এখন দেখাচ্ছে সরু ফিতার মত। পায়ের পাতাও হয়তো ভিজবে না।

'কালিপদ—নদীর নাম কী ?'

'বিরুই নদী।'

'বিরুই চালের কথা শুনেছি, এই নামে নদীও আছে কে জানত। নদী পার হতে হবে ?'

'আজ্ঞে না।'

'এসে পড়েছি নাকি ?'

'হ।'

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামবে। মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্ত যাত্রা। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কি বলব কিছুই ঠিক করিনি। আগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোনো লাভ হয় না।

আসল কথা বলবার সময় ঠিক করে রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এরকম হয়েছে। যৌবনে জরি নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশি ভাল পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবার আমাকে খবর পাঠাল আমি যেন সন্ধ্যাবেলায় তাদের ছাদে অপেক্ষা করি। সারাদিন ভাবলাম ছাদের নির্জনতায় কীসব কথা বলব। কতটুকু আবেগ থাকবে। কোন পর্যায়ে হাতে হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হল না। প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল। জরি কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, ছোটলোক। আমি কড়া গলায় বললাম, আমি ছোটলোক না, ছোটলোক হচ্ছ তুমি। শুধু তুমি একা না, তোমাদের বাড়ির সবাই ছোটলোক। এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর। আবেগ ভালবাসার একটি কথাও দুজনের কেউ বললাম না।

'স্যার, এই বাড়ি।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছোট্ট একটা টিনের ঘর। কলাগাছ দিয়ে ঘেরা। খড়-পোড়ানো গন্ধ আসছে। পরিষ্কার ঝকঝকে উঠান। উঠানে দাঁড়াতেই কুকুর ডাকতে লাগল। চোর ভেবেছে বোধহয়। ভেতর থেকে সিরাজউদ্দিন চেঁচালেন, কে, কে ? কালিপদ বলল, দরজাটা খুলেন। আমি কালিপদ। দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হারিকেন জ্বালানো হল। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি লুঙ্গি পরে খালিগায়ে বের হয়ে এলো। চোখ কপালে তুলে বললেন, স্যার আপনি ?

'দেখতে এলাম আপনাকে।'

'কেন ?'

'কোনো কারণ নেই। ঘুম আসছিল না, ভাবলাম দেখি রাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা যায় । আপনি বোধহয় শুয়ে পড়েছিলেন ? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ?'

'জি।'

'খুব লজ্জিত, কিছু মনে করবেন না।'

'আসেন, ভিতরে এসে বসেন।'

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিস্ময় এখনও কাটেনি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কোনো ঝামেলা হয়েছে স্যার ?

'না না, ঝামেলা কী হবে ? বেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি!'

'স্যার একটু চা করি ?'

'অসুবিধা না হলে করেন।'

'না না, কোনো অসুবিধা নাই। কোনো অসুবিধা নাই।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ছুটাছুটি শুরু করলেন। উঠোনে চুলা জ্বালানো হল। কালিপদ দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয় চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই রাতদুপুরে কোথায় এসব পাবে কে জানে !

'সিরাজউদ্দিন সাহেব !'

'জি স্যার ?'

'লোকজন দেখছি না যে ! আপনি একাই থাকেন নাকি?'

'বিয়েশাদি তো করি নাই।'

'করেননি কেন?'

'ভাগ্যে ছিল না। কষ্টের সংসার ছিল। নিজেই খেতে পেতাম না।'

'এখন তো বোধহয় অবস্থা সেরকম না।'

'জি, এখন মাশাআল্লাহ সামলে উঠেছি। কিছু জমিজমাও করেছি।'

'তাই নাকি ?'

'অতি অল্প। ধানী জমি।'

'একা একা থাকেন, ভয় লাগে না ?'

'ভয় লাগবে কেন ?'

সিরাজউদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আমি খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভয়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই। কিন্তু কীভাবে সেটা করা যায় ? আমি ইতস্তত করে বললাম, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?

জি না। এইসব হচ্ছে কুসংস্কার। এই গ্রামেই একটা রেন্ট্রি গাছ আছে। লোকে নানান কথা বলে। কী কী নাকি দেখে। আমি কোনোদিন দেখি নাই। রাতবিরাতে কত যাওয়া-আসা করেছি !

চা তৈরি হয়েছে। চিনি ছিল না। খেজুর রসের চা। চমৎকার পায়েস- পায়েস গন্ধ। কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন বললেন, তবে জিন বলে একটা জিনিস আছে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, আপনি বিশ্বাস করেন ?

'করব না কেন ? কোরান শরীফে পরিষ্কার লেখা জিন এবং ইনসান। হাশরের দিন মানুষের যেমন বিচার হবে, জিনেরও হবে।

'আপনি জিন দেখেছেন কখনো ?'

'জি না। সাধারণ লোকে দেখে না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ। কোনোরকম বিশেষত্ব নেই। আমার হঠাৎ ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না। সরাসরি এই প্রসঙ্গটা আনাও মুশকিল। তবু একবার বললাম, আপনি চলে আসার পর ঐ রাতে কেমন যেন হঠাৎ করে ভয় পাই।

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই। ভয় পাওয়াটা ভাল। তা হলে সাবধানে চলাফেরা করবেন। অবসাধান হলেই সর্বনাশ। রাতে বের হলে টর্চলাইটটা সঙ্গে রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন।

বিদায় নিতে রাত একটা বেজে গেল। সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন। তিনি এলেন বিরই নদী পর্যন্ত। চাঁদের আলো আছে। চারদিক স্পষ্ট দেখা যায়। তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উলটা দিকে রওনা হলেন। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেই মুহূর্তে তিনি বাঁশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সেইরকম হল। অন্ধ যুক্তিহীন ভয়। যেন ভয়ংকর অশুভ একটা কিছু আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে আসছে। সেই অশুভ জিনিসটাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি। এর ক্ষমতা অসাধারণ। এ অন্য জগতের কেউ। এ জগতে তাকে কেউ জানে না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাঁপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে লক্ষ করলাম আমি মাটিতে বসে আছি। কালিপদ আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছে, 'কী হইল স্যার ? কী হইল ?

'কিছু হয়নি। মাথাটা কেমন যেন করল।'

'মাথা ধুইবেন স্যার ? নদীর পানি দিয়া...।'

'মাথা ধুতে হবে না। চলো রওনা দিই।'

বলেও রওনা দিতে পারলাম না। ভয় একেবারেই নেই, কিন্তু শরীর অবসন্ন। অসম্ভব ঘুম পাচ্ছে।

'কালিপদ!'

'জে আজ্ঞে।'

'একটু আগে তোমার কি কোনো ভয়টয় লেগেছে?'

'জে না।'

'ও আচ্ছা! চলো আস্তে আস্তে হাঁটি।'

কালিপদ বারবার মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখছে। পাগল ভাবছে কি না কে জানে ! ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না। যে-লোক মাঝরাত্রিতে বেড়াতে বের হয়, অকারণে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায়, সে আর যা-ই হোক খুব সুস্থ নয়।

পরের দিনটা আমার খুব খারাপ কাটল। কিছুতেই মন বসাতে পারি না। ভাইভা শুরু হয়েছে। ছাত্রদের প্রশ্নের জবাবগুলিও ঠিকমতো শুনছি না। বি. এসসি, পরীক্ষা দিতে এসে একজন দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমুলাতে দুটি ক্লোরিন অ্যাটম দেখাচ্ছে। প্রচণ্ড রাগ হবার কথা। রাগও হচ্ছে না। পাশ নাম্বার দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি। কেমিস্ট্রির হেড বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ ?

আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, হ্যাঁ, কিছুতেই মন বসছে না। খুব টায়াড লাগছে।

'রাতে ঘুম কেমন হয়েছে ?'

'ঘুম ভালই হয়েছে।'

'যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তা হলে এক ডোজ অষুধ দিতে পারি।'

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, আপনি কি হোমিওপ্যাথিও করেন ?

জি। ছোটখাটো একটা ডিসপেনসারি আছে। রুগিটুগি ভালই হয়।

মফস্বল কলেজের টিচারদের এই এক জিনিস। একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশি নন। প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোনো পেশা আছে। কোন পেশাটি প্রধান বোঝা মুশকিল।

'কী স্যার, হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে ?'

'জি না, ভূতপ্রেত এবং হোমিওপ্যাথি এই তিন জিনিস আমি বিশ্বাস করি না। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বললেন, হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বাস করেন না কেন ? এটা তো হাইলি সাইন্টিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যান সাহেবের কথাই ধরেন। উনি নিজে একজন পাশ-করা ডাক্তার ছিলেন।

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হানড্রেড পাওয়ারের একটি অষুধে যে আসলে কোনো অষুধই থাকে না সেটা মোলার কনসাইট্রেশন এবং অ্যাভাগেড্রো নাম্বার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা যেত। তর্কের ক্ষেত্রে সবসময় তা-ই করি। আজ ইচ্ছে করছে না। পাঁচটা বাজতেই উঠে পড়লাম। পরীক্ষা তখনও চলছে—চলতে থাকুক। আমি বললাম, আপনারা ভাইভা শেষ করে দিন, আমি ঘরে চলে যাব।

'প্রিন্সিপাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাওয়ার কথা ?'

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আরও খারাপ হল। কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

প্রিন্সিপাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে অনেকক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, ও আচ্ছা আচ্ছা। আসুন আসুন। চা খেতে বলেছিলাম, তাই না ? কিচ্ছু মনে নেই। আসুন বারান্দায় বসি। নানান ঝামেলায় আছি ভাই।

তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দরজা ধরে পাঁচ-ছ'বছর বয়সের মিষ্টি চেহারার মেয়ে কৌতূহলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দুএকটা কথা বলা উচিত- কিন্তু ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিংস্র পশুর গর্জনের মতো গর্জন কানে আসছে। একটি মেয়েও কাঁদছে। কখনো কখনো কান্না থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। এইরকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। ছেলেটা বড় ঝামেলা করছে। শুনেছেন বোধহয় ?'

'জি শুনেছি।'

'ভাল খবর কেউ কখনো শোনে না, কিন্তু এইসব খবর সবাই শুনে ফেলে। নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচিত্র সব চিকিৎসার কথা বলে।'

আমি চুপ করে রইলাম। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, সেই

জাতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডায় গোসল দিয়ে নিউমোনিয়া বাধাবে।

'ডাক্তারি চিকিৎসা করাচ্ছেন না?'

'তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সবরকম চিকিৎসাই চলছে। কোনোটাই লাগছে না।'

'অসুখটা শুরু হল কীভাবে?'

প্রিন্সিপাল সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হয়তো তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এল। শুধু চা নয়—মিষ্টি, সিঙ্গারা, কচুরি।

'নিন, চা নিন। খিদে না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না। সবই দোকানের কেনা। এদিকে আবার খুব ডাইরিয়া হচ্ছে।'

চা-টা চমৎকার। এক চুমুক দিয়েই মাথাধরাটা অনেকখানি সেরে গেল। প্রিন্সিপাল সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন, কী করে অসুখটা শুরু হল সত্যি জানতে চান?

'বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।'

'না না, শুনুন। গত বৎসর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে এখানে আসে। আমি অনেক দিন থেকেই আসতে বলছিলাম, ছুটি পায় না, আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি, ছুটিছাটা কম। সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। আমি এখানে এসেছি দুবছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও খুব খুশি।'

'রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজব করছি। সিরাজউদ্দিন এসেছে। সাপের গল্পটল্প করছে। রাত দশটার দিকে সিরাজউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেমন হয়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কোনোমতে বলল— তার নাকি অসম্ভব ভয় লাগছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি-তামাশা করতে লাগল। তখন কিছু বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি ঐ রাতেই তার পাগলামির প্রথম শুরু।'

প্রিন্সিপাল সাহেব চুপ করলেন। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছি। আমার শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, কয়েকদিন পর আবার এরকম হল। সেও রাতের বেলা। কলেজের কিছু প্রফেসরকে খেতে বলেছিলাম। তারা খাওয়াদাওয়া করে চলে যাবার পর আবার ছেলে ঐরকম করতে লাগল।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেবেরও দাওয়াত ছিল?

'হ্যাঁ ছিল। কলেজ স্টাফের সবাইকে বলেছিলাম।'

'তারপর কী হল বলুন?'

'আর বলার কিছু নেই। রোজই ওরকম হতে লাগল।'

'কখন হত?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা।'

আমি কোনো কথা না বলে পরপর দুটা সিগারেট শেষ করলাম। চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পারছি না। আমি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেব কি প্রায়ই আসে নাকি এখানে ?

'আসে। আমার ছোট ছেলেটাকে প্রাইভেট পড়ায়। সিনসিয়ার লোক। রোজ সাতটার সময় আসে, রাত দশটা-সাড়ে দশটার আগে যায় না।'

'আমি কি আপনার ছেলেটাকে একটু দেখতে পারি ?'

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। না গেলেই ভাল করতাম। সাতাশ-আটাশ বছরের একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা। কী যে অসহায় লাগছে ! ছেলেটি আমার দিকে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, একে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করান।

'ঢাকাতেই তো ছিল। কোনোরকম উন্নতি হয় না। টাকার শ্রাদ্ধ। এখানে বরঞ্চ ভাল আছে। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে বেশ খাতির। সে এলে শান্ত থাকে। প্রায় স্বাভাবিক আচরণ করে।'

'তাই নাকি ?'

'জি। কয়েকদিন ধরে সিরাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটার উগ্র স্বভাব হয়ে গেছে। গত পরশু বটি নিয়ে তার মাকে কাটতে গিয়েছিল।'

'সিরাজউদ্দিন সাহেবের কথাটথা বলে ?'

'না, কথাটথা কিছু না। চুপচাপ থাকে, ও এলে খুশি হয় এইটা বুঝি। মুচকি মুচকি হাসে। সিরাজউদ্দিন গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবারে শান্ত হয়ে যায়।

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটির দিকে। সে গোঙানির মতো একটা চাপা শব্দ করছে। মুখ থেকে অনবরত লালা বেরুচ্ছে। মুখ ঈষৎ হাঁ হয়ে আছে। একটু আগেই তাকে অসহায় লাগছিল, এখন সেরকম লাগছে না। বরং কেমন যেন ভয়ংকর লাগছে।

আমি ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললাম, প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, আমাকে আজ রাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।

'কী বললেন ?'

'আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। কেন পারছি না সেই কারণও আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কোনোদিন পারব বলেও মনে হয় না।'

'আমি আপনার কথা কিছুতে বুঝতে পারছি না।'

'আপনি পরীক্ষা কয়েকদিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনার এসে বাকিটা

শেষ করবে।'

'অসম্ভব কথা আপনি বলছেন।'

'তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।'

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি স্মৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলি। নিজেকে বোঝাই যে সমস্তটাই ছিল উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা। গ্রামে নির্জনতা কোনো-না-কোনোভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনি বায়তুল মোকাররমের ফুটপাত থেকে উলেন সোয়েটার কিনছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন।

'স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন ? আমি সিরাজ।'

'চিনতে পেরেছি।'

'ঐ বার স্যার কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে এলেন। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে গেল। কী দুর্দশা ছাত্রদের ! গরিবের ছেলেপুলে।'

আমি কঠিন স্বরে বললাম, আপনারা সবাই ভাল তো ?

'জি ভাল।'

'প্রিন্সিপাল সাহেব, উনি ভাল আছেন ?'

'উনার খবরটা জানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে জামালপুর চলে গেলেন।'

'ছেলেটা মারা গেছে বুঝি ?'

'জি, বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল ! নানান জায়গায় খোঁজাখুঁজি। তিনদিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই। আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।'

'তাই বুঝি ?'

'জি স্যার। খুবই আফসোসের কথা।'

'এখন কি নতুন প্রিন্সিপাল এসেছেন ?'

'জি, খুবই ভাল লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসায়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে গল্পগুজব করি।

'খুবই ভাল কথা।'

'তবে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার কী জানেন ? প্রিন্সিপাল সাহেবের স্ত্রী মাঝে মাঝে বিনা কারণে ভয় পেয়ে চিৎকার চ্যাচামেচি করেন। অবিকল আগের প্রিন্সিপাল সাহেবের ছেলের মতো অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।'

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সিরাজউদ্দিন বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভাল লাগছে স্যার। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।

সিরাজউদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিশুর সারল্য। চোখ দুটি মমতায় আর্দ্র।

আয়না

হুমায়ূন আহমেদ

সকাল সাড়ে সাতটা। শওকত সাহেব বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা মোড়া, মোড়ায় পানিভরতি একটা মগ। পানির মগে হেলান দেয়া ছোট্ট একটা আয়না। আয়নাটার স্ট্যাণ্ড ভেঙে গেছে বলে কিছু একটাতে ঠেকা না দিয়ে তাকে দাঁড় করানো যায় না। শওকত সাহেব মুখভরতি ফেনা নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছেন। দাড়ি শেভ করবেন। পঁয়তাল্লিশ বছরের পর মুখের দাড়ি শক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই রেজারের একটানে দাড়ি কাটা যায় না। মুখে সাবান মেখে অপেক্ষা করতে হয়। একসময় দাড়ি নরম হবে, তখন কাটতে সুবিধা।

দাড়ি নরম হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শওকত সাহেব রেজার দিয়ে একটা টান দিতেই তাঁর গাল কেটে গেল। রগ-টগ মনে হয় কেটেছে, গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে। শওকত সাহেব এক হাতে গাল চেপে বসে আছেন। কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকলে রক্ত পড়া বন্ধ হবে। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলন কিছু আছে কি না কে জানে। কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। সকাল বেলার সময়টা হল ব্যস্ততার সময়। সবাই কাজ নিয়ে থাকে। কী দরকার বিরক্ত করে?

এই এক মাসে চারবার গাল কাটল। আয়নাটাই সমস্যা করছে। পুরানো আয়না, পারা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। একটা ছোট আয়না কেনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রী মনোয়ারাকে কয়েকবার বলেছেন। মনোয়ারা এখনও কিনে উঠতে পারেনি। তার বোধহয় মনে থাকে না, মনে থাকার কথাও না। আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করেন। বাসার সবাই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়না ব্যবহার করে। কাজেই হাত–আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা জানার কথা না। আর জানলেও কি সবসময় সব কথা মনে থাকে?

শওকত সাহেব নিজেই কতবার ভেবেছেন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা আয়না কিনে নেবেন। অফিস থেকে তো রোজই ফিরছেন, কই, আয়না তো কেনা হচ্ছে না! আয়না কেনার কথা মনেই পড়ছে না। মনে পড়ে শুধু দাড়ি শেভ করার সময়।

শোবার ঘর থেকে শওকত সাহেবের বড় মেয়ে ইরা বের হল। সে এ-বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। সেজন্যেই সবসময় একধরনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। শওকত সাহেব বললেন, মা, ঘরে স্যাভলন আছে?

ইরা বলল, জানি না বাবা।

সে যেরকম ব্যস্তভাবে বারান্দায় এসেছিল সেরকম ব্যস্ত ভঙ্গিতেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। বাবার দিকে ভালমত তাকালও না। তার এত সময় নেই।

রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে কি না এটা দেখার জন্যে শওকত সাহেব গাল থেকে

হাত সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আশ্চর্য কাণ্ড! আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা মেয়ে বসে আছে। আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার গায়ে লাল ফুল আঁকা সুতির একটা ফ্রক। খালি পা। মাথার চুল বেণি-করা। দুদিকে দুটা বেণি ঝুলছে। দু'টা বেণিতে দু'রঙের ফিতা। একটা লাল একটা শাদা। মেয়েটার মুখ গোল, চোখ দু'টা বিষণ্ন। মেয়েটা কে?

শওকত সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। তাঁর ধারণা হল, হয়ত টুকটাক কাজের জন্যে বাচ্চা একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে। সে বারান্দায় তাঁর পেছনে বসে আছে তিনি এতক্ষণ লক্ষ্য করেননি।

বারান্দায় তাঁর পেছনে কেউ নেই। পুরো বারান্দা ফাঁকা, তা হলে আয়নায় মেয়েটা এল কোত্থেকে? শওকত সাহেব আবার আয়নার দিকে তাকালেন, ঐ তো মেয়েটা বসে আছে, তার রোগা-রোগা ফরসা পা দেখা যাচ্ছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ব্যাপারটা কী?

মেয়েটা একটু যেন ঝুঁকে এল। শওকত সাহেবকে অবাক করে দিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, আপনার গাল কেটে গেছে। রক্ত পড়ছে।

শওকত সাহেব আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একমাত্র পাগলরাই উদ্ভট এবং বিচিত্র ব্যাপার-ট্যাপার দেখতে পায়। এই বয়সে পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। চাকরি চলে যাবে। সংসার চলবে কীভাবে? শওকত সাহেব আয়নার দিকে তাকালেন না। আয়না-হাতে ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের শোবার ঘরের টেবিলে আয়নাটা উলটো করে রেখে দিলেন। একবার ভাবলেন, ঘটনাটা তাঁর স্ত্রীকে বলবেন, তার পরই মনে হল—কী দরকার! সবকিছুই সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তা তো না। তা ছাড়া তিনি খুবই স্বল্পভাষী, কারো সঙ্গেই তাঁর কথা বলতে ভাল লাগে না। অফিসে যতক্ষণ থাকেন নিজের মনে থাকতে চেষ্টা করেন। সেটা সম্ভব হয় না। অকারণে নানান কথা বলতে হয়। যত না কাজের কথা—তারচে বেশি অকাজের কথা। অফিসের লোকজন অকাজের কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে।

•

শওকত সাহেব ইস্টার্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। ক্যাশের হিসাব ঠিক রাখা, দিনের শেষে জমা-খরচ হিসাব মেলানোর কাজটা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল কাজটা করতে গেলে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকা দরকার। অকারণে রাজ্যের কথা বললে মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। কেউ সেটা বোঝে না। সবাই প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর সঙ্গে কিছু খাজুরে আলাপ করবেই।

'কী শওকত সাহেব, মুখটা এমন শুকনা কেন? ভাবির সঙ্গে ফাইট চলছে নাকি?'

'আজকের শার্টটা তো ভাল পরেছেন। বয়স মনে হচ্ছে দশ বছর কমে গেছে। রঙে আছেন দেখি।'

'শওকত ভাই, দেখি চা খাওয়ান। আপনার স্বভাব কাউটা ধরনের হয়ে গেছে। চা-টা কিছুই খাওয়ান না। আজ ছাড়াছাড়ি নাই।'

এইসব অকারণ অর্থহীন কথা শুনতে শুনতে শওকত সাহেব ব্যাংকের হিসাব

মেলান। মাঝে মাঝে হিসাবে গণ্ডগোল হয়ে যায়। তাঁর প্রচণ্ড রাগ লাগে। পুরো হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে হয়। মনের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না। রাগ চাপা রেখে মুখ হাসিহাসি করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের রাগ চেপে রেখে অপেক্ষা করেন কখন সামনে বসে থাকা মানুষটা বিদেয় হবে, তিনি তাঁর হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে শুরু করবেন। খুবই সমস্যার ব্যাপার। তবে মাসখানিক হল শওকত সাহেব আরও বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংকে কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন থেকে হিসাবপত্র সব হবে কম্পিউটারে। চ্যাংড়া একটা ছেলে, নাম সাজেদুল করিম, সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাচ্ছে। সবাই শিখে গেছে, শওকত সাহেব কিছু শিখতে পারেননি।

যন্ত্রপাতির ব্যাপার তাঁর কাছে সবসময়ই অতি জটিল মনে হয়। সামান্য ক্যালকুলেটারও তিনি কখনো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেন না। একটা বেড়াছেড়া হয়ে যায়ই। তা ছাড়া যন্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি যত দায়িত্বের সঙ্গে একটা যোগ করবেন যন্ত্র কি তা করবে ? কেনই–বা করবে ? ভুল-ভ্রান্তি করলে বড় সাহেবদের গালি খাবেন, তাঁর চাকরি চলে যাবে। যন্ত্রের তো সেই সমস্যা নেই। যন্ত্রকে কেউ গালিও দেবে না বা তার চাকরিও চলে যাবে না। তার পরেও কেন মানুষ এত যন্ত্র-যন্ত্র করে ? কম্পিউটার তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। অনেকটা টেলিভিশনের মতো একটা জিনিশ। হিসাবনিকাশ সব পর্দায় উঠে আসছে। এমনিতেই টেলিভিশন তাঁর ভাল লাগে না। বাসায় তিনি কখনো টিভি দেখেন না। যে যেটা অপছন্দ করে তার কপালে সেটাই জোটে, এটা বোধহয় সত্যি। তিনি টিভি পছন্দ করেন না। এখন টিভির মতো একটা জিনিশ সবসময় তাঁর টেবিলে থাকবে। অফিসে যতক্ষণ থাকবেন তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে টিভির পর্দার দিকে, যে–পর্দায় গানবাজনা হবে না, শুধু হিসাবনিকাশ হবে। কোন মানে হয় ?

অফিস শুরু হয় ন'টার সময়। শওকত সাহেব ন'টা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকেন। তাঁর টেবিলে পিরিচে ঢাকা এক গ্লাস পানি থাকে। তিনি পানিটা খান। তারপর তিনবার কুল হু আল্লা পড়ে কাজকর্ম শুরু করেন। এটা তাঁর নিত্যদিনকার রুটিন। আজ অফিসে এসে দেখেন কম্পিউটারের চেংড়া ছেলেটা, সাজেদুল করিম, তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে সিগারেট টানছে। পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাসটা খালি। সাজেদুল করিম খেয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই। সাজেদুল করিম শওকত সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, স্যার, কেমন আছেন ?

'ভাল আছি।'

'আজ আপনার জন্যে সকাল সকাল চলে এসেছি।'

'ও, আচ্ছা।'

'জিএম সাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন। —আপনাকে কম্পিউটার শেখাতে পারছি না। আজ ঠিক করেছি সারাদিন আপনার সঙ্গেই থাকব।'

শওকত সাহেব শুকনো মুখে বললেন, আচ্ছা।

'আমরা চা খাই, চা খেয়ে শুরু করি। কী বলেন স্যার ?

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। সাজেদুল করিম হাসিহাসি মুখে বলল, গতকাল যা যা বলেছিলাম সেসব কি স্যার আপনার মনে আছে ?

শওকত সাহেবের কিছুই মনে নেই, তবু তিনি হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লেন।

'একটা ছোটখাটো ভাইবা হয়ে যাক। স্যার বলুন দেখি, মেগাবাইট ব্যাপারটা কি ?'

'মনে নাই।'

'র‍্যাম কী সেটা মনে আছে ?'

'না।'

'মনে না থাকলে নাই। এটা এমনকিছু জরুরি ব্যাপার না। ম্যাগাবাইট, র‍্যাম সবই হচ্ছে কম্পিউটারের মেমরির একটা হিসাব। একেক জন মানুষের যেমন একেক রকম স্মৃতিশক্তি থাকে, কম্পিউটারেরও তাই। কিছু-কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি থাকে অসাধারণ, আবার কিছু-কিছু কম্পিউটারের স্মৃতিশক্তি সাধারণ মানের। মেগাবাইট হচ্ছে স্মৃতিশক্তির একটা হিসাব। মেটা হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স আর বাইট হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিক্স ভাগের এক ভাগ। র‍্যাম হচ্ছে র‍্যানডম একসেস মেমরি। স্যার, বুঝতে পারছেন ?'

শওকত সাহেব কিছুই বোঝেননি। তার পরেও বললেন, বুঝতে পারছি।

'একটা জিনিশ খেয়াল রাখবেন— কম্পিউটার হল আয়নার মতো।'

'আয়নার মতো ?'

'হ্যাঁ স্যার, আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন হয়—আয়নার সামনে যা থাকে তাই আয়নাতে দেখা যায়, কম্পিউটারেও তাই। কম্পিউটারকে আপনি যা দেবেন সে তা-ই আপনাকে দেখাবে। নিজে থেকে বানিয়ে সে আপনাকে কিছু দেবে না। তার সেই ক্ষমতা নেই। বুঝতে পারছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার, এখন আসুন মেমরি এবং হার্ড ডিস্ক এই দুয়ের ভেতরের পার্থক্যটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

শওকত সাহেব আসলে মন দিয়ে কিছুই শুনছেন না। আয়নার কথায় তাঁর নিজের আয়নাটার কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কী ? আয়নার ভেতরে ছোট মেয়েটা এল কীভাবে ? মেয়েটা কে ? তার নাম কী ? চোখ পিটপিট করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। শওকত সাহেব চায়ের কাপে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চুমুক দিচ্ছেন। সাজেদুল করিম বলল, স্যার!

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত ?'

'না তো!'

'তা হলে আসুন কম্পিউটারের ফাইল কীভাবে খুলতে হয় আপনাকে বলি। শুধু মুখে বললে হবে না, হাতে-কলমে দেখাতে হবে। হার্ড ডিস্ক হল আমাদের

ফাইলিং ক্যাবিনেট। সব ফাইল আছে হার্ড ডিস্কে। সেখান থেকে একটা বিশেষ ফাইল কীভাবে বের করব ?....

বিকেল চারটা পর্যন্ত শওকত সাহেব কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করলেন। লাভের মধ্যে লাভ হল— তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথাধরা। সাজেদুল করিমকে মাথাধরার ব্যাপারটা জানতে দিলেন না। বেচারা এত আগ্রহ করে বোঝাচ্ছে। তার ভাবভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মতো সহজ কিছু পৃথিবীতে তৈরি হয়নি।

'স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার নতুন করে শুরু করব।'

'আচ্ছা।'

অফিস থেকে বেরুবার আগে জিএম সাহেব শওকত সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শওকত সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। জিএম সাহেবকে তিনি কম্পিউটারের মতোই ভয় পান। যদিও ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী। হাসিমুখ ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। জিএম সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, কেমন আছেন শওকত সাহেব ?

'জি স্যার, ভাল।'

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

শওকত সাহেব বসলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে।

'আপনার কি শরীর খারাপ ?'

'জি না স্যার।'

'দেখে অবশ্যি মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। যাই হোক, কম্পিউটার শেখার কতদূর হল ?'

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জিএম সাহেব বললেন, আমি সাজেদুল করিমকে গতকাল কঠিন বকা দিয়েছি। তাকে বলেছি— তুমি কেমন ছেলে, সামান্য একটা জিনিশ শওকত সাহেবকে শেখাতে পারছ না !

'তার দোষ নেই স্যার। সে চেষ্টার ত্রুটি করছে না। আসলে আমি শিখতে পারছি না।'

'পারছেন না কেন ?'

'বুঝতে পারছি না স্যার।'

'কম্পিউটার তো আজ ছেলেখেলা। সাত-আট বছরের বাচ্চারা কম্পিউটাব দিয়ে খেলছে, আপনি পারবেন না কেন ? আপনাকে তো পারতেই হবে। পুরানো দিনের মত কাগজে-কলমে বসে বসে হিসাব করবেন আর মুখে বিড়বিড় করবেন—হাতে আছে পাঁচ, তা তো হবে না। আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যা হবে সব কম্পিউটারে হবে।'

'জি স্যার।'

'নতুন টেকনোলজি যারা নিতে পারবে না তাদের তো আমাদের প্রয়োজন নেই। ডারউইনের সেই থিয়োরি—সারভাইবল্ ফর দি ফিটেস্ট। বুঝতে পারছেন?'

'জি স্যার।'

'আচ্ছা আজ যান। চেষ্টা করুন ব্যাপারটা শিখে নিতে। এটা এমন কিছু না।

আপনার নিজের ভেতরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি যদি ধরেই নেন কোনোদিন শিখতে পারবেন না, তা হলে তো কোনোদিনই শিখতে পারবেন না। ঠিক না ?'

'জি স্যার, ঠিক।'

'আচ্ছা, আজ তা হলে যান।'

বেরুবার সময় তিনি দরজায় ধাক্কা খেলেন। ডান চোখের উপর কপাল সুপুরির মতো ফুলে উঠল। মাথাধরাটা আরো বাড়ল।

শওকত সাহেব মাথাধরা নিয়েই বাসায় ফিরলেন। বাসা খালি, শুধু কাজের বুয়া আছে। বাকি সবাই নাকি বিয়েবাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। আবার না-ফেরার সম্ভাবনাও আছে। কার বিয়ে শওকত সাহেব কিছুই জানেন না। তাকে কেউ কিছু বলেনি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। এতে যদি মাথাধরাটা কমে। ইদানীং তাঁর ঘনঘন মাথা ধরছে। চোখ আরও খারাপ করেছে কি না কে জানে! চোখের ডাক্তারের কাছে একবার গেলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানেই টাকার খেলা। ডাক্তারের ভিজিট, নতুন চশমা, নতুন ফ্রেম।

কাজের বুয়া তাঁকে নাশতা দিয়ে গেল। একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেঁপে, আধবাটি মুড়ি এবং সরপড়া চা। পেঁপেটা খেতে তিতা-তিতা লাগল। মুড়ি মিইয়ে গেছে। দাঁতের চাপে রবারের মতো চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল। তিনি তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি সবটা খেয়ে ফেললেন। চা খেলেন। গরম চা খেয়ে মাথাধরাটা কমবে ভেবেছিলেন। কমল না। কারণ চা গরম ছিল না। এই কাজের বুয়া গরম চা বানানোর কায়দা জানে না। তার চা সবসময় হয় কুসুম-গরম।

শওকত সাহেব মাথাধরার ট্যাবলেটের খোঁজে শোবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ড্রয়ারে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকার কথা। কিছুই পাওয়া গেল না। ড্রয়ারের ভেতর হাত-আয়নাটা ঢোকানো। মনোয়ারা নিশ্চয়ই রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আয়নার ভেতর মেয়েটা কি এখনও আছে ? শওকত সাহেব আয়না হাতে নিলেন। অস্বস্তি নিয়ে তাকালেন। আশ্চর্য! মেয়েটা তো আছে! আগেরবার বসে ছিল, এখন দাঁড়িয়ে আছে। আগের ফ্রকটাই গায়ে। মেয়েটা খুব সুন্দর তো! গাল মুখ, মায়া-মায়া চেহারা। বয়স কত হবে ? এগারো-বারোর বেশি না। কমও হতে পারে। মেয়েটার গলায় নীল পুঁতির মালা। মালাটা আগে লক্ষ করেননি। শওকত সাহেব নিচুগলায় বললেন, তোমার নাম ?

মেয়েটা মিষ্টি গলায় বলল, চিত্রলেখা।

'বাহ্, সুন্দর নাম!'

মেয়েটা লাজুক ভঙ্গিতে হাসল। শওকত সাহেব আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মেয়েটাকে আর কী বলা যায় ? আয়নার ভেতর সে এল কি করে এটা কি জিজ্ঞেস করবেন ? প্রশ্নটা মেয়েটার জন্যে জটিল হয়ে যাবে না তো ? জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তিনি কিছু জিজ্ঞেস করার আগে মেয়েটা বলল, আপনার

কপালে কী হয়েছে ?

'ব্যথা পেয়েছি। জিএম সাহেবের ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলাম।'

'খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন ?'

'খুব বেশি না। তুমি কোন ক্লাসে পড় ?'

'আমি পড়ি না।'

'স্কুলে যাও না ?'

'উঁহুঁ।'

'আয়নার ভেতর তুমি এলে কী করে ?'

'তাও জানি না।'

'তোমার বাবা-মা, তাঁরা কোথায় ?'

'জানি না।'

'তোমার মা-বাবা আছেন তো? আছেন না ?'

'জানি না।'

'তুমি কি একা থাক ?'

'হুঁ।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের উপর দু'টা হাত আড়াআড়ি করে রাখা। মনে হয় তার শীত লাগছে। অথচ এটা চৈত্র মাস। শীত লাগার কোনো কারণ নেই। তিনি নিজে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তার বাতাসটা পর্যন্ত গরম।

'কাঁপছ কেন ? শীত লাগছে নাকি ?'

'হুঁ, এখানে খুব শীত।'

'তোমার কি গরম কাপড় নেই ?'

'না।'

'তোমার এই একটাই জামা ?'

'হুঁ।'

'আমাকে তুমি চেন ?"

'চিনি।'

'আমি কে বল তো ?'

'তা বলতে পারি না।'

'আমার নাম জান ?'

'আপনি তো আপনার নাম বলেননি। জানব কীভাবে ?'

'আমার নাম শওকত। শওকত আলি।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার তিন মেয়ে।'

'ছেলে নাই ?'

'না, ছেলে নাই।'

'আপনার মেয়েরা কোথায় গেছে ?'

'বিয়েবাড়িতে গেছে।'

'কার বিয়ে ?'

'কার বিয়ে আমি ঠিক জানি না। আমাকে বলেনি।'

'আপনার মেয়েদের নাম কী ?'

'বড় মেয়ের নাম ইরা, মেজোটার নাম সোমা, সবচে ছোটটার নাম কল্পনা।'

'ওদের নামে কোনো মিল নেই কেন ? সবাই তো মিল দিয়ে দিয়ে মেয়েদের নাম রাখে। বড়মেয়ের নাম ইরা হলে মেজোটার নাম হয়—মীরা, ছোটটার নাম হয় নীরা....'

'ওদের মা নাম রেখেছে। মিল দিতে ভুলে গেছে।'

'আপনি নাম রাখেননি কেন ?'

'আমিও রেখেছিলাম। আমার নাম কারও পছন্দ হয়নি।'

'আপনি কী নাম রেখেছিলেন ?'

'বড় মেয়ের নাম রেখেছিলাম বেগম রোকেয়া। মহীয়সী নারীর নামে নাম। তার মা পছন্দ করেনি। তার মা'র দোষ নেই। পুরানো দিনের নাম তো, এইজন্যে পছন্দ হয়নি।'

'বেগম রোকেয়া কে ?'

'তোমাকে বললাম না মহীয়সী নারী। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মেছিলেন। মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারের জন্যে প্রাণপাত করেছিলেন। তুমি তাঁর নাম শোননি ?'

'জি না।'

কলিংবেল বেজে উঠল। শওকত সাহেব আঁতকে উঠলেন। ওরা বোধহয় চলে এসেছে। তিনি আয়না ড্রয়ারে রেখে দরজা খোলার জন্যে গেলেন। ওদের সামনে আয়না বের করার কোনো দরকার নেই। তারা কী না কী মনে করবে—দরকার কী ? অবশ্যি আয়নায় তিনি নিজেও কিছু দেখছেন না, সম্ভবত এটা তাঁর কল্পনা। কিংবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ছোটবেলায় তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখন তাদের অবনী স্যার স্কুলের সামনের বড় আমগাছটার সঙ্গে কথা বলতেন। কেউ দেখে ফেললে খুব লজ্জা পেতেন। এক বর্ষাকালে তিনি স্কুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন; হঠাৎ দেখেন অবনী স্যার আমগাছের সঙ্গে কথা বলছেন। অবনী স্যার তাঁকে দেখে খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা এমন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। খুব সাপের উপদ্রব। তার পরের বছরই স্যার পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁকে নিয়ে ইণ্ডিয়া চলে গেল।

কে জানে তিনি নিজেও হয়ত পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুরোপুরি পাগল হবার পর তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরা হয়তো তাঁকে পাবনার মেন্টাল হাসপাতালে ভরতি করিয়ে আসবে। পাবনায় ভরতি হতে কত টাকা লাগে কে জানে! টাকা বেশি লাগলে ভরতি নাও করাতে পারে। হয়তো নিজেদের বাড়িতেই দরজায় তালাবন্ধ করে রাখবে কিংবা অন্য কোনো দূরের শহরে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। পাগল পুষতে না পারলে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এতে দোষ হয় না। পাগল তো আর মানুষ না। তারা বোধশক্তিহীন জন্তুর মতোই।

মনোয়ারা বিয়েবাড়ি থেকে মেয়েদের নিয়ে ফেরেননি। মেজো মেয়ের মাস্টার এসেছে। শওকত সাহেব বললেন, ওরা কেউ বাসায় নেই। বিয়েবাড়িতে গেছে। আপনি বসেন, চা খান।

মাস্টার সাহেব বললেন, আচ্ছা, চা এক কাপ খেয়েই যাই। শওকত সাহেব বুয়াকে চায়ের কথা বলে এসে শুকনো মুখে মাস্টারের সামনে বসে রইলেন। তাঁর মেজাজ একটু খারাপ হল। মাস্টারের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকতে হবে। টুকটাক কথা বলতে হবে। কী কথা বলবেন ?

মাস্টার সাহেব বললেন, আপনার গালে কী হয়েছে ?

'দাড়ি শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে গেছে। আয়নাটা খারাপ, ভাল দেখা যায় না।'

'নতুন একটা কিনে নেন না কেন ?'

'ইরার মাকে বলেছি— ও সময় করতে পারে না। আপনার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করছে ?'

'ভাল। ম্যাথ-এ একটু উইক।'

'আপনি কি শুধু ম্যাথ পড়ান ?'

'আমি সায়েন্স সাবজেক্ট সবই দেখাই—ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি।'

বুয়া চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, পিরিচে পেঁপে এবং মুড়ি। মাস্টার সাহেব আগ্রহ করে তিতা পেঁপে এবং মিয়ানো মুড়ি খাচ্ছেন। প্রাইভেট মাস্টাররা যে-কোনো খাবার আগ্রহ করে খায়। শওকত সাহেব কথা বলার আর কিছু পাচ্ছেন না। একবার ভাবলেন আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন। নিজেকে সামলালেন, কী দরকার ?

'মাস্টার সাহেব!'

'জি।'

'আপনি তো সায়েন্সের টিচার, আয়নাতে যে ছবি দেখা যায়, কীভাবে দেখা যায় ?'

'আলো অবজেক্ট থেকে আয়নাতে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।'

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, কোনো বস্তু যদি আয়নার সামনে না থাকে তা হলে তো তার ছবি দেখার কোনো কারণ নেই, তাই না ?

মাস্টার সাহেব খুবই অবাক হয়ে বললেন, তা তো বটেই। এটা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

'এম্নি জিজ্ঞেস করছি। কোনো কারণ নাই। কথার কথা। কিছু মনে করবেন না।'

শওকত সাহেব খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

পরদিন অফিসে যাবার সময় শওকত সাহেব আয়নাটা খবরের কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। কেন নিলেন নিজেও ঠিক জানেন না। অফিসের ড্রয়ারে আয়না রেখে সাজেদুল করিমের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করতে লাগলেন। কীভাবে উইন্ডো খুলে সেখান থেকে সিস্টেম ফোল্ডার বের করতে হয়, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং—চোদ্দ রকম যন্ত্রণা! তিনি মুগ্ধ হলেন ছেলেটার ধৈর্য দেখে। তিনি যে সব

গুবলেট করে দিচ্ছেন তার জন্যে সাজেদুল করিম একটুও রাগ করছে না। একই জিনিশ বারবার করে বলছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন তিনি বয়স্ক একজন মানুষ না, বাচ্চা একটা ছেলে। সাজেদুল করিম বলল, স্যার, আসুন আমরা একটু রেস্ট নিই। চা খাই। তারপর আবার শুরু করব।

শওকত সাহেব বললেন, আমাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না। বাদ দাও।

'বাদ দিলে চলবে কী করে স্যার ? কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন তো আর আপনি লম্বা লম্বা যোগ-বিয়োগ করতে পারবেন না। ব্যালেন্স শীট তৈরি হবে কম্পিউটারে।'

শওকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আমি পারব না। যারা পারবে তারা করবে। চাকরি ছেড়ে দেব।

'কী যে স্যার বলেন! চাকরি ছেড়ে দেবেন মানে ? চাকরি ছাড়লে খাবেন কী ? আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে কম্পিউটার শিখিয়ে ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক জেদ।'

চা খেতে খেতে শওকত সাহেব ছেলেটার সঙ্গে কিছু গল্পও করলেন। গল্প করতে খারাপ লাগল না। তবে এই ছেলে কম্পিউটার ছাড়া কোনো গল্প জানে না। কোনো এক ভদ্রলোক তাঁর কিছু জরুরি ডাটা ভুল করে ইরেজ করে ফেলেছিলেন। প্রায় মাথা খারাপ হবার মতো জোগাড়। সেই ডাটা কীভাবে উদ্ধার হল তার গল্প সে এমনভাবে করল যেন এটা এক রোমহর্ষক গল্প।

'বুঝলেন স্যার, দু'টা প্রোগ্রাম আছে যা দিয়ে ট্রেস ক্যান-এ ফেলে দেয়া ডাটাও উদ্ধার করা যায়। একটা প্রোগ্রামের নাম নর্টন ইউটিলিটিজ, আরেকটির নাম কমপ্লিট আনডিলিট। খুবই চমৎকার প্রোগ্রাম!'

শওকত সাহেব কিছুই বুঝলেন না, তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, স্যার আসুন বিসমিল্লাহ্ বলে লেগে পড়ি।

শওকত সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, আজ থাক। আজ আর ভাল লাগছে না।

'জিএম সাহেব শুনলে আবার রাগ করবেন।'

'রাগ করলে করবে। কী আর করা! আমাকে দিয়ে কম্পিউটার হবে না। শুধুশুধু তুমি কষ্ট করছ।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজ আপনি রেস্ট নিন, কাল আবার আমরা শুরু করব। আমি তাহলে স্যার আজ যাই।'

'একটা জিনিশ দেখো তো!'

শওকত সাহেব ড্রয়ার থেকে খবরের কাগজে মোড়া আয়না বের করলেন। খুব সাবধানে কাগজ সরিয়ে আয়না বের করলেন। সাজেদুল করিমের হাতে আয়নাটা দিয়ে বললেন, জিনিশটা একটু ভাল করে দেখো তো!

'জিনিশটা কী ?'

'একটা আয়না।'

সাজেদুল করিম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়না দেখল। শওকত সাহেব কৌতূহলী গলায় বললেন, দেখলে ?

সাজেদুল করিম বিস্মিত হয়ে বলল, দেখলাম।

'কী দেখলে বলো তো ?

'পুরানো একটা আয়না দেখলাম। পারা নষ্ট হয়ে গেছে। আর তো কিছু দেখলাম না। আর কিছু কি দেখার আছে ?'

'না, আমার শখের একটা আয়না।'

শওকত সাহেব আয়নাটা কাগজে মুড়তে শুরু করলেন। সাজেদুল করিম এখনও তাঁর দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে। শওকত সাহেবের মনে হল তিনি ছোটবেলায় অবনী স্যারকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এইভাবেই বোধহয় তাকিয়েছিলেন।

সাজেদুল করিম চলে যাবার পর তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়নাটা বের করলেন—ঐ তো, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটাকে কেমন দুখি-দুখি লাগছে। শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, কেমন আছ চিত্রলেখা ?

'ভাল।'

'তোমার মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন ? মন খারাপ ?'

'হুঁ।'

'মন খারাপ কেন ?'

'একা একা থাকি তো এইজন্যে মন খারাপ। মাঝে মাঝে আবার ভয়-ভয় লাগে।'

'কিসের ভয় ?'

'জানি না কিসের ভয়। এটা কি আপনার অফিস?'

'হুঁ।'

'আপনার টেবিলের উপর এটা কী ? বাক্সের মতো ?'

'এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার। আইবিএম কম্পিউটার।'

'কম্পিউটার কী ?

'একটা যন্ত্র। হিসাবনিকাশ করে। আচ্ছা শোনো চিত্রলেখা, তোমার বাবা-মা আছেন ?'

'জানি না তো!'

'তুমি আজ কিছু খেয়েছ ?'

'না।'

'তোমার খিদে লেগেছে ?'

'হুঁ।'

'তুমি যেখানে থাক সেখানে কোনো খাবার নেই ?'

'না।'

'জায়গাটা কেমন ?'

'জায়গাটা কেমন আমি জানি না। খুব শীত।'

শওকত সাহেব দেখলেন মেয়েটা শীতে কাঁপছে। পাতলা সুতির জামায় শীত মানছে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। এই শীতার্ত ও ক্ষুধার্ত মেয়েটার জন্যে তিনি কিই-বা করতে পারেন! তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আয়নাটা কাগজে মুড়ে

ড্রয়ারে রেখে দিলেন। তাঁর নিজেরও খিদে লেগেছে। বাসা থেকে টিফিন-কেরিয়ারে করে খাবার এনেছেন। কোন উপায় কি আছে মেয়েটাকে খাবার দেয়ার ? আরে, কী আশ্চর্য! তিনি এসব কী ভাবছেন ? আয়নায় যা দেখছেন সেটা মনের ভুল ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। আসলে আয়নাটা তাঁর দেখাই উচিত না। তিনি টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে অফিস ক্যানটিনে খেতে গেলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না। বারবার মেয়েটার শুকনো মুখ মনে পড়তে লাগল। তিনি হাত ধুয়ে উঠে পড়লেন।

বাসায় ফিরতে ফিরতে তাঁর সন্ধ্যা হয়ে গেল। সাধারণত অফিস থেকে তিনি সরাসরি বাসায় ফেরেন। আজ একটু ঘুরলেন। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বেঞ্চিতে বসে রইলেন। তাঁর ভালই লাগল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, চারদিকে গাছপালা। কেমন শান্তি-শান্তি ভাব। দুপুরে কিছু খাননি বলে খিদেটা এখন জানান দিচ্ছে। বাদামওয়ালা বুট-বাদাম বিক্রি করছে। এক ছটাক বাদাম কিনে ফেলবেন নাকি ? কত দাম এক ছটাক বাদামের ? তিনি হাত উঁচিয়ে বাদামওয়ালাকে ডাকলেন। তার পরই মনে হল বাচ্চা একটা মেয়ে না খেয়ে আছে। তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাদাম না কিনেই তিনি বাসার দিকে রওনা হলেন।

বাসায় ফেরামাত্র তাঁকে নাশতা দেয়া হল—তিতা পেঁপের টুকরা, মিয়ানো মুড়ি। মনে হয় অনেকগুলি তিতা পেঁপে কেনা আছে এবং টিনভরতি মিয়ানো মুড়ি আছে। এগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খেতেই হবে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। অপরিচিত একজন পুরুষ নাকি গলায় সা-রে-গা-মা করছে। ইরার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। ইরা গান শিখছে নাকি ?

সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা....

মনোয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে শওকত সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, ইরার জন্যে গানের মাস্টার রেখে দিলাম। সপ্তাহে দুদিন আসবে। পনেরো শো টাকা সে নেয়, বলে-কয়ে এক হাজার করেছি। তবলচিকে দিতে হবে তিন শো। মেয়ের এত শখ! তোমাকে বলে তো কিছু হবে না। কার কী শখ, কী ইচ্ছা, তুমি কিছুই জান না। যা করার আমাকেই করতে হবে।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এক হাজার যোগ তিনশো—তের শো। বাড়তি তেরো শো টাকা কোত্থেকে আসবে ? সামনের মাস থেকে বেতন কমে যাবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন, সামনের মাস থেকে পাঁচশো টাকা করে কাটা শুরু হবে। উপায় হবে কী ? তিনি কম্পিউটারও শিখতে পারছেন না। সত্যি সত্যি যদি এই বয়সে চাকরি চলে যায়, তখন ?

মনোয়ারা বললেন, সোমাদের কলেজ থেকে স্টাডি ট্যুরে যাচ্ছে। তার এক হাজার টাকা দরকার। তোমাকে আগেভাগে বলে রাখলাম। কী, কথা বলছ না কেন ?

শওকত সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন। কিছু বললেন না।

'তোমার সঙ্গে বসে যে দুটো কথা বলব সে উপায় তো নেই। মুখ সেলাই করে বসে থাকবে। আশ্চর্য এক মানুষের সঙ্গে জীবন কাটালাম!'

মনোয়ারা উঠে চলে গেলেন। ঘরের ভেতর থেকে এখন গানের কথা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওস্তাদ টিচার প্রথম দিনেই গান শেখাচ্ছেন–

তুমি বাস কি না তা আমি জানি না
ভালবাস কি না তা আমি জানি না
আমার কাজ আমি বন্ধু করিয়া যে যাব
চিন্তা হইতে আমি চিতানলে যাব...

শওকত সাহেব একা বসে আছেন। রাতে ভাত খাবার ডাক না আসা পর্যন্ত একাই বসে থাকতে হবে। আয়নাটা বের করে মেয়েটার সঙ্গে দু'টা কথা বললে কেমন হয়? কেউ এসে দেখে না ফেললে হল। দেখে ফেললে সমস্যা।

'কেমন আছ চিত্রলেখা?'

'জি, ভাল আছি। কে গান গাচ্ছে?'

'আমার বড় মেয়ে।'

'ইরা?'

'হ্যাঁ, ইরা। তোমার দেখি নাম মনে আছে!'

'মনে থাকবে না কেন? আমার সবার নামই মনে আছে—ইরা, সোমা, কল্পনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব মন-খারাপ। আপনার কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি রে মা।'

শওকত সাহেবের গলা ধরে এল। দিনের পর দিন তাঁর মন খারাপ থাকে। কেউ জানতে চায় না তার মন-খারাপ কেন—আয়নার ভেতরের এই মেয়ে জানতে চাচ্ছে। তাঁর চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে বললেন, তুমি কি গান জান?

'জি না।'

'আচ্ছ শোনো, তুমি যে বলেছিলে খিদে লেগেছে। কিছু কি খেয়েছ? খিদে কমেছে?'

মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল। মজার কোনো কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, আপনি কী যে বলেন! খাব কী করে? আমাদের এখানে কি কোনো খাবার আছে?

'খাবার নেই?'

'না। কিচ্ছু নেই। এটা একটা অদ্ভুত জায়গা। শুধু আমি একা থাকি। কথা বলারও কেউ নেই। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

শওকত সাহেব লক্ষ করলেন, মেয়েটা আগের মতো দুহাত বুকের উপর রেখে থরথর করে কাঁপছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, শীত লাগছে মা?

'লাগছে। এখানে খুব শীত। যখন বাতাস দেয় তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। আমার তো শীতের কাপড় নেই। এই একটাই ফ্রক।'

দুঃখে শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। তখন মনোয়ারা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শীতল গলায় বললেন, আয়না হাতে বারান্দায় বসে আছ কেন? কল্পনার পাশে বসে তার পড়াটা দেখিয়ে দিলেও তো হয়। সব বাবারাই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়, একমাত্র তোমাকে দেখলাম অফিস থেকে

এসে বটগাছের মতো বসে থাক। বাবার কিছু দায়িত্ব তো পালন করবে।

শওকত সাহেব আয়নাটা রেখে কল্পনার পড়া দেখানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

২

সাজেদুল করিম অসাধ্য সাধন করেছে। শওকত সাহেবকে কম্পিউটার শিখিয়ে ফেলেছে।

'কী স্যার, বলিনি আপনাকে শিখিয়ে ছাড়ব ?'

শওকত সাহেব হাসলেন। তাঁর নিজের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। সাজেদুল করিম বলল, আর কোনো সমস্যা হবে না। তা ছাড়া আমি আপনার জন্যে আরেকটা কাজ করেছি—প্রতিটি স্টেপ কাগজে লিখে এনেছি। কোনো সমস্যা হলে কাগজটা দেখবেন ; দেখবেন, সব পানির মতো পরিষ্কার।

'থ্যাংক য়্যু।'

'আর স্যার, আমার ঠিকানাটা কাগজে লিখে গেলাম। কোনো ঝামেলা মনে করলেই আমার বাসায় চলে আসবেন।'

'আচ্ছা। বাবা, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।'

'আপনার অবস্থা দেখে আমার স্যার মনটা খারাপ হয়েছিল। রাতে দেখি ঘুম আসে না। তখন একের পর এক স্টেপগুলি কাগজে লিখলাম। সারারাত চিন্তা করলাম কীভাবে বোঝালে আপনি বুঝবেন।'

শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি ভেবে পেলেন না এরকম অসাধারণ ছেলে পৃথিবীতে এত কম জন্মায় কেন ?

'স্যার, আমি যাই। জিএম সাহেবকে বলে যাচ্ছি আপনি সব শিখে ফেলেছেন, আর কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা কথা স্যার, কম্পিউটারকে ভয় পাবেন না। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কম্পিউটার হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্র। এর বেশি কিছু না।'

শওকত সাহেবের চোখে এইবার সত্যি সত্যি পানি চলে এল। ছেলেটা যেন চোখের পানি দেখতে না পায় সেজন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ঠিক করলেন, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটার জন্যে একটা উপহার কিনবেন। দামি কিছু না, সেই সামর্থ্য তাঁর নেই, তবু কিছু কিনে তার বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে আসবেন। একটা কলম বা এই জাতীয় কিছু। শ'দুই টাকার মধ্যে কলম না পাওয়া গেলে সুন্দর কিছু গোলাপ। তাঁর সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে খামের ভেতর রাখা।

শওকত সাহেব একশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ওয়াটারম্যান কলম কিনলেন। তারপর কোনোকিছু না ভেবেই চিত্রলেখার জন্যে একটা সুয়েটার কিনে ফেললেন। গরমের সময় বলেই ভাল ভাল সুয়েটার সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল। সুয়েটার কিনতে তিনশো চল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। শাদা জমিনের উপর নীল ফুল আঁকা। সিনথেটিক উল। দোকানদার বলল, সিনথেটিক হলেও আসল উলের বাবা। শুধু সুয়েটার গায়ে দিয়েই তুন্দ্রা অঞ্চলে বরফের চাঁইয়ের উপর শুয়ে থাকা যায়। শওকত সাহেব জানেন সুয়েটার কেনাটা তাঁর জন্যে খুবই বোকামি হয়েছে।

চিত্রলেখাকে এই সুয়েটার তিনি কখনো দিতে পারবেন না। কারণ চিত্রলেখা বলে কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা তাঁর মাথার অসুস্থ কোনো কল্পনা। সংসারের দুঃখ-ধান্ধায় তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলে এইসব হাবিজাবি দেখছেন। তার পরেও মনে হল—মেয়েটা দেখবে জিনিশটা তার জন্যে কেনা হয়েছে। বেচারি খুশি হবে।

সাজেদুল করিমকে তিনি বাসায় পেলেন না। দরজা তালাবন্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি কলমটা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হল, ভালই হয়েছে। সাজেদুল করিম জানল না উপহার কে দিয়েছে। মানুষের সবচে ভাল লাগে অজানা কোনো জায়গা থেকে উপহার পেতে।

শওকত সাহেব গভীর আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজকের পেঁপে খেতে আগের মতো তিতা লাগল না। চা-টাও খেতে ভাল হয়েছে। তিনি মনোয়ারাকে আরেক কাপ চা দিতে বলে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করতে গেলেন। আয়না পাওয়া গেল না। ড্রয়ারে নেই, টেবিলের উপরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই। তিনি পাগলের মতো আয়না খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কি নিয়েছে ? তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকে টেবিলের বইপত্র এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

ইরা বলল, বাবা, তুমি কী খুঁজছ ?

'আয়নাটা খুঁজছি। আমার একটা হাত-আয়না ছিল না ? ঐ আয়নাটা।'

'ঐ আয়না তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। মা তোমার জন্যে নতুন আয়না কিনেছে। ওটা ফেলে দিয়েছে।'

শওকত সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, এইসব কী বলছিস! কোথায় ফেলেছে?

'পুরানো একটা আয়না ফেলে দিয়েছে। তুমি এরকম করছ কেন বাবা ?'

শওকত সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, কিছু বোঝা গেল না। ইরা ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকল। মনোয়ারা এসে দেখেন শওকত সাহেব খুব ঘামছেন। তাঁর কপাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম পড়ছে। তিনি ধরা গলায় বললেন, মনোয়ারা, আয়না কোথায় ফেলেছ ?

রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার পাশের ডাস্টবিন হাতড়াচ্ছেন। তাঁর সারা গায়ে নোংরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি দু'হাতে ময়লা ঘেঁটে যাচ্ছেন। একটু দূরে তার স্ত্রী ও তিন কন্যা দাঁড়িয়ে। তাদের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বড় মেয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, তোমার কী হয়েছে বাবা ?

শওকত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, চিত্রলেখাকে খুঁজছি রে মা—চিত্রলেখা।

'চিত্রলেখা কে ?'

'আমি জানি না কে ?'

শওকত সাহেবের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকছেন—চিত্রা মা রে, ও মা, তুই কোথায় ?